যমের বিচার
লোকসংস্কৃতির দরবারে

যমের বিচার

লোকসংস্কৃতির দরবারে

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

সম্পাদিত

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন;

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ · ১০০০

প্রকাশক
সাধারণ সম্পাদক
লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ,
৬০ জেমস লঙ সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪

মুদ্রাকর :
গুপ্ত প্রেস
৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অনুজাপ্রতিম

শ্রীমতী অঞ্জলি নন্দী

ও

সহপাঠী বন্ধু

ড. শ্রীদিলীপকুমার নন্দী

প্রীতিভাজনেষু

লোকসংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থমালা

- **ক্ষেত্র গুপ্ত** সংবোধেব সন্ধানে লোকসংস্কৃতি ৭৫ [দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ]
  লোকসংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন ৭০
- **সনৎকুমাব মিত্র** সম্পাদিত
  বাউল লালন ববীন্দ্রনাথ ৫৫
  পশ্চিমবঙ্গেব পুতুলনাচ ২৫
  ঝুমুব আলোচনা ও সংগ্রহ ৬০
  বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান ৫০
  বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক ৭০
  কাব ও সংস্কৃতি ৫০
  ববীন্দ্রনাথেব লোকসাহিত্য ৫০
  উববতাব দেবী সবস্বতী ১২৫
- **পল্লব সেনগুপ্ত** লোককথাব অন্তর্লোক ৫০
- **দুলাল চৌধুবী** লোকসংস্কৃতি সমীক্ষাব পদ্ধতি ২৫ [দ্বিতীয় পবিমার্জিত সংস্কবণ]
- **বিজনকুমাব মণ্ডল** সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প ৯০
- **তিমিববরণ চক্রবর্তী** বাঙলা লোকসংস্কৃতিব চর্চাব মধ্যযুগ ৮০
  বেভা জেমস লঙ জীবন ও কর্ম ৫০
  এইচ এইচ রিজলে জীবন ও কর্ম ৫০
- **বরুণকুমাব চক্রবর্তী** বাঙলাব লোকক্রীড়া ৬০ [৫টি রঙিন আলোকচিত্র সম্বলিত]
  লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা ৫০
- **প্রদ্যোত ঘোষ** লোকসংস্কৃতি গম্ভীবা ৮০
- **নির্মাল্য** ১৫০
  [অধ্যাপক নির্মলকুমাব বসু জন্মশতবর্ষ সংকলন]

সম্পাদকের কথা

হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের মধ্যে **যমই** একমাত্র প্রত্যক্ষ এঁর আবির্ভাব বিশ্বলোকে অমোঘ। প্রাণী অপ্রাণী কেউ ই এর সংহার-শক্তিকে এড়াতে পারে না কোনভাবেই একদিন বা কোন একদিন সকলকেই তার দ্বারা সমাবিষ্ট হতেই হয়।

কিন্তু এমন অমোঘ শক্তিও পরাভূত হন **প্রেমের কাছে**—মহাভারতকার দেখিয়েছেন: '**প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিল** তিনি **প্রেমের শক্তির** কাছে পরাজিত হইলেন।' আমাদের কবিও বলেছেন 'হে বাসর ঘর/ বিশ্বে **প্রেম মৃত্যুহীন**, তুমিও অমর '

তাই মরণের দেবতাকে আমরা বরণে ব্রতী হয়েছি। সভয়ে নয়, — সপ্রেমে মৃত্যু দেবতাকে বলতে চাই - 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যামসমান।'

অধিকন্তু আমাদের দেবকল্পনা শেষ হয় মূর্তিরূপ প্রাপ্তিতে। আর ঐ কল্পনা আসে প্রকৃতি-বন্দনা, কিছু ভোগ লাভের আশা, বহুলাংশে ভয় থেকে। কিন্তু যম-মূর্তি কল্পনায় [যদিও এর মূর্তি দর্শন সজ্ঞানে ঘটে কি ?] শুধুই ভয়। আর এই ভয়ের উৎস জীবনের প্রতি অবারণ ভালোবাসা বাঁচার অনিশ আকাঙ্ক্ষা।

অথচ একটু বিজ্ঞানমনস্ক হলে, যুক্তি ['বিশ্বাস' নয়] ব্যবহার করলে, মানতেই হবে মৃত্যু হচ্ছে, জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিসমাপ্তি। তারপরে আর কিছুই নেই। যে পাঞ্চভৌতিক উপাদানে প্রাণের সৃষ্টি, তার নিঃশেষ মিশ্রণ ঘটে গেছে পার্থিব ভৌত উপকরণে।

অথচ একে পাশ কাটিয়ে ভাববাদী মানুষ এই জগৎ-ঐ জগৎ—ইহলোক পরলোক, পাপ পুণ্য, কর্মফল-শাস্তি, স্বর্গ নরক তৈরি করেছে, শুধু তার মধ্যেকার পশুত্বকে সংযমিত করার জন্য। এবং আরো কি আশ্চর্য, ঐ পশু প্রবৃত্তির মানুষই সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উক্ত সংযমকে নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটি 'সমাজ শাসন আয়োগ' [Social Vigilance Commission] তৈরি করে নিয়েছে; যার মহাপরিচালক [Director] হলেন যম। অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের শাসন করার বিচারশালা তৈরি করেছে। যমের ৮৬টি নরক [ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ] এবং তার শাস্তি হলো মানুষেরই তৈরি Penal Code সমাজের স্বাস্থ্য বজায় রাখার প্রয়োজনেই এই code of conduct—মানুষ সভ্যতা সৃষ্টির সূচনালগ্নেই তৈরি করে নিয়েছে।

ঋগ্বেদে যম প্রায় ৫০ বার উল্লিখিত। ইনি দেবতাদের সঙ্গে একত্রে সোমরস পান করলেও তিনি কোথাও দেবতা হিসেবে স্বীকৃত নন। ইনি মৃতদের পাপ ও পুণ্যের বিচারক [প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে **ঋগ্বেদের** এবং **পুরাণের** যম এক নয়]।

'**যম**'-কে নিয়ে এই গ্রন্থ কিন্তু পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গের বর্ণনার মাধ্যমে অপবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না। বিষয়টিকে সমাজ বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক-নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। এবং যেটা দেখা হয়েছে প্রস্তুত-গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে।

যমের একাধিক আলোকচিত্র দেখিয়েও আমরা অপবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না? এ-প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে আইন হলো এমন একটি সামাজিক সংস্থা [Social Institution], যার অভাবে

সমাজ তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এই নিয়ন্ত্রণ রক্ষাই হলো সভ্য-সমাজের বৈশিষ্ট্য। ঐ নিয়ন্ত্রণ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সভ্যতার বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে **যম**—যার নরক এবং শাস্তির কল্পিত পুরাকথা—যার সাংস্কৃতিক প্রকাশ এবং আরোপ সমাজকে করেছে পরিশীলিত এবং তার মধ্য দিয়েই সমাজ চেয়েছে নিজের দৈবসৌষ্ঠবকে স্বাভাবিক রাখতে।

প্রাক্ আইন পর্যায়ে মানবসমাজকে দীর্ঘসময় যে পেরিয়ে আসতে হয়েছে, তার নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বর্বরতার যুগের সামাজিক অনুশাসন। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই অনুশাসন [?] রক্ষায় এবং পরিচালনে কোন আরক্ষা বিভাগ ছিল না—আইন-রক্ষায় যার প্রয়োজন অপরিহার্য। এছাড়াও সেই সমাজব্যবস্থায় আইন অমান্যকারীদের আদালতের মাধ্যমে বিচার এবং প্রয়োজনবোধে শাস্তিদানেরও কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এমতাবস্থায় সেদিনের সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সমাজকর্তাদের নানাধরনের প্রতীকী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের লোককথা, লোককাহিনী, বিশ্বাস-সংস্কারের জাল বুনে সৃষ্টি করা হয়েছিল এমন এক পরিমণ্ডল যে মানুষ সহজেই সেগুলিকে বিশ্বাস করার মানসিকতা তৈরি করতে পারে এবং নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিজেই সতর্ক থাকতে পারে। এই জগতের বিভিন্ন ধরনের অপরাধের বিচার করার জন্য সেদিন কেউই ছিল না এবং অপরাধীর শাস্তিও হতো না। সে মনে করতো জীবনের পরপারে পাড়ি দিলে তার সুকর্ম-কুকর্মের জন্য **যমরাজের বিচারালয়ে** তার বিচার হবে। প্রতিটি মানুষের কর্মফল এবং তৎসংক্রান্ত পাপপুণ্যের হিসাব যথাযথ রাখা হচ্ছে সেই অজানা জগতের অদৃশ্য সব নথিপত্রের মধ্যে।

এমনতর যমের ভাবনা,—যমের শাস্তিদানের কাল্পনিক ছবিরা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির যুগে অতি কিউরিও হয়ে গেলেও, বিশ্বজোড়া অ-নীতি, দুষ্কার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে আজও আমরা দ্বিধা করি না,—বলি বিবেকের জাগরণ চাই, প্রকৃত দোষী যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় - এমন কি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী মন্ত্রীকেও দুর্নীতি করবো না, ন্যায় ও বিবেকের কাছে সৎ থাকবো— এই বলে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হয়।

প্রস্তুত গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে বোধহয় দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতি একটি বিজ্ঞান ['Folklore is a Science'] একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করে বিবিধ জ্ঞাতিবিদ্যার সাহায্যে আমরা **যম** [ব্যক্তি হিসাবে গণনীয় নয়] বা মৃত্যুঘটনা-বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছি;- -যমকে একজন ব্যক্তি হিসেবে ধরে নিয়ে, তিনি এবং তার কল্পিত মৃত্যুপুরীতে কেমন ভাবে বিচার-কাজ চালাচ্ছেন, এখানে তা আমরা দেখাতে চাই নি।

আমরা বিচার করতে চেয়েছি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে বিশ্বচরাচরকে অবিনশ্বর হতে **মরণ কেন বাধা দেবে**? জীবন—জন্মমাত্রেই কেন হবে মৃত্যুর করধৃত ক্রীড়নক? জীবন মানে কেন হবে মৃত্যু নামক চপল শিশুর হাতে ধরা পড়া ফড়িঙের ডানার ঘন শিহরণ? এই শিহরণ কে ঘোচাবে? কবি বলেন :

'........... .... মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।'

'শেষের কবিতা'।

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি ·

সাঁওতালি পটে মহিষারূঢ় যম : বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল

সংগ্রহ

ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক

যম-যমী

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

ঋগ্বেদের বলিষ্ঠতম কবিতা যম-যমী সংবাদ। অবাধ দেহ-মিলনের ক্ষেত্রে সমাজশাসনের নিষেধবিধি ক্রমশ আরোপ্যমান। অদম্য প্রাণাবেগ এবং আদিম সরলতার বুক জুড়ে সভ্যতা তখন নিগড় গাঁথছে—সংক্ষেপে কবিতাটির এটাই পটভূমি। সভ্যতার চলৎ-ছবি, নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব-বৃত্তান্ত, সূচীমুখ স্পষ্টকথন, সর্বোপরি অপূর্ব কাব্য-সুষমা—সব মিলিয়ে কবিতাটির অদম্য আকর্ষণ। অনুবাদকালে সায়ণাচার্যের বৈদিক ভাষ্যের অনুসরণ করা হয়েছে।

যমী

কী ভালো লাগছে জানো এই দ্বীপ, নিরিবিলি, সাগর-শরীরে
বিচ্ছাদিত—যেখানে এলাম। জানি যম আগর্ভই সহচর তুমি।
আর তো পারি না আমি। সম্ভোগে রতিসুখে জুড়িয়ে আমাকে
যমীর পৃথিবীটুকু ভরে দাও সৌম্যতর তনয়ে। কেননা
বিধাতা-পুরুষ চায় আমি হই...আমি হই...কুমার-প্রসবা।

যম

না আমি অমন করে সহবাস-সখ্যে যমী তোমাকে চাহি না।
যেহেতু অগম্যা তুমি : সমান যোনির চিহ্ন উভয় শরীরে।
তাছাড়া দেখনি তুমি, পরিদর্শকেরা দিচ্ছে পৃথিবী টহল—
দ্যুলোক-পালক তারা, বীরপুত্র, প্রজ্ঞাবান্ মহান দেবের।

যমী

অমর্ত্য-পুরুষ যারা তারা সব স্বেচ্ছাচারী নিষিদ্ধ রমণে ;
অথচ মানুষই শুধু কন্যা কিংবা ভগিনীকে পরার্থে বিলায়!
আমি তো তোমাকে চাই, প্রিয় যম, তুমি শুধু আমাকে চেয়েই
যোনির গভীরে এসো। সৃষ্টিকর্তা আত্মজাকে রমণ করেনি?

যম

না যমী, এমন কাজ আগে কই আমরা তো করিনি কখনো
সত্যের আদর্শ ছেড়ে কখনো কি ডুবে গেছি অযথা আচারে।

তাছাড়া গন্ধর্ব আর অপ্যায়োষা আমাদের জনক-জননী
অন্তরীক্ষবাসী তাঁরা। নারে বোন, এ যে বড়ো চেনা পরিচয়!

যমী

রূপকার ত্বষ্টা, আর বিশ্বরূপ, প্রজাপতি, সবিতা প্রভৃতি
স্বামী-স্ত্রী বানিয়ে দিল মাতৃগর্ভে সহবাসে ছিলাম যখন।
কে আছে বিলোপ করে প্রজাপতি যে বিধান গড়েছেন নিজে :
আকাশ পৃথিবী জানে, যম-যমী জায়াপতি আজাত-মরণ।

প্রথম সংগম-কথা। বৃথা যম, ভয় পাচ্ছো জানবে না কেউ,
অথবা দেখে যে কেউ রাষ্ট্র করে দেবে ভাবো, ভয় নেই তার?
বিশাল ভুবন জুড়ে মিত্র আর বরুণের প্রজারা সবাই
নরকের ভয়ে ত্রস্ত। তোমাকে স্মরণ করে তুমি তো জানোই।

আরো কাছে এসো যম দেহের ঘনিষ্ঠ তাপে—শরীরে আমার।
কেননা শয়নে আজ দেহলীন হতে চাই এক বিছানায়।
কামিনীর মত তাই ভর্তাকে শ্লথবাস শরীর দেখিয়ে
রথের চাকার মত এক লক্ষ্যে দু-জনের জীবন ছোটাই।

যম

তুমি কি দেখনি যমী, অহোরাত্র এখানেতে দেবের চরেরা
পৃথিবী প্রহরা দেয়, চপল চরণে ছোটে নিমেষবিহীন।
না তুমি এখনি যাও—আমাকে প্রলাপে আর পীড়িত না ক'রে
প্রণয়ীর সঙ্গে হাঁটো, রথের চাকার মত অভিন্নগমন।

যমী

দিবসে নিশীথে যাকে যজ্ঞচরু দিয়ে যায় যজমানগণ,
সূর্যের সহানুভূতি ক্ষণে ক্ষণে যার দিকে বড়ো চোখে চায়,
আকাশ-পৃথিবী দু'য়ে গাঁটছড়া বাঁধে যেন রমণী-পুরুষ
যার নামে, এই যমী তার কাছে ভরণার্থ শরণ শুধায়।

যম

হয়ত আগামী যুগে কামাতুর ভগিনীরা সুরত ব্যাপারে
ভাইকে ডাকবে ঘরে। জানি যমী সেইদিন বেশিদূরে নয়।
আমাকে ছেড়ে দে বোন, লক্ষ্মীটি, খুঁজে নিস প্রণয়ী আরেক
যে পারে রমণে সিক্ত করে দিতে তাকে তোর আলিঙ্গনে ধর।

যমী

সে কেমন ভাই বল, যে থেকেও আজ তার ভগিনী অনাথা,
সেই বা কেমন বোন যে আছে জেনেও দুঃখ পায় তার ভাই।
ওঃ আমি কামেতে আজ জর্জরিত হয়ে এই অধীর প্রলাপে
অনুরোধ করি যম, এ তনু তাপিত করো রমণে মদির।

যম

তোমার তনুতে তৃপ্তি? তা থেকে বঞ্চিত থাক আমার শরীর।
শিষ্টেরা কি বলে জানো, ভগিনীগামীরা নাকি হয় মহাপাপী।
যাও লক্ষ্মীসোনা বোন। খুশিমত বেছে নিয়ে মনের মানুষ
সোহাগে যথেচ্ছ হও। আমার কামনা নেই তোমাকে পাবার।

যমী

তুমি যে এহেন ভীরু, হায় যম, এই কথা আগে তো শুনিনি।
ওঃ তুমি হৃদয়হীন। জানি আমি অন্য নারী বাহুতে তোমায
বেঁধেছে—যেমন করে রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখে অশ্বমেধী ঘোড়া,
কিংবা ব্রততী বাঁধে আকর্ষ-আঙুলে কোনো ঋজু বৃক্ষপতি।

যম

তোমাকে বুকেতে চায় আরেক পুরুষ। তুমি তাকে আলিঙ্গনে
বক্ষোলীন করে রেখো, যেমন প্রগাঢ় প্রেমে বনলতা বাহু হয়ে
তরুকে জড়ায়। তাই তাকেই মনটি দিয়ো যে দেবে তোমায়।
তারপর অনুভব : কল্যাণ-মধুর সেই মিথুন-বিলাস॥

মূলশ্লোকমালা

ঋগ্বেদ। ১০ম মণ্ডল। ১০ম সূক্ত

যম ও যমী দেবতা। বিবস্বান পুত্র ও পুত্রী যম-যমী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরূ চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ॥ ১॥

ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎসলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্॥ ২॥

উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ত্যজসং মর্তস্য।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বম্ মা বিবিশ্যাঃ॥ ৩॥

ন যৎ পুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।
গন্ধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ॥

গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ।। ৫ ।।

কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্র বোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৃন্ ।। ৬ ।।

যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ত্ সমানে যোনৌ সহশেয্যায়।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বৃহেব রথ্যেব চক্রা ।। ৭ ।।

ন তিষ্ঠন্তি ন নিমিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ।। ৮ ।।

রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধূ যমীর্যমস্য বিভৃয়াদজামি ।। ৯ ।।

আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহু-মন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ।। ১০ ।।

কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নিঋর্তির্নিগচ্ছাৎ।
কামমূতা বহ্বে তদ্রপামি তন্বা মে তন্মং সং পিপৃগ্ধি ।। ১১ ।।

ন বা উ তে তন্বং সং পপৃচ্যাং পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ।
অন্যেন মৎ প্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ।। ১২ ।

বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়াং চাবিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরিষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।। ১৩ ।।

অন্যমূ ষু ত্বং যম্যন্য উ ত্বাং পরিষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্।। ১৪ ।।

রমেশচন্দ্র দত্তের গদ্যানুবাদ

১। [যমী ও যম যমজ ভ্রাতৃভগিনী, তন্মধ্যে যমী যমকে বলছেন]—বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নপ্তা [নাতি] জন্মাবে। ২। [যমের উত্তর]—তোমার গর্ভসহচর তোমার সাথে এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এস্থান নির্জন নহে, যেহেতু সে মহান অসুরের স্বর্গধারণকারী বীরপুত্রগণ পৃথিবীর সর্বভাগ দেখছেন। ৩। [যমীর উক্তি]—যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এপ্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হচ্ছে, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি পুত্রজন্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর। ৪। [যমের উত্তর]—এ কার্য পূর্বে কখন আমরা করিনি। আমরা সত্যবাদী, কখন মিথ্যা বলি নি।

গন্ধর্ব আমাদের পিতা, আর অপ্যাযোষা আমাদের উভয়ের মাতা; সুতরাং আমাদের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক। ৫। [যমীর উক্তি]—নির্মাণকর্তা ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেবত্বষ্টা, আমাদের গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবৎ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় অন্যথা করতে কারও সাধ্য নেই। আমাদের এ সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানে। ৬। [যমের উত্তর]—এই প্রথম দিন কে জানে? কে বা দেখেছে? কেই বা প্রকাশ করেছে? মিত্র ও বরুণের আবাসভূত এ বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড। অতএব হে আহন! তুমি নরদের এর কি বল? ৭। [যমীর উক্তি]—তুমি যম, আমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, সে একস্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট তদ্রূপ আমি তোমার নিকট নিজ দেহ সমর্পণ করে দিই। রথধারণকারী চক্রদ্বারের ন্যায় এস আমরা এক কার্যে প্রবৃত্ত হই। ৮। [যমের উত্তর]—এ যে সকল দেবতাদের গুপ্তচর, এদের সর্বত্র গতিবিধি, এরা চক্ষুঃ নিমীলন করে না। হে ব্যথাদায়িনি যাও, শীঘ্র অন্যের নিকট গমন কর, রথধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় তার সাথে এক কার্য কর। ৯। [যমীর উক্তি]—কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়, সূর্যের তেজ যেন পর পর আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষবৎ সম্বন্ধ। যমী গিয়ে ভ্রাতা যমের আশ্রয় গ্রহণ করুক। ১০। [যমের উত্তর]—ভবিষ্যতে এমন যুগ হবে যখন ভ্রাতা ভগ্নীর সাথে সহবাস করবে। হে সুন্দরি! এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। তিনি যখন তোমাকে গ্রহণ করবেন তখন তাঁকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন কর। ১১। [যমীর উক্তি]—সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে থাকতেও ভগিনী অনাথা হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়? আমি অভিলাষে মূর্ছিতা হয়ে এত করে বলছি, তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর মিলিতে দাও। ১২। [যমের উত্তর]—তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর মিলাতে ইচ্ছা নেই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাকে পাপী বলে। আমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে সুখ-সম্ভোগের চেষ্টা দেখ। হে সুন্দরি! তোমার ভ্রাতার এরূপ অভিলাষ নেই। ১৩। [যমীর উক্তি]—হায়! যম! তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি! এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রজ্জু যেরূপ ঘোটককে বেষ্টন করে কিংবা যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, সেরূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ। ১৪। [যমের উত্তর]—হে যমি! তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তারই মন তুমি হরণ কর, সেও তোমার মন হরণ করুক। তারই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাতেই মঙ্গল হবে।

টীকা : ১। এ সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। এতে ভগ্নী যমী ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করবার অভিলাষ প্রকাশ করছেন, কিন্তু যম সে পাপকার্যে অসম্মতি প্রকাশ করছেন। যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি। রাত্রি দিবার পশ্চাতে আসে কিন্তু তাদের সঙ্গমন হয় না। এ প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এরূপ বুঝেছি। ২। অসুরের বীর পুত্রগণ বোধহয় স্বর্গধারী দেবগণ। দশম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ উনিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা :—১০ সূক্তের ২ ঋকে স্বর্গদেব সম্বন্ধে, ১১ সূক্তের ৬ ঋকে পুরোহিত সম্বন্ধে, ৩১ সূক্তের ৬ ঋকে যজ্ঞ সম্বন্ধে, ৫৩ সূক্তের ৪ ঋকে বলবান শত্রু সম্বন্ধে, ৫৬ সূক্তের ৬ ঋকে সূর্য সম্বন্ধে, ৭৪ সূক্তের ২ ঋকে বলবান সম্বন্ধে,

৮২ সূক্তের ৫ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ৯২ সূক্তের ৬ ঋকে মেঘ সম্বন্ধে, ৯৩ সূক্তের ১৪ ঋকে রামরাজা সম্বন্ধে, ৯৬ সূক্তের ১১ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তের ১২ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ১২৪ সূক্তের ৩ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ১২৪ সূক্তের ৫ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ১৩২ সূক্তের ৪ ঋকে মিত্র সম্বন্ধে, ১৩৮ সূক্তের ৩ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৫১ সূক্তের ৩ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৫৭ সূক্তের ৪ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৭০ সূক্তের ২ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৭৭ সূক্তের ১ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে। দশম মণ্ডলের শেষ ভাগের সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সে সূক্তগুলিতে 'অসুর' শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ৩। সায়ণ গন্ধর্ব অর্থে বিবস্বান বা সূর্য এবং অপ্যা যোষা অর্থে সরণ্যু বা সূর্যপত্নী ঊষা করেছেন। আচার্য মক্ষমূলর এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। ৪। মূলে "জনিতা দেবাঃ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ" আছে। সায়ণ "সবিতা" শব্দ বিশেষ্য করে জনিতা ও ত্বষ্টা ও বিশ্বরূপ শব্দকে তার বিশেষণ শব্দ করেছেন। কিন্তু ত্বষ্টাই বোধ হয় বিশেষ্য, সবিতা প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষণ। 'The divine Twashtri, the creator, the vivifier, the shaper of all forms.'—Muir. ৫। এ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সায়ণ এ ষষ্ঠ ঋকটি যমীর উক্তি বলেছেন। সুতরাং আহনঃ যমের বিশেষণ করেছেন। মিউয়র কে ঋক যমের উক্তি করে আহনঃ অর্থে 'Oh! Wanton woman!' করেছেন। আমরা সেই অর্থ গ্রহণ করেছি কেন না অষ্টম ঋকে 'অহনঃ' শব্দ যমীর সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। ৬। এখানে অহনঃ শব্দ আছে। ৭। পণ্ডিতবর মিউয়র এ ঋক যমীর উক্তি করেছেন। আমরা তাই সঙ্গত বলে গ্রহণ করেছি।

যম-যমী সংবাদ : সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

যম ও যমী যমজ ভাইবোন। অথবা আদি মানব-মানবী। এদের কথালাপ নিয়ে ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্ত বা dialogue hymn। সাহিত্যের বিচারে এই মন্ত্রমালা ভারতের প্রাচীনতম কাব্যনাটকের একটি। কিন্তু বৈদিকযুগ ও তার পূর্ববর্তী সমাজতত্ত্বের নিরিখে এটি এক অসামান্য দলিল। ভাষাতত্ত্বে পৃথিবীর প্রাচীনতম কল্পিত [hypothetical] ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়। তার একটি ধারা ইন্দো-ইরানীয়, অন্যটি ইন্দো-আরিয়ান বা ইন্দো-আর্য। এই দ্বিতীয় ঘরানায় বৈদিক ভাষা। যম-যমী বৃত্তান্ত বেদে বিবৃত হলেও এর উৎস ইন্দো-ইরানীয় ভাষার মিথ বা লোকপুরাণে যিম এবং যিমেহ্ [yima-yimeh]-এর কাহিনীতে। ওই পর্বে যিম ছিলো স্বর্ণযুগের চন্দ্রদেবতা। পরে আবেস্তা এবং বেদ-এর আমলে যথাক্রমে পৃথিবীর রাজা এবং ভূস্বর্গের অধিপতি বলে পরিচিত হল ইন্দো-ইরানীয় যিম এবং বৈদিক যম। ইন্দো-ইরানী লোকপুরাণে যিম এবং যিমেহ্ যমজ ভাইবোন। তাদের মিলনে আদি মানুষের জন্ম।

ঋগ্বেদে যম-যমী সংবাদ সূক্তটি [১০ মণ্ডল ১০ সূক্ত] ছাড়া আরও তিনটি সূক্ত বা মন্ত্রমালায় [১০ মণ্ডলের ১৪ সংখ্যক সূক্ত, ১৩৫ সূক্ত এবং ১৫৪ সূক্ত] যমের প্রশস্তি করেছেন মন্ত্ররচয়িতারা। এছাড়া ঋগ্বেদে ৫০ বার উল্লেখ করা হয়েছে যমপ্রসঙ্গ। কিন্তু অন্য কোথাও যমীর কথা বলেননি বৈদিক ঋষি বা কবিগণ। যম এবং যমীর বাবা ও মা গন্ধর্ব এবং জলের অপ্সরা অপ্যাযোষা। যমীর ভাষায় 'যম একমাত্র মরণশীল মানুষ'। ঋগ্বেদের অন্য এক মন্ত্রে [১০.১৩.৪] বলা হয়েছে, যম মরণ বরণ করে দেহত্যাগ করেছে। আর অথর্ববেদের [১৮.৩.১৩] মন্ত্রে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—যমই প্রথম মর্ত্যবাসী যার মৃত্যু হয়েছিলো। এ-থেকে সিদ্ধান্ত

নেওয়া যেতে পারে যে, যম তখনও মৃত্যুদেবতা হয়ে ওঠেননি। তাঁকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় লোকপুরাণে প্রথম 'মানুষ' হিসেবে। তাই তাঁর কামনা-বাসনা, জৈবিক প্রয়োজন সবই স্বাভাবিক। অথচ তাঁর সহোদরা যমজ বোন যমী যখন তাকে কামার্ত হয়ে আকাঙ্ক্ষা করে তখন তিনি পিছিয়ে গেলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন সমাজবিজ্ঞানেই নিহিত। সেকথায় পরে আসছি। তার আগে দেখা যাক যম-যমীর তথাকথিত অবৈধ মিলন অন্যত্র উল্লিখিত কি না? এক জার্মান পণ্ডিত লিখেছিলেন, প্রাচীন লেট্টিক [Lettic] লোকগাথায় বলা হয়েছে, ভাই তার বোনের সঙ্গে সংসর্গ করতে চেয়েছিলো। সে যাই হোক 'যম-যমী-সংবাদ'-এর এই কাহিনী পরবর্তী কালেও ভারতীয় রচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে স্থান পেয়েছে। নরসিংহপুরাণের ১৩ অধ্যায়ে যম এবং যমীর কথোপকথনের মধ্যে ঋগ্বেদের 'যমযমী-সংবাদ'-এর সুরই ধ্বনিত। 'কথারম্ভে শুকদেব ব্যাসকে আরও একটি 'পুণ্যা পাপহরা কথা' শোনাতে বললেন। ব্যাস তার উত্তরে বলতে লাগলেন : 'বিবস্বতের পুত্র যম আর তার অনুজা যমীর কথা। এদের মাতা অদিতি। যমী বললো—সে কেমন ভাই যে তার সন্তানহীনা বোনের স্বামী হতে পারে না। এমন মানুষ কে আছে যে তার বোনের চরম কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না ভ্রাতা হলেও স্বামী হিসেবে। এটা খুবই পরিতাপের কথা—কামার্ত বোন থাকতে অন্য কোন মেয়েকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করছে সে। সুতরাং যমের উচিত যমীর ইচ্ছা পূরণ করা। না হলে সে আত্মঘাতী হবে। দুজনের দেহের মিলন চাইছে যমী। এ-কথায় যম রুষ্ট হয়ে বলল : এধরনের সম্পর্ক সমাজে ঘৃণিত। ভগিনী-সঙ্গম মহাপাপ। যম আরও মনে করিয়ে দিল যে স্বয়ম্ভূদেবও এই কাজকে ভর্ৎসনা করবেন। সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা এ-ধরনের কাজ করলে সাধারণের মধ্যে তার প্রভাব পড়ে। এইসব অন্যায় কাজ না করাটাই হল ধর্মের প্রতি আনুগত্য। যমীর প্রস্তাবে পাপ আছে তাই এই কাজ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ। ঋষিরাও একথা বলে থাকে। সুতরাং অন্য কোন জীবনসঙ্গীকে খুঁজে নিক যমী। এর উত্তরে যমী তার সৌন্দর্য ও ভরা যৌবনের কথা বলল। যম তার দৃঢ়ব্রত ও ধর্মচিত্তের প্রসঙ্গ তুলে এমনধারা পাপে নিমজ্জিত হওয়াকে অস্বীকার কবল। তবু যমী এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। এবং সঙ্গে নানারকম নারীসুলভ ছলাকলা। যম তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অন্যায়ের প্রতি কঠোর মনোভাবেব জন্য দেবত্বে উন্নীত হল।' নরসিংহপুরাণের এই কাহিনীর শেষে শ্লোক-মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যম যমীর এই কথা যে পাঠ ও শ্রবণ করে তার পাপ অন্তর্হিত হয়, এবং তার প্রয়াত আত্মীয়-স্বজন তৃপ্তি পায়। যমলোকে তাদের আর প্রবেশ ঘটে না।

ঋগ্বেদ ও পুরাণের যম-যমী উপাখ্যানটি সমাজতত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রিমিটিভ ও নতুন গড়ে ওঠা এক সমাজের সন্ধিক্ষণে পৌঁছনো যায়। আদিম জনগোষ্ঠীর রক্ত সম্পর্কিত স্বজনদের মধ্যে দেহমিলন একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নী পারিবারিক এই পরিচয় তৈরি না হওয়ার ফলে সে-সময় বৈধ-অবৈধ যৌনসম্পর্ক নিয়ে কোনও প্রশ্নই ছিলো না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হল নানা বাধা-নিষেধের। শ্লীল-অশ্লীল চেতনা দানা বাঁধতে শুরু করলো। এই age of promiscuty এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের দুই মেরুর দুই প্রতিনিধি যমী এবং যম। যমীর ভাইয়ের প্রতি যৌনাকাঙ্ক্ষা সেই মুক্ত সমাজের স্বাভাবিক প্রকাশ। আর যম রুচি, শৃঙ্খলা ও ধর্মভীরুতা নিয়ে যে নবগঠিত রুদ্ধ সমাজ ও সভ্যতা, তার প্রতিভূ। সভ্যতার চলিষ্ণু নিয়মে তাই যমী পিছিয়ে পড়লো,—উদ্দেশ্য সাধনে

বিফল হয়ে। যম নিয়মের নিগড়ে গড়ে ওঠা সমাজের প্রবক্তা হিসেবে যমীকে অনুরোধ করলো অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে।

লেভি স্ট্রাউস-এর বিবাহতত্ত্ব এ-প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। তাঁর মতে সমাজে বিবাহ দুটি পরিবারকে একত্রিত করে। ভাইয়েরা যদি বোনদের অন্য পরিবারে না পাঠায় তবে পরিবারগুলো একই বৃত্তে আবদ্ধ থেকে ছোট হয়ে যাবার আশঙ্কা। তাতে অবিরত সংঘাত, ঘৃণার সম্পর্ক তৈরি হয়। তাই অন্য গোত্রে, বর্ণে বিবাহ সমাজকে প্রবহমান এবং দৃঢ়বদ্ধ করে। সহোদরদের যৌনসম্পর্ক তাই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। অস্ট্রেলিয়ার আদি জনজাতিরা মনে করে 'আদিমকাল' এক 'স্বপ্নসময়' [dream time], অবাধ যৌনসম্পর্ক সেই যুগের বৈশিষ্ট্য। সভ্যতার বিস্তারের ফলে সেই সম্পর্ক ক্রমেই নিন্দিত হয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর অনূদিত ঋগ্বেদ-সংহিতায় যম-যমী সংবাদ প্রসঙ্গে অন্য এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই উদ্ধৃতি এরকম : 'এ সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। এতে ভগ্নী যমী ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করবার অভিলাষ প্রকাশ করছেন, কিন্তু যম সে পাপকার্যে অসম্মতি প্রকাশ করছেন। যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি। রাত্রি দিবার পশ্চাতে আসে কিন্তু তাদের সঙ্গম হয় না। এ-প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এরূপ বুঝেছি।'

যমী যমের নারী হতে চেয়েছিলো ঋগ্বেদে এবং কোনও এক পুরাণে। কিন্তু অন্যান্য পুরাণ কী বলে যমের পরিবার বিষয়ে? মৎস্য এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে মনু সূর্যের বড়ো ছেলে এবং যম ও যমুনার সহোদর ভাই। মহাভারতে দেখতে পাই [৫.১১৭.৮১ এবং ১৩.১৬৫.১১] যমের পত্নীর নাম ধূম্রোর্ণা। বিজয়া নামে আরও এক স্ত্রী ছিলো যমের। ব্রাহ্মণকন্যা বিজয়াকে দেখে যম অত্যন্ত মুগ্ধ হলো। কিন্তু যমের ভয়ংকর চেহারা ও বীভৎস কাজের তালিকা দেখে শুনে বিজয়া বেশ ভয় পেলো। তবে সেই ভীতি দূর করে যম বিয়ে করলো বিজয়াকে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই কাহিনী ছাড়াও সুন্দরী ও মহাসতী মৃত্যুকন্যাও যে যমসঙ্গিনী সেকথা বলা হয়েছে সবিস্তারে। এঁর গর্ভে যমের পুত্র-কন্যাদের সংখ্যা চৌষট্টি। সুনীথা যমের বড়ো মেয়ে। অত্যন্ত সুন্দরী এই কন্যার সঙ্গে অঙ্গরাজের বিয়ে হয়। তাদের সন্তান বেণ। যমের অপর তিন কন্যার নাম উপদানবী, হিমা এবং ইলীনা।

প্রাচীন সাহিত্যে যম যেমন স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নয়, তেমনি শিল্পের আঙিনায় তার সঙ্গিনীও একাধিক। বিশেষ করে তিব্বতী মূর্তি ও চিত্রকলায় যমের নারী বা শক্তি হিসেবে ৎসামুণ্ডি বা চামুণ্ডিএবং যমীকে দেখা যায়। তিব্বতের বিভিন্ন শাস্ত্রে ৎসামুণ্ডিকে যমের প্রধানা শক্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। ৎসামুণ্ডি ও যমীর মধ্যে মূর্তি-লক্ষণেও পার্থক্য আছে। দুজনকেই যমের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু ৎসামুণ্ডির হাতে থাকে রক্তপূর্ণ নরকরোটি **[দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১ ও ২]** আর যমীর হাতে ত্রিশূল **[দ্রষ্টব্য চিত্র নং ৩ ও ৪]**। ৎসামুণ্ডিকে যমের সঙ্গে কখনও যৌনলীলায় একাত্ম অর্থাৎ yab-yum বা যুগনদ্ধ অবস্থায় দেখা যায় না। যমীকে কিন্তু সবসময় যমের সঙ্গে রতি-বদ্ধ অবস্থায় তিব্বতের মূর্তি ও থঙ্কায় রূপায়িত হতে দেখা যায়। ৎসামুণ্ডি এবং যম যখন একে অপরের অত্যন্ত নিকটস্থ তখনও তাদের জননেন্দ্রিয় পরস্পর স্পর্শ করেনি। একটা কথা সহজেই বোঝা গেল যে যমের মূর্তি-চিন্তা তিব্বতে প্রথম যখন পৌঁছয় তখনও কিন্তু তার সহচরী ৎসামুণ্ডিই। ওদিকে যমী কিন্তু দেহলীন অবস্থায় যমের সঙ্গে yab-yam-এ ঘনিষ্ঠ। হিন্দুদের 'পুরুষ ও শক্তি' সম্বন্ধ তিব্বতী বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে তেমন

যমের বিচার
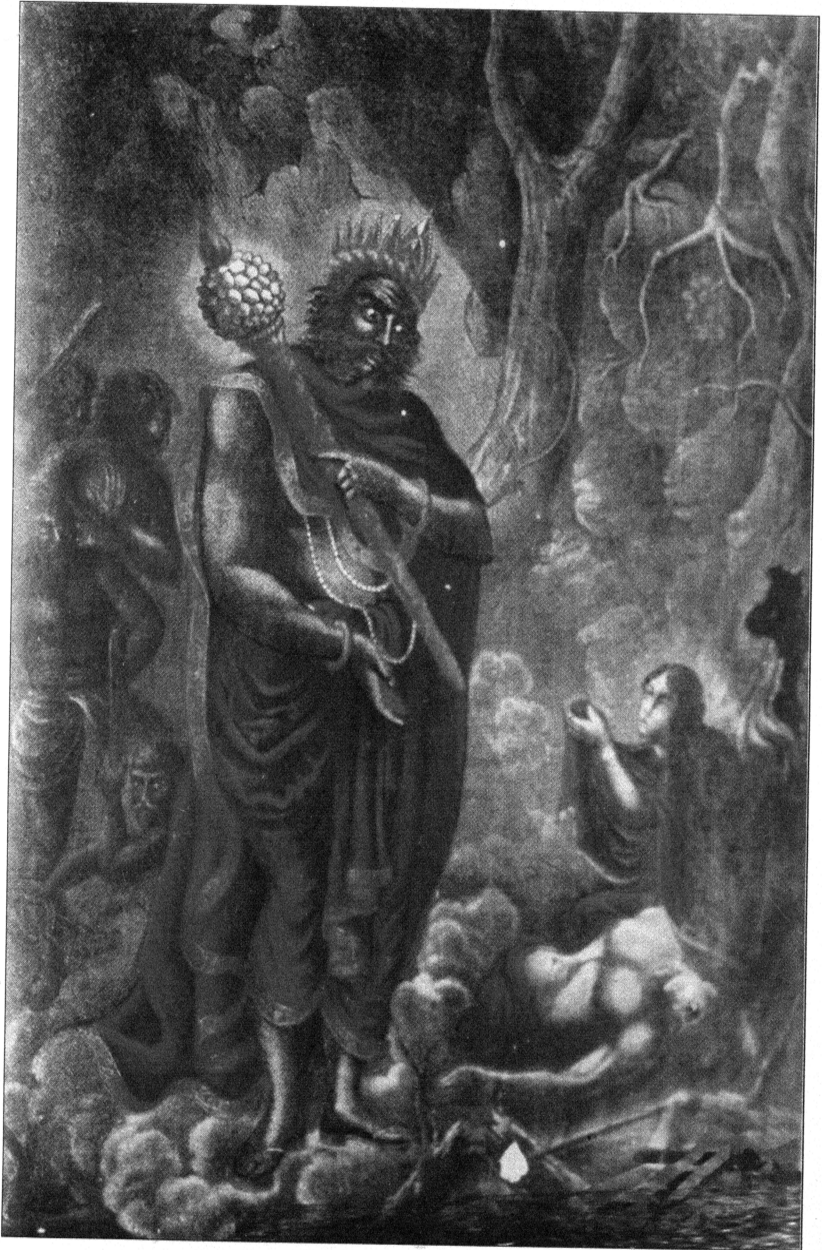
সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবতাও......প্রেমের শক্তির নিকট পরাজিত হইল

"তখন যমরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, '....**প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিল**। পূর্বে কোন নারী পতিকে এমন ভালোবাসে **নাই**, আর আমি—সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবতাও অকপট অব্যভিচারী **প্রেমের শক্তির নিকট পরাজিত হইলাম**'।"

স্বামী বিবেকানন্দ

১৯০০ **খ্রিস্টাব্দের** ১লা ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত **প্যাসাডেনার শেক্সপীয়র** ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতায় 'মহাভারত'-এর অংশবিশেষ ['স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' : অষ্টম খণ্ড ১৯৯৩: পৃ. ১৬৬]।

'হে বাসর ঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর ।।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বাসরঘর' : 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ

রচনা : আষাঢ় ১৩৩৫

প্রভাব ফেলেনি। হিন্দু মূর্তিতত্ত্বে পুরুষ দেবতা এবং নারী দেবতা পাশাপাশি থেকেও কখনও শারীরিকভাবে তন্নিষ্ঠ নয়। তিব্বতী বৌদ্ধমূর্তিকলায় যম-যমীর যে যুগনদ্ধ [yab-yum] রূপ সেখানে তাদের বৈদিক ভ্রাতাভগ্নীর মিলনকামনাটি পরিস্ফুট। তিব্বতী *Blue Annal* গ্রন্থে একটি ধর্মীয় রীতির কথা বলা হয়েছে। কাহিনীটি এরকম—জ-ম [za-ma] ভাই এবং বোন। সাধারণ রীতি-নিয়ম মেনে বোনটি বিয়ের ব্যাপারে অনিচ্ছুক। তবু তার বিয়ের পর স্বামীকে পরিত্যাগ করে, তার ধর্মগুরু [র্‌মা-rma]-র কাছে তন্ত্রের দীক্ষা নিল। একদিন এক অলৌকিক দর্শনে সে দেখল তার দীক্ষাগুরু আর হেরুক দেবতা এক ও অভিন্ন। এবং সেই দেবতা বা গুরুদেব তার সঙ্গে যৌনলীলায় লিপ্ত। *Blue Annal*-এ বলা হয়েছে জ-ম-এর ভাই আসলে চো-কি-গিয়াল-পো অর্থাৎ ধর্মরাজ। সুতরাং তিব্বতী ধর্মচিন্তায় যমের ভূমিকা নিতান্ত কম নয়।

বৈদিক যম-যমী অ্যাবস্ট্রাক্ট চিন্তা পুরাণের হাত ধরে তিব্বতে এসে মূর্ত হল রূপে। ঋগ্বেদের যমী প্রত্যাখ্যাত হলেও তিব্বতের যমী যুগনদ্ধ প্রক্রিয়ায় আলিঙ্গনে ফিরে পেল ভাইকে।

❒

যম : প্রতীকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে

রেবতীমোহন সরকার

মানবসমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রতীকীকরণ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পৃথিবীর নানা পার্থিব ও অপার্থিব ঘটনাবলী সেই আদিমকাল থেকেই মানুষের চেতনাকে উদ্দীপিত করেছিল। অন্যান্য প্রাণীদের মত মানুষ তার চর্তুদিকের ঘটনাপ্রবাহে নিজেদের নিমজ্জিত করে দেয়নি; পরন্তু এগুলির কার্য-কারণ সম্পর্ক, তাদের প্রকৃতি-পরিস্থিতি বিষয়ে আপন ভাবধারাপ্রসূত বিবিধ চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। সুদূর অতীতের বিশেষ ধরনের প্রাণীদের মধ্যে সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়েই বিশ্বে মানব নামক বিশিষ্ট প্রাণীর আবির্ভাব। উন্নততর জৈবিক পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ ঘটিয়েছে। এগুলির সমন্বিত কার্যধারা তার জীবনে বিশিষ্টতার দ্যোতক এবং এরই উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনচর্যাকে বিচিত্ররূপে রূপায়িত করেছে। জৈবিক বিবর্তনকেন্দ্রিক দেহরূপ মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করতে শিখিয়েছে। তার উন্নত দেহরূপ জীবনের ধারাকে নানাভাবে অভিযোজিত করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে। দেহমধ্যস্থিত বিভিন্ন অঙ্গ এবং স্নায়ুতন্ত্রভিত্তিক জটিল পরিবর্তন দৈহিক এবং মানসিক— দু-ভাবেই মানুষ নামক প্রাণীটিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

এমন যে জীব তার ক্ষেত্রে মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ঘটনা। মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। মৃত্যু অনিবার্য এবং একে গ্রহণ করতেই হবে। মানুষ তো বটেই পৃথিবীর সব কিছুই নশ্বর এবং এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী থেকে সকলেরই বিদায় অবশ্যম্ভাবী। কারণ জীবের নশ্বর অস্তিত্ব হল দেহ-সর্বস্ব। কিন্তু মানুষ অন্যপথে হেঁটেছে এবং সেই হাঁটার রসদ জুগিয়েছে তার সংস্কৃতি। এই কারণেই জৈবিক জীবনের অন্তিম পর্যায় সূচিত হলেও মানুষ নিজেদের চিরতরে অবলুপ্ত হতে দেয়নি। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব কেবল জৈবিক নয় —তার প্রভাব সাংস্কৃতিক পীঠভূমিতে পরিচর্চিত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে অন্যতর এক পৃথিবীর পরিকল্পনা। এই পার্থিব জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে মানুষটি নানা পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে জীবন পরিচালনা করে গেল;—সেই জীবনাবসান অপরাপর জীবিত মানুষদের বিশেষভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে—এই মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যাবে না, সে অমোঘ। নৈতিকভাবে মানুষ এর প্রতিরোধ করতে পারেনি একথা ঠিক, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের এই সংগ্রাম অনন্তকালের। জৈবিক মৃত্যুর পর মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও, তার অস্তিত্ব চিরতরে অবলুপ্ত হয় না। জীবনের পরেও থাকবে তার বিদেহী অবিচ্ছিন্নতা [Incorporeal Continuity] এবং তার

স্থান হবে অন্য এক জগতে অর্থাৎ Other World-এ। এই বিশেষ চেতনাটি জাগ্রত হয়েছে মানুষের চিন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং একেই বলা হয় সাংস্কৃতিক অভিযোজন [Cultural adaptation]। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে সংস্কৃতিক অভিযোজনের মধ্য দিয়ে প্রতিকূল জৈবিক পরিস্থিতিকে অবদমিত করেছে। মানবসংস্কৃতিই মানুষ-নামক জীবটিকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দেয়নি, বরং তার অপার্থিব জীবনকে অন্য এক পার্থিব পরিমণ্ডলে পুনর্বাসন দান করেছে। এই পুনর্বাসন প্রচেষ্টার সার্থক প্রতিরূপ হল মানবসংস্কৃতিতে অন্য এক জগতের সৃষ্টি,—যে জগতের একমাত্র অধিবাসী মৃত্যুপরবর্তী মানবদেহের অপার্থিব অবশিষ্টাংশ।

এই চিন্তার স্রষ্টা কিন্তু আধুনিক কালের মানুষ নয়,—হাজার-হাজার বছর পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক নিয়ানডারথাল মানুষদের মধ্যে এই ধরনের চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিলো। আজ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে এই নিয়ানডারথাল মানুষদের চিন্তায় ও কর্মে আমরা মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে আভাস পেয়েছি। তারা প্রচণ্ড শৈত্যভাবাপন্ন পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল। পৃথিবীতে তখন চলছিল চতুর্থ হিমযুগ। অত্যধিক ঠাণ্ডার মধ্যে তাদের জীবনযাত্রা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঐ মানুষেরা গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই গুহাগুলির মধ্যেই সেই প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রার নানা উপকরণ রেখে গিয়েছে, যেগুলি সুদীর্ঘ সময় অতিক্রমের পরও হারিয়ে যায়নি। প্রত্নবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি সেই অন্ধকারময় অতীতের বিশিষ্ট জীবনচর্যার প্রাণবস্তুকে জীবন্ত করে তুলেছে। বিবিধ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে সেদিনের মানবগোষ্ঠীর নানান চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে এবং তার মধ্য থেকেই জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে তাদের ধারণাটিকে বোঝা গেছে। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং বিভিন্ন ঘটনাবলী মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে, এরা মৃতদেহ সৎকারের চেষ্টা করেছিল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এরা মানুষকে বর্জন করেনি—মৃতকে এরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাধি দিত। আরও লক্ষ্য করার বিষয়ে যে, সেই সমাধির মধ্যে মৃতব্যক্তির ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধ এবং খাদ্যদ্রব্য রেখে দেওয়ার রেওয়াজ তৈরি হয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে নিয়ানডারথাল মানুষদের চলাচল খুব বেশি, সেখানে এই ধরনের বেশ কিছু সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে নিয়ানডারথাল মানুষেরা মৃত্যুর পরপারের জীবন সম্পর্কে কিছুটা কল্পনা করেছে এবং পরপারে মৃতব্যক্তির আত্মার ইহলৌকিক জীবনের ব্যবহার্য বস্তুর প্রয়োজন হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এই ভাবনা তাদেরই মস্তিষ্ক-প্রসূত। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের আদিম মানবগোষ্ঠীর পরপারের চিন্তাধারার নিরবচ্ছিন্নতা আজকের আবিষ্কারে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগপরিমণ্ডল অতিক্রম করে আমরা যখন ঐতিহাসিক সীমানার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন দেখি যে উক্ত চিন্তা আরও সুষ্ঠুভাবে লালিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালের আদিম জনজাতিদের জীবনচর্যা পর্যালোচনা করলে আমরা মৃত্যুপরবর্তী জগৎ-বিষয়ক চেতনার পরিচয় পাই। এগুলি যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বয়ে আসছে—সে তথ্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় আদিবাসী জীবন সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে এই বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের চিন্তাধারা বিশেষভাবে জাগ্রত। মানুষের মৃত্যুর পর সবকিছুরই সমাপ্তি ঘটে যায় না। মৃত্যুর পরও মানবজীবনের একটি ধারাবাহিকতা থেকে যায়। এ-বিষয়ে সকল সম্প্রদায়ই একমত হলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর চিন্তাধারায় বৈষম্য দেখা

যায়। মানুষের জৈবিক মৃত্যুর পর থেকে যায় একটি অবিনশ্বর অস্তিত্ব এবং সেই অপার্থিব অস্তিত্ব আদিবাসী জনমানসকে নানাভাবে ভাবিয়ে তোলে। হাজার হাজার বছর পূর্বেকার প্রাগৈতিহাসিক জনজীবনের বিশিষ্ট ধারণাসমূহ আজও এই সকল জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যায় প্রতিফলিত। কেবল ভারত নয়, পৃথিবীর সকল দেশের আদিম জীবনধারায় মৃত্যুপরবর্তী মানব-অস্তিত্বের ধারণা অত্যন্ত সজীব। এরই উপর ভিত্তি করে সেই প্রাচীনকালে প্রখ্যাত ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী স্যার এডওয়ার্ড টাইলর 'আত্মাবাদ' বা Animism নামক একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে ধর্মের উৎপত্তির একমাত্র কারণ হল আত্মায় বিশ্বাস সংক্রান্ত ধারণা। তিনি সমগ্র পৃথিবীর আদিম জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী, চিন্তা, বিশ্বাস ও সংস্কারের নানা উপাদানের মূল্যায়ন করে মন্তব্য করেছিলেন যে, পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা বা পূজা নিবেদনের প্রয়াস থেকেই এসেছে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রাথমিক বিশ্বাস। তিনি আরও বলেছিলেন যে, আত্মার এই ধারণাটি একটি বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব এবং দর্শনের প্রেক্ষাপটে রচিত— যার নাম 'আদিম দর্শন'। এর ব্যাখ্যা সূত্রে বলতে হয়, প্রতিটি মানুষই দ্বৈত আত্মার দ্বারা প্রভাবিত। এদের একটি হল মুক্ত আত্মা এবং অপরটি দেহগত আত্মা। এই দুটি আত্মা সম্পর্কে আদিম জনগোষ্ঠীর চিন্তার বিকাশ লক্ষণীয়। আত্মাই জীবনের সারবস্তু। এর অভাবে মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। এই আত্মা অবিনশ্বর; অশরীরী ত নিশ্চয়ই। ছোটনাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের ধারণায় আত্মা ছায়া ব্যতীত কিছুই নয়। আবার ঐ ধরনের চিন্তায় বিশ্বাসী হল রাঁচির বিরহড়, মধ্যপ্রদেশের বৈগা, হায়দ্রাবাদের চেঞ্চু, নাগাল্যান্ডের সেমানাগ এবং মণিপুরের থাড়ুকুকি প্রমুখ আদিবাসীগোষ্ঠী।

মানুষের মৃত্যুর পর আত্মারা কোথায় যায় সে সম্পর্কেও বিশেষ বিশেষ ধারণা আদিবাসীদের আছে। চঞ্চু আদিবাসীদের ধারণায় মৃত মানুষের আত্মা তাদের প্রধান দেবতা ভগবান তরুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। মধ্যপ্রদেশের বৈগাদের ধারণা মৃতের আত্মা প্রধান দেবতার নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। এর থেকে আদিবাসীদের 'মৃতের ভূমি' ধারণার প্রকাশ দেখি। প্রায় প্রতিটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে এই 'মৃতের ভূমি'র অস্তিত্ব স্বীকৃত। তবে এর প্রকৃত অবস্থান কোথায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন আদিবাসী মনে করে নীল আকাশের নিঃসীম প্রান্তে রয়েছে মৃতদের ভূমি। কারো মতে এটি পৃথিবীর নির্জনতম অঞ্চলের জায়গা। আবার কারো মতানুযায়ী পাতালেই এর অবস্থান। আবার কোন কোন আদিবাসী-গোষ্ঠীর মধ্যে 'মৃতের ভূমির' ধারণা থাকলেও তার অবস্থান সম্পর্কে কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই। নাগাল্যান্ডের নাগাদের মতে মৃতব্যক্তির আত্মা দূরের ওয়াকা পর্বতের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে; অপরদিকে মণিপুরের কুকিদের বিশ্বাস মৃতের আত্মা পাড়ি দেয় মিথিখোর উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ মৃতের ভূমিতে এই মিথিখোর অবস্থান নাকি নীল আকাশের এক প্রান্তে। দক্ষিণ ভারতের টোডা আদিবাসীদের মধ্যে এই 'মৃতের ভূমি' সম্পর্কে একটি সুন্দর বিশ্বাস রয়েছে। এদের ভাবনা অনুযায়ী মৃতের আত্মা চলে যায় 'ওমনোড়' অর্থাৎ মৃতের দেশে। মাটির নিচেই তার অবস্থান। তাহলেও একই সূর্য এই পৃথিবীর টোডা এবং ওমনোড়ের টোডাদের কিরণ দিয়ে থাকে। মহিষপালকগোষ্ঠী এই টোডাদের মধ্যে দেখা যায় যে মৃতের অন্ত্যেষ্টির প্রারম্ভে একটি বা দুটি মহিষকে মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ করে; বিশ্বাস যে, বলিপ্রদত্ত মহিষের আত্মাও ঐ মৃতব্যক্তির আত্মার সঙ্গে ওমনোড়ে চলে যাবে এবং সেখানে ঐ মহিষেরাই তার ভরণপোষণে সাহায্য করবে।

ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে এই জগতের কোন ব্যক্তির কর্মপ্রকৃতির সঙ্গে 'মৃতের ভূমি'তে তার অবিনশ্বর অবশিষ্টাংশের পরিণতির বিষয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। অনেক গোষ্ঠীর ধারণায় এই পৃথিবীর জীবনধারার সঙ্গে অন্যজগতের জীবনধারার কোন সম্পর্ক নেই রেঙ্গমা নাগারা বিশ্বাস করে যে, সকল মানুষের আত্মাই পবিত্র এবং সুখময় মৃতের ভূমিতে গমন করে। তবে যারা অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে তাদের আত্মা এই 'মৃতের ভূমি'তে প্রবেশাধিকার পায় না। শেষোক্ত আত্মারা কোথায় যায় সে সম্পর্কে এদের কোন ধারণাই নেই অস্বাভাবিক মৃত্যু বলতে বোঝায় খুন, দুর্ঘটনা এবং সন্তান জন্মদানকালে মৃত্যু এওএদের মধ্যেও একই ধরনের বিশ্বাস রয়েছে। আসামের খাসি আদিবাসীদের ধারণা মৃতের আত্মা ভগবানের সুপারি কুঞ্জ, অধ্যুষিত উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করে, অপ্রতিহতভাবে সুপারি-চর্বণের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে। তবে যারা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছে এবং যাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সামাজিক প্রথা অনুযায়ী উদ্‌যাপিত হয়েছে তারাই কেবল এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। ছোটনাগপুরের খাড়িয়া আদিবাসীদের ভালো ও মন্দ মানুষের আত্মা বলে কোন ধারণা নেই—এদের মধ্যে 'মৃতদের ভূমি' বিষয়ক কোন চিন্তাধারার উন্মেষ হয়নি। আবার কোন কোন আদিবাসী-- যেমন রেঙ্গমা নাগাদের মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে যে জোচ্চোর, বদমাস এবং ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিদের আত্মা 'মৃতের ভূমি'তে খুব অসুখী জীবন যাপন করে, অপরদিকে সৎ ও উপকারী ব্যক্তিদের আত্মা সেখানে সুখেই দিন কাটায়। এইভাবে ভারতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নেওয়া নানা উদাহরণের সাহায্যে দেখা যাবে যে আদিম জনজাতির জীবনচর্যায় আত্মা এবং 'মৃতদের ভূমি' বিষয়ে মোটামুটিভাবে একমুখী একটা ধারণা গড়ে উঠেছে।

তবে জড়বাদী [Animistic] হিসেবে পরিচিত আদিবাসীদের চিন্তাধারায় স্বর্গ ও নরক এবং সেখানের বিভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত দেবতাদের রূপায়ণে আদিবাসী মানসিকতা সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহের প্রতি আদিবাসীদের চেতনা সদা জাগ্রতই নয় শুধু -- এরা সকল সময়ে এই শক্তিসমূহকে সমীহ করে চলে। তবে এই শক্তিসমূহ বরাবরই বিমূর্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের 'বোঙা' নামক মহাশক্তিশালী আধিভৌতিক দেবতা/শক্তি বিমূর্তভাবেই মানবমনে স্থান পেয়েছে। মানুষ এবং এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য কার্যকরী উপাদানসমূহের প্রতিটি পর্যায়ে যে মহাদেবতা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন বলে মানুষের যে বিশ্বাস, তাকে মানবীকরণের [Humanization] প্রয়োজন বোধ করেনি। বোঙা আজও আদি জনজাতির মনে একটি অস্পষ্ট প্রকাশ। কেবল 'বোঙার' ধারণার মধ্যেই নয়, আদিবাসীদের সর্বক্ষণের প্রয়োজনীয় দেবদেবীদের সকলেই তাঁদের প্রতীতিতে বিমূর্তভাবেই প্রতিষ্ঠিত। আজও এই ধারণা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান। কাজেই প্রকৃত আদিবাসী চেতনায় 'মৃতের ভূমি' বিষয়ক ধারণার উদ্ভব ঘটলেও সেটি আদিবাসী মানসিকতা এবং জাদু-ধর্মীয় পরিমণ্ডলের নিজস্ব গতিবিধিতে পরিশীলিত হয়েছে। এটিই আদিবাসীদের নিজস্বতা। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেই অকৃত্রিম নিজস্বতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের ভিন্ন বিশ্বাস ও চিন্তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজস্ব মৌলিক চিন্তার উপর প্রক্ষিপ্ত বিদেশি ভাবধারার প্রতক্ষফল জটিল জীবনাবর্তকে প্রকটিত করে। কোন সংস্কৃতির লক্ষণাবলী আলোচনার সময় এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় সমগ্র আলোচনা ভুল পথে পরিচালিত হবে।

বৈদিক ভারতের দর্শন মৃতের ভূমির এই চিন্তাধারাকে বিভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কারের বাতাবরণে আরও সুসম্বদ্ধ করেছে। এই সম্পর্কিত ধারণার পরিমণ্ডলে ধোঁয়াশাকে অবলুপ্ত করে সামগ্রিক চিত্রটিকে সুপরিস্ফুট করে তোলা হয়। মৃতের ভূমি [Land of the dead] মৃতের রাজ্যে [Realm of the dead] পরিণত হল। এই রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতি হলেন যমরাজ। জন্মের সঙ্গে মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু দুটির প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন—এই দুটি বিষয় মানুষের মনে অন্যতর চিন্তার উদ্রেক করে। জন্মের মুহূর্তে জীবন চোখ মেলে তাকায়—সমগ্র পৃথিবী আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। অপরদিকে মৃত্যুর প্রভাবে সেই প্রস্ফুটিত দৃষ্টি নিমীলিত হয়। আলোর জগৎ মুহূর্তে হয়ে যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। আলো অর্থাৎ জীবন থেকে অন্ধকার অথবা মৃত্যুপথে পাড়ি দেওয়ার এই ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে জৈবিক কার্য-কারণের প্রক্রিয়ারভুক্ত, কিন্তু মানবসংস্কৃতি একে ভিন্ন চিন্তাখাতে প্রবাহিত করেছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানাধরনের লোককথা ও কাহিনী। এইসব কথা ও কাহিনী ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সংশ্লেষিত হয়ে বিচিত্র চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এই কারণে মৃত্যুর মত একটি সম্পূর্ণ জৈবিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের নিজস্ব পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং মানসিকতাকে ভিত্তি করে বহুবিধ চিন্তার বিকাশ ঘটছে। হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ প্রথম থেকেই বিচিত্র প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে বিমূর্ত চিন্তাধারার পরিমণ্ডল থেকে সরিয়ে এনে মূর্ত চেতনার মধ্যে আনার চেষ্টা করেছে। এইসব কাল্পনিক শক্তিসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা ছাড়াও এদের মানুষরূপে দেখানো হয়েছে। হিন্দুর পৌরাণিক চিন্তায় বহুবিধ পার্থিব অথচ নৈর্ব্যক্তিক শক্তিসমূহের উপর নরত্বারোপ শুরু হয়। সুপ্রাচীন ভারতের আদি ভাবনার মধ্যে যে সর্বপ্রাণবাদরূপী বিশ্বাস সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলিই হিন্দুপুরাণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবীয় রূপ লাভ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে অতি নিপুণ চিত্র তৈরি করা হয়।

ঐ বিশিষ্ট চিন্তাপ্রসূত চিত্রটির মূলে ছিল যমরাজের অমোঘ উপস্থিতি,—যে যমরাজ বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছেন। মূল পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে বলা হয় যমরাজের পদমর্যাদা কিন্তু দেবতাদের অনুরূপ নয়। তিনি সম্পূর্ণভাবে দেবতাও নন—আবার সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উর্ধ্বে তাঁর স্থান। কাজেই কোন কোন সময় তাঁকে বলা হয় দেবতা-মানব [god-man], যিনি এই বিশ্বচরাচর এবং মনুষ্য সৃষ্টিতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

ক্ষেত্রবিশেষে যমকেই পৃথিবীর আদিমানব হিসেবে মনে করা হয়। তিনিই আবার মানুষের কর্ম-অকর্মের বিশ্লেষক, নিয়ন্ত্রক এবং বিচারক। যমের উৎপত্তির বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে নানা ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। সবগুলিই বহুবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এইসব আলোচনায় দেবলোক এবং মনুষ্যলোকে যমের সঠিক স্থান নিরূপণ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে;—তাই কোন স্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে পারেনি। তবে একথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, যম হলো মৃতের দেবতা এবং যম ও মৃত্যু প্রতীতিবাচক শব্দ। এই কারণে মানুষকে বিশ্বাস করতেই হয় যে জীবনে অন্য কোন দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য না হলেও যমের সাক্ষাৎ অতি অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে এই সাক্ষাৎকারে মানুষ কখনও পুলকিত বোধ করে না, বরং এই যমের দেখা পাওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে পারলেই মানুষ স্বস্তি পায়। এই প্রসঙ্গে সেই অতিপ্রচলিত লোককাহিনীটির কথাই মনে পড়ে:

এক অতি গরিব বৃদ্ধ কাঠুরিয়া সারাদিন জঙ্গলে কাঠ কেটে সেগুলি মাথায় করে বয়ে নিয়ে

রোজই বাড়ি আসত। এটিই ছিল তার একমাত্র জীবিকা। তবে তার শারীরিক অসুস্থতা এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম তাকে জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। কাজেই কাঠ কাটার পরিশ্রমের মধ্যে সে মাঝে মাঝেই মৃত্যু কামনা করত। মরণ হলেই সে যেন বাঁচে—এটাই ছিল তার মানসিকতা। একদিন দু-বোঝা কাঠ কেটে আর সেগুলি মাথায় তোলার শক্তি তার হচ্ছে না; নানাভাবে চেষ্টা করেও সে পারছে না। শরীর আর চলে না— ক্ষিদে তেষ্টায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমতাবস্থায় সে মনে মনে ভাবল যে এভাবে বাঁচার থেকে মৃত্যুই ভাল। তাই সে যমরাজকে ডাকতে লাগল। মৃত্যুদেবতা যেন দর্শন দিয়ে তার এই অসহ্য কষ্টকে লাঘব করে দেন। বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার সেই আকুল আহ্বানে যমরাজ সাড়া না দিয়ে পারলেন না। তিনি হঠাৎ বৃদ্ধের সম্মুখে হাজির হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে তাঁকে আহ্বান করার কারণ জানতে চাইলেন। যমরাজকে দেখে বৃদ্ধের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। মুহূর্তে সাহস সঞ্চয় করে বৃদ্ধ বলে উঠল: 'ও, বাবা যম, তুমি এসে গেছ? দাও বাবা কাঠের বোঝা দুটো মাথায় একটু তুলে দাও। কাউকেই ডেকে ডেকে পেলাম না—শেষ পর্যন্ত তোমারই শরণাপন্ন হলাম।' কাজেই জীবনে শত-সহস্র বিপর্যয়ে থেকেও মানুষ আন্তরিকভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চায় না। কিন্তু মৃত্যুকে আলিঙ্গনে অনিচ্ছুক হলেও প্রতিটি মানুষের মৃত্যু অবধারিত।

পৌরাণিক কথা ও কাহিনীতে যমরাজই সেই মৃত্যুর নিয়ন্তা। উত্তরপ্রদেশের লোককথায় রয়েছে যে এই যমরাজের চেহারা ভীতিপ্রদ। তাঁর দেহের রং সবুজ, রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় এবং ছেদক দাঁত দুটি দীর্ঘ। কালো রঙের মহিষের পিঠে চড়ে যখন তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন তখন তাঁর সহচর হিসেবে থাকে চারচক্ষু-বিশিষ্ট দুটি ভয়ঙ্কর কুকুর। মহিষারূঢ় যমরাজের মাথায় থাকে অগ্নিশিখার মুকুট, ডান হাতে থাকে মনুষ্য-করোটি-খচিত একটি গদা এবং বাঁ হাতে দেখা যায় একটি মোটা দড়ির ফাঁস। এই ফাঁসের সাহায্যেই মৃতদের আত্মাগুলিকে আটকে তাঁর রাজত্বে নিয়ে যাওয়া হয়। যম মৃত্যুপুরীর একচ্ছত্রাধিপতি। তিনি একদিকে মৃত্যুর দেবতা, অপরদিকে মৃতদের বিচারক,— এই কারণেই তিনি ধর্মরাজ। মৃতব্যক্তির সারাজীবনের কর্মফলের বিচার-বিবেচনায় যমরাজের রয়েছে অনন্য দক্ষতা—এই কাজটি অত্যন্ত নিষ্ঠা, সতর্কতা এবং পক্ষপাতবিহীন ভাবে তাঁকে করতে হয়। এইজন্যই যমরাজের বিচার শেষবিচার হিসেবে স্বীকৃত। এই শেষ বিচারের দিনটির জন্য সকল মানুষকেই সতর্ক থাকতে হয়।

যমরাজ ও মৃত্যুপুরীকেন্দ্রিক এই বহুবিস্তৃত ধারণাটি নানাভাবে ভারতীয় জনমানসে বিরাজিত। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসমাজের চিন্তার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূলগতভাবে বিষয়টি একটি ধারণায় কেন্দ্রীভূত। মানবসমাজ ও তার বহুরূপী কর্মপদ্ধতির পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ করলে এই সামগ্রিক বিষয়টিকে প্রতীকীকরণ [Symbolism] প্রক্রিয়ার মধ্যেই মূল্যায়ন করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন মানবসমাজে প্রতীক এবং প্রতীকীকরণ বিষয়টি খুবই কার্যকরী এবং সেদিক থেকে চিন্তা করলে যমরাজ, তাঁর পারিষদবর্গ এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনধারার মূল্যায়ন ও প্রয়োজনানুযায়ী বিচার ভারতীয় পৌরাণিক জগতের অন্তর্গত বিচিত্র লক্ষণাবলী সমৃদ্ধ। সমাজ নিয়ন্ত্রণের এবং মানুষের কর্মপদ্ধতির সঠিক পরিচালনায় এমন গভীর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রচেষ্টা খুব কমই আছে। এর ফলে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সুষ্ঠুভাবে এবং মানুষের ব্যবহারও সংযত হয়েছে। এই কারণেই তদানীন্তন কালের সমাজধারার বিভিন্ন পর্যায়ে নানাধরনের প্রতীকীকরণের সার্থক প্রয়োগ করা গেছে। এই প্রতীকীকরণের দুটি বিশিষ্ট রূপ। যাদের একটিকে বলা হয় উল্লেখনীয় প্রতীকীকরণ [Referential Symbolism] এবং

অপরটি হল ঘনীভূত প্রতীকীকরণ [Condensation Symbolism]।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সব সময়েই এই সমস্ত প্রতীক ব্যবহার করে থাকি। যেমন টেলিগ্রাফের সংকেতলিপি [Code] একটি বিশেষধরনের উল্লেখনীয় প্রতীকীকরণের উদাহরণ। জাতীয় পতাকা পৃথিবীর প্রতিটি জাতির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। পতাকার ধরন ও বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেই আমরা সংশ্লিষ্ট জাতির পরিচয় পেয়ে থাকি। এই প্রতীকচিহ্নটির মধ্যে বস্তুগত মূল্য তেমন কিছুই নেই, কিন্তু যেটি অত্যন্ত গভীরভাবে উপস্থিত তা হল আবেগমূলক মানসিকতা। সেই জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষায় কত মানুষ অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এবং এখনও সেই সম্মানের যাতে কোন রকম হানি না ঘটে তার জন্য সংশ্লিষ্ট মানুষেরা সদাসতর্ক। একটি জাতীয় পতাকার অবমাননার অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশ এবং জাতির প্রত্যক্ষ অপমান। এখানেই রয়েছে প্রতীকীকরণের মূল তাৎপর্য। লাল আলো বিপদের প্রতীক। দ্রুতগামী রেলগাড়ি লাল আলোর সংকেতে গতিরুদ্ধ হয়। এই বিপদনির্দেশক প্রতীকটিকে যদি না মানা হয় তাহলে কি ধরনের বিপর্যয় ঘটবে তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। লাল আলো সাধারণভাবে আরও পাঁচটা রঙের আলোর মতই—এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে কিছু নেই। তবে এই লাল আলো যখন একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত, তখন তার গুরুত্ব হয় অপরিসীম। একটি আলো দেখিয়েই বিশাল কর্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় প্রতীকীকরণ, অর্থাৎ ঘনীভূত প্রতীকীকরণটি ঠিক একইভাবে আবেগপূর্ণ মানসিকতায় পরিশীলিত এবং সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে এর মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত আচার-আচরণের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে থাকে। এরই মধ্য দিয়ে সচেতন অথবা অচেতন-ভাবে মানুষের আবেগ মুক্তি পায়। মানুষের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে এই শেষোক্ত প্রতীকীকরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

যে-কোনো দেশের জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে সুষ্ঠু সমাজ-পরিচালনা অসম্ভব। একটা সময় ছিল যখন সমাজে কোন-প্রকার আইন কানুনের অস্তিত্বই ছিল না। কাজেই আইনরক্ষকরাও ছিল অনুপস্থিত। অথচ প্রতিটি মানুষের গতিবিধির প্রতি সমাজকর্তাদের তীক্ষ্নজর রাখতে হবে। সকলেই যে যার খেয়াল-খুশিমত কাজ করলে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সমাজে যদি নিয়মানুবর্তিতা রক্ষিত না হয় এবং মানুষকে যদি সঠিক কর্মপথে পরিচালিত করতে না পারা যায় তাহলে সেই সমাজব্যবস্থা এলোমেলো [Disorganised] হয়ে পড়বে। পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম সমাজব্যবস্থায় এই কারণেই নানা প্রকার পৌরাণিক কথা/লোককাহিনী বিষয়ক নানা চিন্তা থেকে উদ্ভূত প্রতীকের প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতীয় বৈদিক সভ্যতায় বিচিত্র সব চিন্তাসমন্বিত পৌরাণিক কথা ও কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল যমরাজকেন্দ্রিক ধারণা।

ভারতীয় দর্শনে পরকালের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহকালে নানান দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে হয়—মৃত্যুপরবর্তী ধারণা-সৃষ্টি করে মানুষ পরজন্মে সুখে থাকার ব্যবস্থা করেছে। ইহকালের দুঃখ-রোগ-শোক সহ্য করার পর পরকালে শান্তি ও স্বস্তিই প্রাথমিকভাবে কাম্য। তবে ইহকালের কর্মধারা যদি সৎপথে পরিচালিত হয় তাহলেই পরকালের জীবন সুখময় হতে পারে। ভারতীয় ধর্মীয় দর্শনে এই পরকালের পরিমণ্ডলটিতে যমরাজের আসন তৈরি করেই প্রতীকীকরণ করা হয়েছে। সমগ্র পরকালের প্রতীক যমরাজ। প্রতিটি মানুষের জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবনপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত তার মধ্যস্থিত সমস্ত প্রত্যক্ষ কর্ম ও পরোক্ষ চিন্তার মূল্যায়ন

যমরাজের সান্নিধ্যে হয়ে থাকে। যমরাজই প্রতিটি মানুষের পরকালের ভাগ্যনিয়ন্তা। সকল মানুষকে সৎপথে চালিত করার এবং যে-কোনো ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য যমরাজের বিচারের কথা ভালোভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুপুরীর অধীশ্বর যম কর্তৃক মৃতব্যক্তির আত্মার বিচারক্রিয়াটি পরিপূর্ণভাবে প্রতীকী। বিভিন্ন সামাজিক-মনস্তত্ত্বভিত্তিক চেতনার উদ্রেক করে যমরাজ সম্পর্কিত পৌরাণিক ধারণাগুলিকে সমাজ-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনেই তৈরি করা হয়েছিল। কাজেই যমরাজ, তাঁর পারিষদবর্গ, তাঁর বিচার এবং শাস্তিদান অথবা পুরস্কার প্রদান বিষয়ক যে বহুবিচিত্র ও বিস্তৃত চিন্তার প্রকাশ আমরা বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে বা লোকজীবনের বিশ্বাস ও সংস্কারে আজও ভীষণ রকম সজীব দেখি ;—তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা বা কল্পনার প্রভাব যাই-ই থাক না কেন তাতে সক্রিয় রয়েছে সমাজ-অনুশাসনাত্মক একটি প্রচেষ্টা।

মৃত্যুদেবতা যমরাজের প্রাসাদ সবিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ। এখানেই স্থাপিত হয়েছে তাঁর বিচারাসন। পবিত্রতা ও সত্যের প্রতীক এই আসন ত্রিভুবন-বন্দিত। যমরাজ সত্যের অনুসরণকারী হিসেবে পরিচিত— ধর্মরক্ষাই তাঁর প্রধান ব্রত। এই কারণেই তিনি ধর্মরাজ। প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর পর যমরাজের এই বিচারাসনের সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়। এই আড়ম্বরপূর্ণ এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত যমরাজের প্রাসাদে রয়েছেন বহু পাত্রমিত্র, যাঁরা অবিচ্ছিন্নভাবে বিশাল ও বহুবিস্তৃত মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনের বিবিধ জীবনচর্যাকে পর্যালোচনা করে চলেছেন। যমরাজকে প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর দিনক্ষণ সম্পর্কে সকল সময়েই অবহিত থাকতে হয়—কেবল তাই নয়, এদের প্রত্যেকের পাপ-পুণ্যের উপর নির্ভর করছে মৃতব্যক্তির আত্মার শাস্তি অথবা পুরস্কার—তার ভবিষ্যৎ। স্বর্গ অথবা নরকের কোন্ বিশেষ স্তরে তার স্থান হবে এবং তার সময়সীমা কতখানি সেসব নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সারাজীবনের কর্মকাণ্ডের উপর। এই সকল বিষয়ে যমরাজের কাজে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন তাঁর বিশেষ নিবেষক [Recorder] 'চিত্রগুপ্ত'। তাঁর বহুবিস্তৃত ও অন্তহীন খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ হয় পৃথিবীর মানুষের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ। অত্যন্ত নিষ্ঠা, মননশীলতা এবং গভীরভাবে অনুসন্ধানের পরই লিখিত হয় পৃথক পৃথক মানবের বিশিষ্ট কর্ম ও চিন্তা—যেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং বিচারের পরেই যমরাজ তাঁর বিধান [Ruling] দেবেন। সেই বিধান অনুযায়ী মৃতব্যক্তিরা কোথায় যাবে তা ঠিক হবে এবং তারই উপর ভিত্তি করে যমরাজের দূতেরা মৃতব্যক্তিদের তাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে। যমরাজের প্রশাসন-এলাকায় স্বর্গের মত শোভাময় এবং আনন্দমুখরিত স্থান রয়েছে—যেখানে দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ অতীব ছন্দোময়। এছাড়া রয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন নরক যেখানে জীবনযন্ত্রণা অতীব প্রকট। দুঃখময় পরিস্থিতি এবং নানা নির্যাতনের মধ্যে এখানকার বাসিন্দাদের জীবন অতিবাহিত হয়। জীবন বলতে এখানে বোঝাচ্ছে মৃত্যু-পরপারের জীবন। একটি অধ্যায়ের সমাপনান্তে অপর একটি অধ্যায়ের আরম্ভ। এই দুটি অধ্যায়ের সীমান্ত এলাকায় রয়েছে যমরাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব। চিত্রগুপ্তের কাছে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাবনিকাশ, সৎ ও অসৎ কর্মের ধারাবাহিক উল্লেখ থাকলেও যমরাজের আরও একটি পুস্তক নিজস্ব পরিচালনার মধ্যে রয়েছে—যার নাম হল বৃহৎ নিয়তি পুস্তক [The Book of Destiny]। যখন এই বৃহৎ পুস্তকে দেখা যাবে যে, কোন একজন ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত, তখন সঠিক নির্দেশ দিয়ে যমরাজ তাঁর অনুচরদের সেই মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির নিকট পাঠাবেন। এদের কাজ হল ঐ ব্যক্তির আত্মাটিকে বেঁধে যমরাজের দরবারে হাজির করা। বিশেষ প্রয়োজনবোধে যমরাজ নিজেই পৃথিবীতে মৃত্যু পথযাত্রীদের নিকট হাজির হন।

তারপর তাঁর আবাসভূমিতে বসবে বিচারসভা। সেই বিচারের ফলাফলের ভিত্তিতে তার স্থান হবে স্বর্গ ও নরকের নানা স্তরভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে।

অতিসংক্ষিপ্তাকারে এটিই হল যমরাজের প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যান। এই বিশেষ কল্পকাহিনীর অন্তরালে উঁকি দিলে আমরা দেখতে পাব যে, মানুষকে বোকা বানানোর কোন প্রয়াস এখানে নেই, বরং মানবের সামাজিক জীবন যাতে সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য যমরাজের উপস্থাপনা, তাঁর বিচারব্যবস্থা এবং মানুষের ভাগ্যনির্ণয় ইত্যাদি 'আরোপমূলক' একটি স্বয়ংক্রিয় সমাজ-ধর্মীয় পদ্ধতি হিসেবেই বিবেচিত।

এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে আইন হল এমন একটি সামাজিক সংস্থা [Social institution] যার অভাবে সমাজ তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে দেখা যায় যে এই নিয়ন্ত্রণ-রক্ষাই হল মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য। মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে একধরনের সমাজব্যবস্থা আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে গোষ্ঠীবদ্ধতা রয়েছে, দায়বদ্ধতা অনুপস্থিত নয় এবং অধিকার-সংক্রান্ত মানসিকতাও রয়েছে। শিশুপালন, রক্ষা এবং তাদের প্রশিক্ষণেও এদের সময় অতিবাহিত হয়। বহিঃশক্রর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য সমবেত প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। বিপদের মুহূর্তে সতর্কীকরণের বিশেষ প্রক্রিয়াও এই মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সমাজব্যবস্থা গতিশীল নয় এবং এর কোন নিয়ন্ত্রক নেই। কাজেই এগুলি অসম্বদ্ধ।

অন্যপক্ষে মানবসমাজ ভিন্নপথে পরিচালিত হয়েছে। কারণ সংস্কৃতির প্রকাশ এবং আরোপ এই সমাজব্যবস্থাকে পরিশীলিত করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে এখানে এসেছে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। সমাজ-নিয়ন্ত্রণের দুটি বিশিষ্ট পন্থা রয়েছে—এদের একটি হল বিধিবহির্ভূত এবং অপরটি প্রথাগত। প্রথমটিতে রয়েছে বিশ্বাস, সংস্কার, সামাজিক উপদেশ, রীতি-নীতি, ধর্মীয় চিন্তা, জনমত ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টি আইন এবং শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তাধারায় রূপায়িত। এই প্রথাগত পন্থাটি এসেছে অনেক দেরিতে অর্থাৎ মানবসমাজের বিকাশ ঘটে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে, তবেই আইন সম্পর্কিত বিষয়ের উপস্থাপনা হয়েছে। কিন্তু প্রাক্-আইন পর্যায়ে যে দীর্ঘসময় মানবসমাজ প্রবাহিত হয়েছে, তার নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সামাজিক অনুশাসন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই অনুশাসন রক্ষায় এবং পরিচালনে কোন পুলিশি ব্যবস্থা ছিল না—আইন রক্ষায় যার প্রয়োজন অপরিহার্য। এছাড়াও সেই সমাজ-ব্যবস্থায় আইন অমান্যকারীদের আদালতের মাধ্যমে বিচার এবং প্রয়োজনবোধে শাস্তিদানেরও কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় সেদিনের সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সমাজকর্তাদের নানাধরনের প্রতীকী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের লোককথা, লোককাহিনী, বিশ্বাস-সংস্কারের জাল বুনে সৃষ্টি করা হয়েছিল এমন পরিমণ্ডল যে মানুষ সহজেই সেগুলিকে বিশ্বাস করার মানসিকতা তৈরি করতে পারে এবং নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিজেই সতর্ক থাকতে পারে। এই জগতের বিভিন্ন ধরনের অপরাধের বিচার করার জন্য এখানে কেউই নেই এবং অপরাধীর শাস্তি তার জীবিত অবস্থায় হবে না। সে জীবনের পরপারে পাড়ি দিলে যমরাজের বিচারালয়ে তার বিচার হবে। প্রতিটি মানুষের কর্মফল এবং তৎসংক্রান্ত পাপ-পুণ্যের হিসাব যথাযথ রাখা হচ্ছে সেই অজানা জগতের বিচিত্র সব নথিপত্রের মধ্যে।

পাপ-পুণ্য প্রত্যয়টি [Pap-Punya or 'Virtue and Vice' Concept] একসময় ভারতীয়

জনজীবনে অত্যন্ত গভীরভাবে ছিল। পাপ এবং পুণ্য এই দুটি বিষয়কেন্দ্রিক চিন্তার প্রকৃতি আপেক্ষিক হলেও সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থায় এ-সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশাবলী উপস্থাপিত করার রেওয়াজ ছিল। ঐ বিশেষ সমাজমধ্যস্থিত মানুষেরা পাপ-পুণ্য বিষয়ে সদা-সতর্ক থাকত। কারণ তাদের সমগ্রজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি বিষয়ের সঞ্চয় পরবর্তী জীবনে যমরাজ কর্তৃক মূল্যায়িত হবে। পাপ এবং পুণ্যকর্ম গোপনে সংঘটিত হলেও সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ সেই চিত্রগুপ্ত রক্ষিত এবং পরিচালিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ হবে। যেভাবেই হোক সেদিনের মানুষের মানসিকতাকে ঐ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তোলা বহুলাংশেই সম্ভব হয়েছিল। কাজেই পাপ-পুণ্য ধারণাটির কার্যকারিতার প্রত্যক্ষ ফল হল মানুষকে তার কৃতকর্ম বিষয়ে সজাগ করে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সৎকাজের দিকে, মঙ্গলময় চিন্তাধারার পক্ষে মানুষকে আকর্ষণ করে তাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করা। অপরাধমূলক কাজগুলিকে মানুষ নিজেই চিহ্নিত করে সেগুলি থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার চেষ্টা করে এসেছে। যে-সমাজ-ব্যবস্থায় কোন আইনরক্ষাকারী এবং নীতিবহির্ভূত কর্মে বিরত করার মত কোন প্রহরীর ব্যবস্থা নেই, সেখানে সাধারণ মানুষকেই তাদের নীতিনির্ধারণে সচেষ্ট হতে হবে, অন্যথায় সেই সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে না। কাজেই ভারতীয় সমাজদর্শনে পাপ-পুণ্য ধারণাটির বিকাশ ঘটেছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে। ফলে উক্ত ধারণা আজও কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের সঠিক গতিপথ নির্ধারণে প্রত্যক্ষ সহায়তা করে থাকে। নৃবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে এই ধরনের চিন্তাগুলির যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে বাস্তব-অবাস্তব, সত্য-মিথ্যা যাই-ই থাক না কেন এটি একটি বিশিষ্ট নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এইধরনের বিশ্বাস-সংস্কারের উদ্ভবটিকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Conceptualization অর্থাৎ 'প্রত্যয়কেন্দ্রিক চিন্তন'। ধীরে ধীরে জনজীবনের নানা কথা ও কাহিনীতে, প্রবাদ ও প্রবচনে, ব্যবহার-পদ্ধতিতে এই প্রত্যয়টির কার্যকরী অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর অর্থই হল জনস্বীকৃতি। সমাজের যে-কোনো ধরনের চিন্তার গণ-অনুমোদন আবশ্যিক এবং সেই অনুমোদন লাভের জন্য যে-কোনো নিয়ম বা রীতি-নীতির পরিকল্পনাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যা সাধারণভাবে মানুষের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে এবং যা কখনই মানুষের মানসিকতা-বিরোধী হবে না। পাপ-পুণ্য প্রত্যয়টি আর কিছুই নয়—মানুষের কর্ম ও চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য কেবল একটি ভাবাত্মক ও আকর্ষণ-বিকর্ষণমূলক প্রচেষ্টা; একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি এবং চিরকালীন মূল্যবোধের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যা ভাবাত্মক হয়ে যুক্ত আছে যমরাজ এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও বিচার প্রণালীর সঙ্গে। ইহজগতে পুণ্য অর্জন করতে পারলে তার জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটবে যমরাজের দরবারে। ভারতীয় দর্শনে ইহজগতের সুখ ও শান্তি নয়, পরপারের জীবনকে নিশ্চিত ও সুখময় করে তোলার জন্যই এপারের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নিরন্তর চেষ্টা।

পাপ-পুণ্যের ঘেরাটোপে যে-সকল নিয়মকানুন রয়েছে সেগুলি লঙ্ঘন, এমনকি অশ্রদ্ধা করলে পাপী হিসেবে তার চরম শাস্তি হবে। বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিষয় উল্লেখ করে সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘনকারী এবং অপরাধমূলক ও জনবিরোধী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। দুষ্টপ্রকৃতির লোক যারা সকল সময়েই মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তারা হয়ত এই জগতে বহাল তবিয়তেই থাকবে, তবে ইহজীবনের সীমানা পার হলেই যমরাজ তাদের

ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দেবেন। কেউ কোনো প্রাণী বধ করলে তাকে এমন স্থানে বন্দী করে রাখা হবে যেখানে একটি দৈত্য তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে জন্ম জন্ম নরকবাস এবং সেই নরকে হত্যাকারীকে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। অত্যাচারী ও প্রজানিপীড়ক রাজাকে শাস্তি হিসেবে দুটি দণ্ডের মাঝখানে রেখে পিষে ফেলা হবে। নিজ জাতিগোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ করলে যমলোকে তাদের আগুনে লাল হয়ে যাওয়া লৌহদণ্ডকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য করা হবে। ঋণ করে শোধ না করলে সেই ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে যেতে হবে যমালয়ে এবং সেখানে তাকে নরকের অন্ধকার কোণে চিরস্থায়ীভাবে ফেলে রাখা হবে। কোনো দেশশাসক বা রাজা ধর্মীয় বিরোধিতার সৃষ্টি করলে তাকে নোংরা পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলা হবে এবং সেখানে অতিকায় হিংস্র জলজন্তুরা তার দেহের মাংস ছিঁড়ে খাবে। পৌরাণিক কথার মধ্যে এমনি বহুধরনের অসামাজিক এবং সমাজবিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপের ভয়ঙ্কর সব শাস্তি বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই সকল পাপ-পুণ্যবোধ এবং দোষীর শাস্তি-বিধানের মাধ্যমে মানুষকে সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ফলে, মানুষ পরপারের জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য এপারের সামাজিক অনুশাসনগুলির অমর্যাদা করতে সাহস পাবে না।

ভারতীয় পুরাণে যমরাজের উপর মানুষের নিয়তি নির্ধারণের ভার অর্পণ করা হয়েছে। তাঁর সুবৃহৎ 'নিয়তি পুস্তক'-এ প্রতিটি মানুষের মৃত্যুক্ষণ নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ মারণ-ব্যবস্থা পরিচালনায় যমরাজের দায়িত্ব গুরুতর এবং নির্ভুল। এতটুকু ভুল হওয়ার উপায় নেই। ভুল হলে কি ধরনের বিড়ম্বনা হতে পারে তা 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'-এ আমরা দেখেছি। যমরাজের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সর্বব্যাপী—এই দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলার সাধ্য কারোবই নেই, একথা মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে। যমরাজের 'নিয়তি পুস্তকে'র কোন নির্দেশই লঙ্ঘিত হওয়ার নয়, এমনকি স্বয়ং যমরাজও এই নিয়মে বাঁধা। মৃত্যুকে মানুষ ভয় পায় এবং অস্বীকার না করলেও তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষাতেও মানুষ ঠিক ভরসা পায় না। কারণ মানুষ মনে করে যে যমরাজের বিচারব্যবস্থায় ভাবালুতার কোনো স্থান নেই। তাঁকে খুশি করে মৃত্যুদিনকে কোনক্রমেই পিছিয়ে দেওয়া বা শাস্তিভার লাঘব যায় না। এই বিশ্বাসের কারণেই বোধ হয় যমরাজের আনুষ্ঠানিক কোনো পূজার ব্যবস্থা নেই।

তবে প্রত্যক্ষভাবে যমরাজের সন্তুষ্টিবিধান না করলেও মানুষ অন্য পথ ধরেছে। লোকজীবনের নানা আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্যবহার-পদ্ধতির মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যায়। একে বলা যেতে পারে 'এড়িয়ে চলা [Avoiding Process] পদ্ধতি'। অর্থাৎ কোন না কোন কৌশল অবলম্বন করে যমরাজের শ্যেনদৃষ্টি থেকে দূরে থাকার প্রচেষ্টা। অনেক সময় অন্য 'হেভিওয়েট' দেবতার শরণাপন্ন হয়ে যমরাজের মৃত্যু-পরোয়ানা প্রতিহত না কবতে পারলেও তার অমোঘতাকে কিছুটা হ্রাস করে নেওয়া যায়, কিছু 'ঘুর পদ্ধতি' গ্রহণ করে। বিশিষ্ট দেবতাদের প্রত্যক্ষ পূজা নিবেদন না করেও কেবল তাঁদের নাম উচ্চারণ করেও যমকে কিছুটা ঠেকানো বা ঠকানো যায়।

অজামিল নামে এক দুষ্টপ্রকৃতির লোক সারাজীবন মানুষকে ঠকিয়ে, নানাভাবে তাদের উৎপীড়িত করে কাটিয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি ভুল করেও সে কোনদিন শ্রদ্ধা জানায়নি। তার একমাত্র পুত্রের নাম 'নারায়ণ'। মৃত্যুশয্যায় অজামিল বারে বারে তার পুত্রকে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলে ডাকতে লাগল। এদিকে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে নারায়ণ তাঁর নাম শুনে উদাসীন থাকতে

পারলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুচরদের ঐ মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে পাঠালেন। নারায়ণের হস্তক্ষেপে যমরাজ পিছু হটতে বাধ্য হলেন। অজামিলের মৃত্যু হল না। তবে তার পাপময় জীবনের জন্য ভীষণ ভাবে অনুতপ্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে মুক্তি পেলো।

ভারতীয়দের মধ্যে [মনে হয় ধর্ম নির্বিশেষে] দেবদেবীর নামে ছেলেমেয়েদের নাম রাখার রেওয়াজ এই মনস্তত্ত্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল। সামান্য স্তিমিত হলেও আজও সেই ঐতিহ্য প্রবহমান। কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যমরাজকে তাঁর নিজস্ব আইন পরিত্যাগে বাধ্য হয়ে হার স্বীকার করতে হয়েছিলো সাবিত্রীর কাছে। সেই পৌরাণিক কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা।

গ্রামীণ লোকজীবনে একটি বিশেষ প্রথার প্রচলন দেখা যায় যেখানে যমরাজকে এড়িয়ে বা ঠকিয়ে চলার চেষ্টা আছে; অর্থাৎ যেমন কোনো মৃতবৎসার সন্তানকে আর যাতে না যমে নেয় তার জন্য কতকগুলি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন :

১. জাতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত শুদ্ধ-অশুদ্ধ-বিচার-বোধাত্মক [Purity-Pollution Concept] একটি প্রত্যয়। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য রূপী যে-মানসিকতা সমাজে অসমতা সৃষ্টি করেছে, তারই উপর নির্ভর করে যমরাজের দৃষ্টিকে এড়ানোর চেষ্টা। উদাহরণ : উচ্চবর্ণের মহিলার সন্তান প্রসবে সাহায্যকারী দাইরা সব সময়েই ডোম, বাউড়ি, হাড়ি প্রমুখ অন্ত্যজ শ্রেণীর হতেন। তাই উক্ত মৃতবৎসা আঁতুড় ঘরেই দাই-এর উচ্ছিষ্ট সদ্যোজাতের মুখে ঠেকিয়ে তাকে অন্ত্যজ করে দেয়। অথবা কখনও কখনও ঐ দাই মৃতবৎসার সন্তানটিকে প্রতীকার্থে কিনে নেয়। ভাবটা এই রকম যে এভাবে অস্পৃশ্য করে দিলে শিশুটিকে গ্রহণ করতে যমরাজ ততটা উৎসাহ বোধ করবেন না।

২. সন্তানদের সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর নাম ধরে ডাকলে তাদের প্রতি যমরাজের দৃষ্টি তাড়াতাড়ি আকৃষ্ট হতে পারে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে লোকসমাজ সন্তানদের নাম দেন হেগো, ছেরা [পাতলা পায়খানা], গুয়ে, পচা ইত্যাদি। অর্থাৎ সুন্দর ও আকর্ষণীয় শিশু ছেড়ে উক্ত ঘৃণা উদ্রেককারী নামের প্রতি যমরাজের দৃষ্টি পড়বে না।

৩. তাছাড়াও অনেকসময় মৃতবৎসা তাদের সন্তানদের যমের হাত থেকে বাঁচাতে আঁতুড়ঘরেই ঐ সব নবজাতকদের এক-কড়ি, পাঁচ-কড়ি, তিন-কড়ি, অথবা এক মুঠো খুদ দিয়ে অন্য সন্তানবতীর কাছে বিক্রি করে দেয়—তা-হলে অন্যের ক্রীত সন্তানের প্রতি আর যমের দৃষ্টি পড়বে না—মনে করা হয়। [বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে তাঁর মা তিন মুঠো ক্ষুদের বিনিময়ে তার দিদির কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এই জন্য তাঁর নাম ক্ষুদিরাম]। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মৃতবৎসারা মনে করেন তাঁর গর্ভের প্রতি যমের কুদৃষ্টি আছে—তাই তাঁর সন্তান হয়ে হয়ে মরে যায়। এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কেবল পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রেই যমের কু-দৃষ্টি এড়াতে এরকম ছলনা করা হয়। কন্যাসন্তানের বেলায় ?

৪. ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানে বোনেদের ফোঁটা দেওয়ার মাধ্যমে যমের দুয়ারে কাঁটা দেওয়ার প্রথাটি আজও সক্রিয়। এর মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বাস্তব-অবাস্তব লক্ষণাবলীর কোনো প্রশ্ন নেই। লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তু ও উপাদানের ক্ষেত্রে এগুলি আজও সজীব। এর মাধ্যমে যমের দুয়ারে হয়ত কাঁটা পড়ে না ঠিকই, তবুও ভাইবোনের পারস্পরিক সম্প্রীতি সমাজজীবনকে মধুর ও প্রাণময় করে তোলে।

যমরাজ এক প্রতীকী দেবতা। এঁকে মানুষ সরাসরি এবং ব্যাপকরূপে পূজা না করলেও তাঁর প্রতি ভয় এবং তার থেকে কৃতজ্ঞতা পোষণ করে। যেসব কাজ করলে সেই স্বর্গীয় মহাবিচারকের নিকট পুরস্কৃত হওয়া যায়, সেগুলির প্রতিই মানুষের আকর্ষণ ছিল বা আছে। কৃতকর্মের ফল হেতু 'পুরস্কার না শাস্তি'—এই দুটি বিশ্বাসই প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় অনুশাসন হিসাবে সক্রিয় ছিল।

আজকের বহু আদিবাসী সমাজে এখনও সামাজিক অনুশাসনে ঐ দুটি প্রত্যয় সমভাবে কার্যকর। তবে এখানে পাপ-পুণ্য সদা সৎ বোধ থাকলেও তাদের মধ্যে যমরাজ-সংক্রান্ত চিন্তাধারা অনুপস্থিত। আদিবাসীদের মধ্যে ঐ 'পুরস্কার ও শাস্তি' পর্যায়টি সম্পূর্ণভাবে সামাজিক যদিও তার মধ্যে আধিভৌতিক চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে। আদিবাসীদের 'প্রথাসিদ্ধ আইন' [Customary Law] বহুলাংশে এইধরনের প্রত্যয়-নির্ভর। নৃবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় সামাজিক অনুমোদন [Social Sanction]। এর দুটি বিভাগ রয়েছে,—একটি হল ইতিবাচক অনুমোদন [Positive Sanction] এবং অপরটির নাম নেতিবাচক অনুমোদন [Negative Sanction]। লক্ষ্য করার বিষয় যে, যমরাজের বিচারসভায় এই দুই ধরনের অনুমোদনই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

যমরাজ ও তাঁর কাজকর্ম, তাঁর প্রদত্ত শাস্তি ও পুরস্কার এবং সর্বোপরি তাঁর বিচার-পদ্ধতি নিয়ে তৈরি নানাধরনের প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, লোককথা, কাহিনী আজও সমান সজীব। এগুলির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে নানা ব্যবহার-পদ্ধতি। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, লোকশিল্পের এক বিশেষ প্রয়োগে উক্ত প্রতীকী ঘটনাবিচিত্রাকে জনমনের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার সার্থক চেষ্টা হয়েছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাচীন বাংলার লোকচিত্রকলা তদানীন্তন সমাজজীবনের নানা চিন্তা ও ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছিল।

এই সূত্রে আসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্রগুলির প্রসঙ্গ, যাদের মধ্যে প্রতীকী চিন্তা বিষয়টিই সামগ্রিকভাবে বিকাশলাভ করেছিল। ঐ-সময়ের চিত্রশিল্পের মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখার প্রবণতাই ছিল প্রধান। অর্থাৎ চিত্রশিল্পের মাধ্যমে জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান,—যেমন খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত হয় তার জন্য জাদু-ধর্মীয় পদ্ধতি প্রয়োগই ছিল তার মূল লক্ষ্য। হাজার হাজার বছর পরেও চিত্রশিল্প প্রতীকীচিন্তা বিষয়টিকে পরিহার করেনি। বাংলার লোককৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক পটুয়াগোষ্ঠী মানবসমাজের বিভিন্ন সমস্যা, প্রতিবাদ, বিশ্বাস-সংস্কার, এমনকি মনস্তত্ত্ব ও দর্শনভিত্তিক নানা ঘটনাবলীকে বিষয়বস্তু করে অপূর্ব চিত্রশৈলীর মধ্য দিয়ে সেগুলি উপস্থিত করেছে এই শিল্পীরাই। এরাই শ্রবণ-দর্শন প্রযুক্তির [Audio-visual technology] প্রাথমিক প্রবর্তক এবং সার্থক রচয়িতা। যাইহোক এই পটুয়াদেরই একটি গোষ্ঠী যমরাজ এবং তাঁর বিচারালয়ের দৃশ্য এবং সংশ্লিষ্ট পুণ্যাত্মা ও পাপী ব্যক্তিদের যথাক্রমে পুরস্কার এবং শাস্তিদানের ঘটনাবলী চিত্রিত করে এবং পটচিত্রের বিষয়বস্তুকে সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্প্রচার করে। এটা তাদের জীবিকাও বটে। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে যমরাজ সম্পর্কিত বার্তা প্রচার করে এরা ভিক্ষাগ্রহণ করে। এরাই জাদুপটুয়া নামে খ্যাত। এই ধরনের যমপট-প্রদর্শনের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষকে যমরাজের অমোঘ বিধান সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে দূরে থেকে সাধারণ মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে সামাজিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে। লক্ষণীয় যে এখানেও যমরাজের প্রতীকীকরণ ঘটেছে।

এই জাদুপটুয়ারা কালক্রমে সাঁওতাল আদিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। সেদিনের সমগ্র দামিন-ই-কো এলাকা জুড়ে সাঁওতাল আদিবাসীদের বহুবিস্তৃত ও সুবিকশিত বাসভূমি গড়ে উঠেছিল। পরিশ্রম, আন্তরিকতা, এবং ভালোবাসা দিয়ে এই পাহাড়ী অঞ্চলে সাঁওতাল জনজাতি সার্থক কৃষিকাজের মাধ্যমে যেন সোনা ফলিয়েছিল। ঝকঝকে সাঁওতাল গ্রামগুলিতে জীবন ছিল ছন্দোময় এবং আনন্দমুখরিত। এই এলাকায় সাঁওতাল জনজীবন সেদিনের বহু অন্‌-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। জাদুপটুয়ারাও একদিন এই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। পটচিত্র অঙ্কন এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে জীবিকার্জনে অভ্যস্ত এই পটুয়া শ্রেণী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মাধ্যমটিকে জনপ্রিয় করতে চেষ্টা করেছে। সাঁওতাল জীবন, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঐ-সব পটুয়ারা ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই অতিপ্রাকৃত ও আধিভৌতিক জীবনদর্শনে বিশ্বাসী সাঁওতালরা 'যম'-সংক্রান্ত পট প্রদর্শনকেই সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল এবং কালক্রমে এটি যমপটরূপে পরিচিতি লাভ করে।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, যমসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনে যম নামক কোন দেবতার বা শক্তির সঙ্গে সাঁওতালী ধর্ম-সংস্কৃতির যোগাযোগ নেই। এটি সম্পূর্ণ বহিরাগত জীবনদর্শনের প্রভাব। ভারতের কোনো আদিবাসীর মধ্যে এইধরনের বিশ্বাস নেই। তবে সাঁওতালী যমপট কথাটির উৎস কোথায়? এর উত্তর পাওয়া যাবে জাদুপটুয়া নামক শিল্পীগোষ্ঠীর জীবনচর্যা এবং কর্মধারার ক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

এই পটুয়া গোষ্ঠীর শিল্পীরা হিন্দুপ্রভাবসমন্বিত এবং হিন্দু-পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে সাঁওতালী জীবনচর্যা এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছে,—নিজেদের বাঁচার সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য। এই পটচিত্রগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এরা নিজেদের সাঁওতাল মানসিকতার নিকট আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পরবর্তীকালে সমগ্র সাঁওতালী সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সাঁওতালী দেবদেবীদের পটে স্থান করে দেয়। সাঁওতাল পরগণায় বসবাসকারী সাঁওতালদের মধ্যে 'বাঘাই বোঙা' পটচিত্রটির প্রচলন খুব বেশি। অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং বোধগম্যতার অতীত অমিত-শক্তিশালী এই 'নৈর্ব্যক্তিক চেতনা'টি [Impersonal concept] সাঁওতাল এবং ওরাওঁ, মুণ্ডা, হো প্রমুখ ছোটনাগপুরে বসবাসকারী আদিবাসীদের কাছে অপরিহার্য। বোঙা হল একটি অস্পষ্ট ধারণা। কিন্তু জাদুপটুয়াদের চিন্তাধারায় এই বোঙার মানবীকরণ হয়েছে। বাঘের পিঠে চড়ে বোঙা দেবতা বা আধিভৌতিক শক্তি সমগ্র ভূখণ্ড পরিভ্রমণে চলেছেন। তবে এটা অস্বাভাবিক নয় যে, দীর্ঘদিনের পটচিত্র দর্শন এবং সঙ্গীত শ্রবণের মাধ্যমে আদিবাসী জীবনকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছে যে এদের মধ্যে কেউ কেউ পটচিত্র অঙ্কনেও উৎসাহিত বোধ করেছে। এর উপর ভিত্তি করে সাঁওতালী ধর্ম-সংস্কৃতিতে যমরাজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। প্রসঙ্গত ভাবা যেতে পারে যে, পটচিত্রের এই উপস্থিতি এবং সাঁওতালী জীবনে যমরাজের উপস্থিতি কিন্তু ভারতের বৃহত্তর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়নি। একে একটি আঞ্চলিক বিশ্বাস ও সংস্কারের বা পদ্ধতি অনুসরণের ফল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তবে দীর্ঘকাল হিন্দু চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ পরিমণ্ডলে বসবাস করে সাঁওতালী জীবন-চর্চায় যমরাজের প্রতীকী প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। একদিকে এইরকম একটি পারিপার্শ্বিকতা এবং অপরদিকে জাদুপটুয়াদের সাঁওতালী সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশের সার্বিক প্রচেষ্টা—এই দুইয়ে মিলে যমরাজ সাঁওতালী মানসিকতায় আসন পেতে বসেছেন। জাদুপটুয়া প্রচলিত 'চক্ষুদান' পটের প্রদর্শনপদ্ধতি

বিশ্লেষণ করলে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হবে। কোনো সাঁওতাল বাড়িতে কেউ মারা গেলে জাদুপটুয়ারা পট নিয়ে ঐ বাড়িতে হাজির হয়। পটের মধ্যে মৃতব্যক্তির ছবি আঁকা থাকে। ছবিটি অবিকল হবে এমন নয়। কিন্তু ছবিটি ঐ বাড়ির মৃত ব্যক্তিরই এমন বিশ্বাস উৎপাদন করা হয়। চিত্রটিতে মানুষটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব ঠিকভাবে আঁকা হলেও একটি ক্ষেত্রে এটিকে অসম্পূর্ণ রাখা হয়। চিত্রটির চোখের মণিটি কেবল আঁকা হয় না অর্থাৎ মৃত মানুষটি যেন দৃষ্টিহীন এমনটাই বোঝানো হচ্ছে। পটুয়ারা তাদের কথার কায়দায় এই কথাই বোঝাতে চায় যে, ঐ মৃতব্যক্তি পরপারে গিয়ে অন্ধের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং দৃষ্টিহীনতায় সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে পটুয়ারা পরামর্শ দেয় যে সামান্য কিছু অর্থ এবং কিছু দানসামগ্রী দিলেই মৃতব্যক্তির 'চক্ষুদান' হবে। এরপর সংস্কারের বশে মৃতব্যক্তির পরিজনেরা কিছু অর্থ ও দানসামগ্রী দিলে পটুয়া সকলের সামনেই তুলি ও রং দিয়ে পটচিত্রের চোখের মণিটি এঁকে দেয়। এইভাবে দৃষ্টিহারা ব্যক্তির দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া হল। একেই বলা হয় পারলৌকিক পট। এর বিষয়বস্তুগত নাম 'চক্ষুদান পট'। এর সঙ্গেই পটুয়ারা গান গেয়ে গেয়ে অন্যান্য পট দেখিয়ে চলে। এইসব পটে রয়েছে সাঁওতালী সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে সংগৃহীত নানা ঘটনাবলী ; এমনকি তাদের প্রধান দেবতা মারাং বুরুর বিশেষ ধরনের কার্যকলাপও এইসব চিত্রাবলীর বিষয়। সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে যমালয় সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভব প্রক্রিয়াটি দীর্ঘকালের 'সংস্কৃতায়ন'-এর [Sanskritization] ফল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যমরাজের প্রতীকীকরণে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের কর্ম ও চিন্তাকে সুসংহত করা বহুলাংশে সম্ভব হয়েছিল। এই জগতের সীমানা-বহির্ভূত অঞ্চলে বসবাস করলেও এবং তাঁর প্রকৃত পরিচিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকলেও যমরাজ কোনো কাল্পনিক দেবতা, অধিদেবতা বা অতিমানব হিসেবে নয়, একটি বিশিষ্ট ও বাস্তব চিন্তাধারার প্রতীকরূপে মানবসমাজেরই একজন হয়ে আছেন ;—যিনি অক্লান্তকর্মী—সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষা বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সার্থকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান কালের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনদর্শনে এই প্রয়াস নিষ্ফল মনে হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু-অনুষঙ্গী যমধারণার মধ্যে যে বাস্তবতা আছে,—যে মনস্তাত্ত্বিক বৈক্লব্য রয়েছে তাকে অস্বীকার করা বা একেবারে উপড়ে ফেলা যাবে কি?—বিজ্ঞানের দ্রুতগতি বিজয়রথের সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে তাকে অস্বীকার করতে পারা গেছে কি?

□

গোদা যমের গল্প

ক্ষেত্র গুপ্ত

১.

বৈদিক-ঔপনিষদিক-পৌরাণিক দেবতা যম লোকবিশ্বাসে ও সংস্কারে ঢুকেছে অভিজাত সংস্কৃতির প্রভাবে, অথবা লৌকিক স্তর থেকে অভিজাত ধর্মীয় চেতনায় পদোন্নতি পেয়েছে,—সমাধানের অতীত এই তর্কে ঢুকে লাভ নেই। লোকসংস্কৃতিতে মৃত্যুর অধিষ্ঠাতা এই বেদ-বিদিত— ৩টি সূক্তে ৫০ বার উল্লিখিত দেবতার যে সব দশা হয়েছে, তার একটির,—দশম দশাই বলা যায়,—নিদর্শন নাথপন্থীদের ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়।

শৈব নাথযোগপন্থাকে অবশ্যই পুরো লোকধর্ম বলা যাবে না। সাধারণে প্রচলিত এই ধর্মের বিশ্বাসের মূল প্রকৃতি এবং আচার ও সাধনের 'হঠযোগ' অংশটুকু বাদ দিলে বাকি সবটাই অবৈদিক, অপৌরাণিক, অস্মার্ত এবং সমগ্রত অনার্য। হঠযোগও যখন গঞ্জিকাপ্রসাদাৎ ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে :

আমার ঠাকুর তেন্নাথ
বেশি নাহি চায়
এক পয়সার গাঁজা দিয়া
তিন কলকি সাজায়
রে সাধু ভাই
দিন গেলে তেন্নাথের নাম লইও।

তখন তার লোকায়ত চরিত্রে সংশয় থাকে না। বাংলা সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞেরা সে কারণেই একে 'অবসকিওর রিলিজিয়াস কাল্টের' অন্তর্ভুক্ত করে ঠিকই করেছেন।

নাথপন্থীদের সাধনার লক্ষ্য হল জীবনমুক্তির মধ্য দিয়ে পরামুক্তি লাভ করা। তাদের সাধনা অমরত্বের সাধনা। বিন্দুধারণ এবং হঠযোগ তাদের দেহাভ্যন্তরে এমন রসের সৃষ্টি করবে যার বলে তারা শেষ পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হবে। অ্যালকেমিস্টদের সাধ্য যে রসবস্তু তা সব কিছুকে সোনা করতে পারবে, এদেশি রসায়নবাদীদের রস মানুষকে অমর করবে, নাথেরা রসায়নবাদীও বটে।

লোকায়ত বিশ্বাস ও আচার-আচরণের প্রভাবে তারা অমরত্বের প্রধান বাধা মৃত্যু এবং মৃত্যুর দেবতা যমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

২.
ঔপনিষদিক ঋষি বাজশ্রবার পুত্র নচিকেতা সশরীরে যমালয়ে চলে গিয়ে জীবনের স্বরূপ, ব্রহ্মের স্বরূপ এবং মৃত্যুর স্বরূপতত্ত্ব তাঁর কাছ থেকে আদায় করে এনেছিলেন। এও তো এক রকমের যুদ্ধ। জীবনের কাছে আবৃত যে [illegible] অপাবৃত করতে বাধ্য করা। পৌরাণিক কাহিনীতে সাবিত্রী যমের হাত থেকে মৃত স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছিল জিদ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অস্ত্রে। আসলে এই যুদ্ধটা চিরন্তন। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সংগ্রাম।

বকের ছদ্মবেশে ধর্ম অর্থাৎ যম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, নিখিলবিশ্বে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কী? তাব জবাবে যুধিষ্ঠির বলেন :

অহন্যানি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্
শেষস্থিরত্যমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্।

প্রতিদিন প্রাণীগণ যমমন্দিরে যাচ্ছে, তবুও সবাই চিরজীবী হতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে? উত্তরে যম খুশি হয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বয়ং মৃত্যুরাজ প্রাণীর সহজাত বাঁচার ইচ্ছায় বিস্ময়-বিমূঢ় হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা সকলের মনে পড়বে। সর্বশক্তিমান মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা নিয়ে প্রেম বলছে 'মৃত্যু তুমি নাই'। এই গর্বের কথা শুনে মৃত্যু হাসছে। সর্বশক্তিমান সর্বজয়ী মৃত্যুর হাস্যময়—শিশুকে প্রশ্রয় দেবার হাসি,—এই মূর্তি মৃত্যুর দেবতা যমের মূর্তি। যদিও কবি যমের নামটি বলেননি। বরং অ্যাবস্ট্রাক্ট মরণের কথা বলতে তিনি স্মরণ করেছেন, মহারুদ্র মহাদেবকে :

তার লটপট করে বাঘছাল
তার বৃষ রহি রহি গরজে
তার বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে
তার ববম্বম ববম্বম বাজে গাল— ইত্যাদি।

যমকে কবির পছন্দ হয়নি বোধ হয়।

আরও অনেক আধুনিক সাহিত্যিক যমকে 'মৃত্যু' রূপে বর্ণনা করছেন, হয়ত ব্যক্তিমূর্তি থেকে অ্যাবস্ট্রাক্‌সনে নিয়ে যাবার জন্য। মোহিতলাল তাঁর একটি চমকপ্রদ কাব্যনাট্যের নাম দিয়েছিলেম 'মৃত্যু ও নচিকেতা'। কিন্তু মৃত্যু একটি চরিত্র, তার নীল বর্ণ, [ঔপনিষদিক গাঢ় সবুজ নয়]—অনন্ত আকাশের মত, অসীম সমুদ্রের মত। মৃত্যু সেখানে এক ব্যক্তি এবং অবশ্যই যম। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিক তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করার কথা বলেছেন মুমূর্ষু জীবনমশায়ের। সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে মরণের স্পর্শ-গন্ধ-দৃশ্যের স্বাদ পেতে চেয়েছেন। মৃত্যু-দর্শনের এই সাধনায় যম ও ব্রহ্ম একাকার হয়ে গেছে। সত্যজিতের 'কম্পু' গল্পের সুপার ব্রেন কম্পিউটারটি মৃত্যুকে জানতে চেয়েছিল—ধ্বংস হয়ে যাবার মুখে সে বলেছিল সে জেনেছে। কাকে? বেদ-জানিত সেই পুরুষকে যার এক নাম যম, অন্য নাম ব্রহ্ম।

একালের বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুর হাত ধরে যমের আনাগোনা আছে। বঙ্কিমবাবু শৈবলিনীকে

যে নরকদর্শন করিয়েছেন তা তো প্রাচীন কবিদের নরকবর্ণনা এবং বাংলার গ্রামীণ শিল্পীদের যমপটের পাপীদের শাস্তির ছবির আদলে তৈরি। তবে নরক নামক রাজ্যের অধীশ্বরটির দেখা মেলেনি। মধুসূদনের অষ্টমসর্গ এবং রবীন্দ্রনাথের নরকবাসে নরক আছে অনেকখানি,—যমরাজ নেই।

কৌতুক-কাহিনীর লেখকেরা যমকে সামনে এনে তাকে নিয়ে ঠাট্টা রসিকতা প্রচুর করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য় যমকে দারুণ নাজেহাল করা হয়েছে। এই কাহিনীদুটির উৎসে লোক-প্রচলিত বিভিন্ন গল্পখণ্ড, লৌকিক রসিকতার প্রভাব অনুমান কবি। যমকে শাসিত করার কিছু কিছু বন্দোবস্ত বাংলাব লোক-কল্পনায় দেখা যায়। পরশুরামের কৌতুক-কাহিনীতে যম ও যমলোক দুবার সামনে এলেও তাদের ধুলোয় লুটিয়ে মজা দেখা হয়নি। বরং তাদের চিত্রে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। 'জাবালি' গল্পে নাস্তিক ঋষিটিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার পবে তার আত্মা মৃত্যুলোকে প্রবেশ করার সময় সিংহদরজায় স্বয়ং যম এসে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায়। 'অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা' গল্পে ইহসর্বস্ব বস্তুবাদী অটলবাবুর মৃত্যু-দর্শনের বর্ণনা আছে। প্রেতলোকবাসী পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হতে থাকে, ক্রমে অতীত থেকে অতীত, পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ থেকে অ্যামিবা পর্যন্ত, আরও অতীত — !

৩.

যমের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের বিচিত্র ব্যবহারে হরেক রকম রস জমেছে। পুরনো সাহিত্যেও যমের প্রতি মনোভাবটা সর্বদা বাঁধা রাস্তায় চলেনি। মনসামঙ্গলেই দেখা যাচ্ছে, এই অনার্য কুলসম্ভব মনসাদেবীটি যমের হাত থেকে তার দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছিল, অবশ্যই অংশত—নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যতটুকু প্রয়োজন। তার বেশি নয়, ব্যাপারটা প্রচণ্ড ঝামেলার তো। অনিরুদ্ধ-ঊষা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে আত্মঘাতী হলে যমদূতেরা নিয়মমাফিক তাদেব আত্মাদুটি বেঁধেছেদে যমপুরীতে নিয়ে যাচ্ছিল, মনসার সর্পবাহিনী বাধা দিল। যম নিজের অধিকাব বজায় বাখার জন্য মনসাব সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল, কিন্তু পরাজিত হল। শুধু তাই নয, মনসা আরও যাদের মেরেছে, যেমন ধন্বন্তরী, চাঁদের ছয় বালকপুত্র, লখিন্দর—এদের আত্মার উপরে যমরাজের হাত দেবার উপায় রইল না। মনসা যেন একটা মিনি নরক তৈরি করে ঐ সব আত্মাকে জমিয়ে রাখল। যমের মৃত্যুলোকের প্রতিস্পর্ধী একটা অন্য নরক—যেখানে নরক-যন্ত্রণা নেই এবং যে মৃত্যুলোক থেকে আবাব জীবনে ফিরে আসা সম্ভব। মানুষের লৌকিক কামনা-পরিপূর্তিব একটা স্বপ্ন যেন।

৪.

লোক-কল্পনায় যমকে বড় বেশি লাঞ্ছিত হতে হয়েছে নাথপন্থীদের ময়নামতীর গানে। একালের দীনবন্ধু-ত্রৈলোক্যনাথের রচনার সঙ্গেই মাত্র যার তুলনা চলে।

নাথপন্থীদেব কাব্যদুটি পুরোপুরি লিখিত কাব্যরূপে গৃহীত হবে না। পুঁথি-টুথি কিছু পাওয়া গেলেও মৌখিক উৎস থেকে গ্রিয়ার্সন-সংকলিত ময়নামতীর গানই এখানে আমার অবলম্বন।

গোপীচন্দ্রের গানের দুর্লভ মল্লিক-কৃত কাব্যটিতে এই আখ্যান নেই। তবে নাথপন্থীদের অমরত্বের সাধনার এ-হল একটা লৌকিক রূপ, এই যমবিরোধী অভিযান। 'গোর্খবিজয়', 'গোপীচন্দ্রের পালা'-'ময়নামতীর গান' এগুলিকে আমি বলি মধ্যযুগের লিখিত আখ্যান কাব্য—মঙ্গলকাব্য-শিবায়ন শ্রেণীর হয়ে ওঠার পথে পুরো পরিণতি পায়নি। মঙ্গলকাব্যগুলি যে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন লোককথার একটা শিষ্ট ও মার্জিত রূপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাথপন্থী কাহিনীদুটি যেন লোককথা থেকে পূর্ণাঙ্গ কাব্য হয়ে উঠতে উঠতে মাঝপথে থমকে গেছে। একে অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বলা যায়। এর ফলে লোক-উপাদান বেশ মোটা দাগেই এখানে সেখানে স্পষ্ট হয়ে আছে।

গোর্খবিজয়ে যম নেই, যমপুরীর কথা আছে—অল্পই। গোর্খনাথ সাধন-পতিত গুরু মীননাথের আসন্ন মৃত্যু রোধ করার জন্য মারমার করতে করতে গিয়ে যমলোকে হাজির হল। স্থানটি অনেকটা ভূস্বামীদের কাছারিবাড়ির মত। সেখানে যম অবশ্য হাজির ছিল না। নায়েব চিত্রগুপ্ত যাবতীয় হিসেবপত্তর নিয়ে মশগুল। গোর্খনাথ খাতাপত্রের উপরে হামলা করল। দেখল গুরু মীননাথের আয়ুর ঘরে জমা কিছু নেই। সবটাই ধারবাকিতে সুদে জমে মরণ এখন শিয়রে। সাধক শিষ্য সেইসব তমসুকি দলিল ছিঁড়েখুঁড়ে মীননাথের প্রাণ বাঁচাল। ঠিক যেন প্রজাবিদ্রোহের এক নেতা বিপর্যস্ত করে দিল অত্যাচারী ভূ-স্বামীর সেরেস্তা।

ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গানে আছে সুবিস্তৃত যম-বিরোধিতার গল্প। গল্পের ধাঁচটা বেশ গেঁয়ো। তাতেই এর চরিত্র ফুটেছে। ব্যাপারটা এ-রকম :

ময়নামতী একজন মুখ্য নাথ সিদ্ধাই, মীননাথ, গোর্খনাথ, হাড়িপা, কাহ্নপার সঙ্গে তার নাম উচ্চারিত হয়। ময়নামতীর সঙ্গে রাজা মানিকচাঁদের বিয়ে হল। ময়না মানিকচাঁদকে নাথদীক্ষা নিতে বলে। রাজা নিজ স্ত্রীকে গুরু বলে মানতে রাজি হল না। রাজার শিয়রে শমন এসে হানা দেয়। ময়নার ভয়ে এগোতে পারছিল না। একদিন সুযোগ পেয়ে সে রাজার প্রাণটি নিয়ে যমপুরীর দিকে যাত্রা করে। ময়নামতীর গানে যমকে বলা হয়েচে 'গোদা যম'। কল্পনাটা বোধহয় এরকম, যমেদের বিশাল দঙ্গল দলবদ্ধ হয়ে মৃত্যুলোকের দায়িত্ব পালন করে। তারা সকলেই যম। গোদা যম তাদের পালের গোদা। মানিকচাঁদের দামি আত্মাটি নিতে স্বয়ং গোদা যম এসেছিল। ময়নামতী মৃত স্বামীর আত্মাটি গোদা যমের হাত থেকে আদায় করার জন্য তাকে তাড়া করল। যেন ছিনতাই-করা সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টা। এদের দুজনের চোর-পুলিশ খেলায় বর্ণনা জমে উঠেছে।

গোদা যম তার দণ্ডে বেঁধে মানিকরাজার প্রাণটি নিয়ে যমপুরীর দিকে ছুটল। ময়না তার সিদ্ধাইয়ের জোরে মর্তলোক থেকে ছয়মাসের পথ যমলোকে ছয়দণ্ডে চলে গেল। সেখানে :

ছত্রিশ কোটি যম দরবারো বসিছে।
যেন মতে ময়না যমালয়ে খাড়া হইল।
ভিতাভিতি যম পালাবার লাগিল।

ছত্রিশ কোটি যম ময়নাকে দেখেই যে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। আর 'গোদা যম'

যেন মতে গোদা যম ময়নাকে দেখিল
আপনকার মহলক লাগিয়া এ দৌড় করিল।
আপনকার মহলে যায়া ঘরে লুকাইল।

ময়না মালিনী সেজে মহলে ঢুকে পড়ল। তাকে দেখেই, তার ভয়ানক 'গোদা গোদা' হুঙ্কার শুনে গোদা তার মহলের বাশের বেড়া ভেঙে মাঠের দিকে ছুটল। গোদা হরিণের বেশে চাষের খেত ভেঙে পালাচ্ছিল। ময়না তার নাগাল পেয়েই পেটাতে শুরু করল। পিটুনির চোটে গোদা চিংড়ি মাছ হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতারে পালাতে লাগল। ময়না ধ্যানে জানতে পারল, কোথায় আছে গোদা। সে তখন বিরাট এক মোষ হয়ে জল তোলপাড় করে ইঁচলা মাছরূপী যমকে পেটাতে লাগল। প্রায় দেড় শতাধিক চরণ জুড়ে বিভিন্ন রূপ ধরে গোদার পলায়ন এবং বিভিন্ন রূপ ধরে ময়নার ধাওয়া করার বিচিত্র বর্ণনা আছে। তার মধ্যে যমকে চূড়ান্ত মারধরের বিবরণটি এইরকম :

পাতাল ভুবনত লাগিয়া গেল চলিয়া
ঐটে যায়া গোদা যমক ধরিল ঠাসিয়া।...
আপন্নার রূপ হইল মুরত বদলাইয়া।
উপর কৈরে ফেলেয়া যমকে কিলিবার লাগিল।
কিলাইতে কিলাইতে হাত হাপসাইল।
চিতর করিয়া ফেলায়া যমক নেদাবার লাগিল।

যম কিন্তু এক ফাঁকে কবুতর হয়ে উড়ে পালাল। এবং শেষতক ময়না যমকে কোমরে বেঁধে ফেলতে পারল, হেতাল কাঠের লাঠি দিয়ে তাকে পেটাতে লাগল।

কিন্তু যমকে জয় করা গেল না। ময়নাকে মেনে নিতে হল স্বামী মানিকবাজার মৃত্যুকে। লোককবিকে, নাথ-সাধককেও মেনে নিতে হল :

দুরন্ত শিশুর হাতে
ফড়িংয়ের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে।

যম নামক দুরন্ত শিশুর হাতে ধরা পড়ে গেছে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে—আর জীবন মানেই হল তার ডানার প্রতিবাদী গাঢ় শিহরণ—তা সে মাঠো লোক-কল্পনাই হোক, আর অভিজাত দার্শনিক প্রতীতিই হোক।

❐

যম : মৃত্যুচেতনা : পুরোনো বাংলা সাহিত্যে

কাননবিহারী গোস্বামী

১. কথামুখ : মৃত্যুচেতনা, যম ও যমপুরী

মৃত্যু মানবজীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসাময় পরম বিস্ময় ও রহস্য। মানবমন কল্পনা করেছে, পার্থিব জীবনের অবসানে মানুষের লৌকিক সত্তা মৃত্যুপুরে উপস্থিত হয়। শেক্‌সপীয়ার বলেছেন, এ এমন পুরী যেখান থেকে কোনো পথিক আর মর্ত্যে ফেরে না—'From whose bourne no traveller returns.' পাশ্চাত্যে এ বিশ্বাস থাকলেও প্রাচ্যবাসীদের বিশ্বাস কিন্তু আলাদা। 'গীতা'য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন:

> ''জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ!
> তস্মাদ্ অপরিহার্যেঅর্থে ন ত্বং শোচিতুর্মর্হসি॥''

অর্থাৎ, 'জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, মৃতেরও পুনর্জন্ম ধ্রুব। তাই অপরিহার্য বস্তুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।' 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়... ...' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেছেন—মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নববস্ত্র পরিগ্রহ করে, তেমনই দেহী জীর্ণদেহ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিত্যাগ করে এবং তার আত্মা নবকলেবর ধারণ করে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এ-সব ধারণা 'কর্মফলবাদ' ও 'জন্মান্তরবাদ'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় হিন্দু দর্শনমতে: 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্'। অর্থাৎ, মানুষ নিজকর্মফল ভোগ করে। জীবনে সুকৃত-কর্ম করলে মৃত্যুর পর তার আত্মা স্বর্গলোক যায়। আর দুষ্কৃত-কর্ম করলে আত্মা নরকগামী হয়। আবার কর্মফলের অবসান হলে আত্মা ধরণীতে ফিরে এসে নবদেহ ধারণ করে।

এ থেকেই এসেছে নরকের অধীশ্বররূপে ভারতীয় পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যমের পরিকল্পনা। ঋগ্বেদে যম পরলোকের রাজা—'পিতৃপতি'। পরলোকে পিতৃগণ যমের সঙ্গে মিলিত হন। বৈদিকমতে, যম বিবস্বান্ ও সরণ্যুর পুত্র। পুরাণের মতে ইনি রবি ও সংজ্ঞার পুত্র—এজন্য এঁকে 'রবিসুত'ও বলা হয়। 'কৃতান্ত' ও 'শমন'—এঁর অন্য দুটি নাম। এঁকে 'ধর্মরাজ'ও বলা হয়। মহাভারতে ও পুরাণে যম মৃত্যুর দেবতারূপে কল্পিত। ইনি কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবাস-পরিহিত এবং মহিষবাহনে আরূঢ়। যমের অস্ত্র—পাশ, পরশু, জাল ও খড়্গ। শ্যাম ও শবল নামে দুটি কুকুর যমের অনুচর।

মৃত্যুর ঐতিহ্যগত অধিদেবতা যম পুরোনো বাংলা সাহিত্যে নানাভাবেই উল্লিখিত হয়েছেন। ইনি পরলোক বা যমপুরীতে থাকেন। মৃত ব্যক্তির আত্মার উপর যমের অধিকার। তাই পৃথিবীতে কারো মৃত্যু হলে যম তাঁর দূতদের মর্ত্যে পাঠান এবং দূতেরা মৃতের আত্মাকে যমপুরীতে নিয়ে

আসে। সাধারণত দুষ্কৃতকারীর আত্মাকেই যমপুরীতে আনা হয়। সুকৃতকারীর আত্মার উপর বিষ্ণুদূতের অধিকার। মৃত্যুর পর এই আত্মার স্থিতি নারায়ণের বৈকুণ্ঠলোকে। সুকৃতকারী যদি দেবী মনসা বা চণ্ডীর ভক্ত ও পূজক হন, তাহলে তাঁর আত্মার উপর যমের কোনো অধিকার নেই—ঐ দেবীদেরই অধিকার। এই নিয়ে যমদূত এবং দেবীদূতদের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে। অবশেষে যমের সঙ্গেও দেবীদের যুদ্ধ হয়। যম পরাজিত ও বন্দী হয়েও শেষপর্যন্ত দেবীদের কৃপায় মুক্তি পান এবং সুকৃতকারী আত্মার উপর নিজ অধিকার পরিত্যাগ করেন। যম আপন মৃত্যুপুরীতে স্বরাট। তিনি দুষ্কৃতকারীর আত্মাকে রৌরব, কুম্ভীপাক ইত্যাদি নরকে শাস্তিভোগ করান। অন্ধকার যমপুরীতে এইরকম 'চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড' আছে। তাতে যমদূতগণ 'পাতকীর মুণ্ড' ডুবিয়ে ধরে নির্যাতন করে। মৃতের উপর যমের অধিকার, কিন্তু তিনি কারো প্রার্থনায় প্রসন্ন হলে মৃতের পুনর্জীবন দান করেন এবং মৃতকে মর্ত্যে তার প্রিয়জনদের কাছে সমর্পণ করেন। বাংলা মঙ্গলকাব্য এবং 'রামায়ণ'-'মহাভারত'-এর মতো অনুবাদ-কাব্যগুলিতে যমের এই দ্বিবিধ রূপের এবং যমপুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। যম একদিকে কৃতান্ত, ভীষণ, পাতকীর শাস্তিদাতা। আর একদিকে তিনি বরদ, প্রসন্ন, মৃতের পুনর্জীবনদাতা। মৃতের আত্মার নরকভোগ বা শাস্তিভোগ এবং মৃতের পুনর্জীবনলাভ লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোককথার দুটি পরিচিত 'Motif 'বা অভিপ্রায়। তাই, পুরোনো বাংলা সাহিত্যে যম, নরক, মৃতের পুনর্জীবনলাভ প্রভৃতির বর্ণনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান রয়েছে, আর এই উপাদানগুলি এবং তাদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে মৃত্যুচেতনাও পরিস্ফুট হয়েছে।

২. 'চর্যাপদাবলী'তে মৃত্যুচেতনা

অষ্টম থেকে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা *'চর্যাপদ'*-এ যমের কথা নেই, কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে। আচার্য সরহপাদ মনে করেন—আমাদের জন্মও যেমন, মরণও তেমন। জীবিত ও মৃতে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। কারণ এই ভববোধ বা জাগতিকবোধের কোনো চিরন্তন অস্তিত্ব নেই। জন্ম ও মরণের বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞান অমর। তাঁর কথায়:

'জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেযো॥' [চর্যা · ২২]

মরণকে অস্বীকার করলেও কিন্তু মৃত্যুর বর্ণনা চর্যাপদে আছে। ২০-সংখ্যক চর্যায় কুক্কুরীপাদ এক মৃতবৎসা রমণীর খেদ প্রকাশ করেছেন। তার প্রথম প্রসব যেন বাসনার পুঁটুলি—'পহিল বিআণ মোর বাসন-য়ুড়া।' কিন্তু যে সন্তান প্রসূত হল নাড়ি টিপতে টিপতে সেও হল হাওয়া ['বায়ুড়া'], অর্থাৎ নবজাতকের অকালমৃত্যু হল। এর তাত্ত্বিক তাৎপর্য হল—বাসনাপূর্ণ দেহ মূল্যহীন। এ-বিষয়ে চিত্তে যে ভ্রান্তধারণা প্রসূত হয়, সদ্‌গুরুর উপদেশে তা নিরাকৃত হয়। ৫০-সংখ্যক শেষ চর্যায় শবরপাদ এক শবরের মৃত্যু এবং তার মৃতদেহ সৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন। শবরীর সঙ্গে মত্তরজনী মহাসুখে কাটাবার পর শবরের মৃত্যু হল। চাঁচাড়ি দিয়ে চার স্থানে তার মৃতদেহ সাজানো হল। সেখানে মৃতদেহ তুলে তাকে দাহ করা হল। শকুন-শৃগাল সেই শোকে কাঁদে :

'চারিবাসে তাগুলা রে দিআঁ চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্ত সগুণশিআলী॥'

আসলে এর মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে, শবর বা চর্যাসাধক তৃতীয় শূন্যকে ধ্বংস করে চতুর্থ আবাসরূপ চতুর্থ শূন্যে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে দাহ করে নির্বিকল্প অবস্থা লাভ করেছেন। তাই শকুন ও শৃগাল রূপ বিষয়বিকল্প কাঁদছে, বা অতিশয় কাতর হচ্ছে।

দেখা গেল, চর্যাপদাবলীতে মৃত্যুচেতনা সবটাই গূঢ়ার্থমূলক, তাত্ত্বিক এবং সাধনাক্রমের সঙ্গে যুক্ত।

৩. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ মৃত্যু-প্রসঙ্গ

চর্যাপদাবলীর পর বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যানকাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ আমরা বিচ্ছিন্নভাবে মৃত্যুপ্রসঙ্গ পাচ্ছি, তবে তা খুব বেশি নেই। আর এই মৃত্যুপ্রসঙ্গে যমেরও কোনো যোগ নেই। কাব্যের 'বংশীখণ্ড'-এর ৩৩৬-সংখ্যক পদে রাধা কৃষ্ণ-কর্তৃক বাঁশি-চুবির অপবাদ অস্বীকার কবে এই মিথ্যা দুর্নামের জন্য অনলকুণ্ডে প্রবেশ করে কিংবা বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছে :

'আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।
কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ॥'

রাধা অবশ্য সত্য-সত্যই মরতে চাননি। বাঁশি তিনিই চুবি করেছেন। অপবাধ ঢাকা দেবার জন্য তাঁর এই মৃত্যুবরণের সঙ্কল্পের বাহানা। অবশ্য কৃষ্ণের তীব্র বিরহ দেখা দিলে তিনি সত্যসত্যই ধরণীগর্ভে সীতার মতো প্রবেশ কবে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন :

'পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।।'' ['বংশীখণ্ড' : ৩১০]

দেখা যাচ্ছে, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের এই আখ্যানকাব্যে নারী প্রেমের ছলনায় বাহ্য মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছে, আবার প্রকৃত বিরহতীব্রতায় সত্যই মৃত্যুকে আহ্বান করছে। রাধার এই মৃত্যু আহ্বান 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এ অভিমানিনী সীতার বসুন্ধরাকে আহ্বান করে মৃত্যুবরণের সঙ্কল্পকে মনে পড়িয়ে দেয়—''তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি।''

৪. বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ যম ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মৃত্যু ও যমের প্রসঙ্গ প্রথম সরাসরি পাচ্ছি মঙ্গলকাব্যগুলিতে। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত পূর্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল' কাব্যে যম ও চিত্রগুপ্তের [যমের মন্ত্রী ও মৃত ব্যক্তিদের পাপ-পুণ্যের হিসাবরক্ষক] প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাচ্ছি; যমের সঙ্গে মনসার যুদ্ধের বিবরণও মিলছে।

কাব্যের 'অনিরুদ্ধ-উষা হরণ পালায়' দেখি, অগ্নির বর পাবার পর অনিরুদ্ধ ও উষা চন্দনকাঠের চিতাগ্নিতে প্রবেশ করল :

'যখন অগ্নিতে প্রবেশ করিলা দুইজন।
চিত্রগুপ্ত করে যমপুরেতে লিখন ॥
আয়ুশেষ পরমায়ু দিনে দিনে ঢাকি।

পাতে পাতে লিখে ওয়াশীল বাকি॥
টুটিল কাল তাহার আয়ু হইল শেষ॥'...

চিত্রগুপ্ত যমের কাছে জানতে চাইলেন, আয়ুশেষ অনিরুদ্ধ ও উষাকে যমপুরীতে আনতে কোন দূত পাঠাতে হবে? তখন :

'চিত্রগুপ্তের মুখ যম শুনিয়া বচন।
দোঁহারে আনিতে পাঠায় দূত তিনজন॥'

এরা হল—ত্রিদশ, ত্রিশিরা এবং শূকরবদন। এরা রক্তলোচন। এরা লোহার দড়ি এবং লোহার মুদগর নিয়ে মর্ত্যে এল এবং অনিরুদ্ধ ও উষার প্রাণ কেড়ে নিয়ে যমপুরীর দিকে চলল। অনিরুদ্ধ ও উষা পদ্মাবতী বা দেবী মনসার ভক্ত। তাই পদ্মাবতী ভক্তদের রক্ষা করতে যমদূতদের পথরোধ করলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যমদূতদের বললেন:

'পাপীজন নিতে তোর যমের অধিকার।
পুণ্যজনে নিতে যম কোথাকার ছার॥'

যমদূতরাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা যমের অধিকার ও প্রতাপ ঘোষণা করল:

'দূত বলে পদ্মাবতী বৃথা হও কুপিত।
আমার যমের অধিকার সংসার বিদিত ॥...
চৌদ্দ সহস্র কুম্ভীপাকে কৃষ্ণবর্জিত।
কোন জন না যায় আমার যমের বিদিত ॥...
হেন যমের পদ্মা যে হয় তাপী।
যমের দোষ নাই সেই সব পাপী ॥
ত্রিদশ ভুবনে মোর যম মহাশয়।
তাঁহার প্রসাদে মোর কাহারে নাহি ভয়॥'

যমদূতের গর্বোক্তি এবং যম-প্রশস্তিতে ক্রুদ্ধ মনসা তাঁর অনুচর ধামুকে দিয়ে দূতের পথরোধ করালেন—'ধামু নাগের সহিত দূতের পথে হইল দ্বন্দ্ব।' ধামু যমদূতকে ডেকে মনসার সঙ্গে বিবাদ করতে বারণ করল:

'আরে দূত কহ তোমার ধর্মরাজের আগে।
চল চল আরে দূত জড়িয়া বাণের সুত
উহার মায় মনসার দাসী।
যে জন পদ্মার দায় তারে নারে যমরায়
আর যে বা জন মরে কাশী ॥
অনুচর তুই ছার পদ্মারে না বলে আর
সকল সংসার যারে পূজে।
যে জন গঙ্গায় মরে যম নিতে নাহি পারে
সে জন বৈকুণ্ঠে সুখ ভুঞ্জে ॥

তোর প্রভু ধর্মরাজ সেই কিবা বোঝে কাজ
কেবা তারে হেন বুদ্ধি দেও।
বিচারিয়া চাহ পাছে কোনকালে হেন আছে
পদ্মার সেবক জনে নিও ॥'

ধামু নাগের এইসব উক্তিতে যমের অধিকারের সীমা স্পষ্ট হয়ে যায়। ধামু যমদূতকে দংশন করে। বিষের জ্বালায় দূত ছটফট করতে করতে যমপুরীতে যমের কাছে উপস্থিত। তারপর যমের উদ্দেশ্যে তার অনুযোগ:

'দূত বলে ধর্মরাজ শুন হে বচন।
যত অপমান পাইলাম কি কব কথন ॥
রবির পুত্র হইয়া তোমার কথার নাহি দড়।
এ ছার বিষয় কার্য এখনই ছাড় ॥'

চিত্রগুপ্তের বিরুদ্ধেও যমদূত অভিযোগ করল:

'চিত্রগুপ্ত কি বা লিখে কি বা বুঝে ভাও।
ভালমন্দ না বুঝিয়া সদাই বলে যাও ॥...
যেখানে আমল নাই তথা পাঠাও পাছে।
পদ্মার দূতেতে কিলায় তোমরা হাস কিসে ॥'

অপমানিত যমদূত গলায় কলস বেঁধে মরতেও চায়। তখন:

'শুনিয়া দূতের কথা ধর্মের নন্দন।
জ্বলিয়া উঠিল যেন জ্বলন্ত হুতাশন ॥
যম বলে—আরে দূত শুন মোর বাণী।
মোর দূত মারিয়াছে কাণী বড় প্রাণী ॥
নর বেটা চান্দ তারে জিনিতে না পারে।
আজি সে কাণী কি আমার দূত মারে ॥
আমার সঙ্গে বাদ করে এত বড় পদ।
আজি রণে আসিলে হইবে স্ত্রী-বধ ॥'

নিজের Prestige বজায় রাখার জন্য এবার :

'সাজিয়া যমরায় যুদ্ধ করিতে যায়
সাজ সাজ বলে দূতগণে।'

যমের সঙ্গে তাঁর দুই শালাও যুদ্ধ করতে চল্‌ল। যমদূতদের মধ্যে চলল—ধর্ম, ধর্মাক্ষ, লোদ, শূকরবদন, নীলাই, ব্রজকাল, মূলাদাঁতী প্রমুখ। যমদূতদের এই নামগুলি পুরাণে নেই। বিজয়গুপ্ত সম্ভবত লোকজীবন থেকে নামগুলি সংগ্রহ করেছেন। দূতগণ এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে: 'বৈতরণী পার যম হইল সত্বর।' তারপর: 'আপনি রহিল যম অক্ষয় বটের তলে।' এরপর যম ঘটিমুখ, শিলামুখ, ভীম, ভীমাক্ষ, ধূম্রলোচন, দীর্ঘমুখ, সূচীমুখ প্রমুখ দূতদের মাধ্যমে মনসাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালেন—'তাহার আম্মার যুদ্ধ দেখুক সর্বজন।' ক্রুদ্ধ মনসা যমদূতদের

জানালেন:

'স্ত্রী জাতি দেখিয়া মোরে নাহি ভাবে সম
আজি রণে পশিলে হইবে যমের যম ॥... ...
এত বড় দর্প বেটার বলিয়া পাঠায় সে।
সেত নরের যম তার যম কে ॥
এই কথা কহিও দূত তোর ধর্মরাজের আগে।
সুখে থাকিতে তারে বিধি বাদে লাগে ॥... . .
তাহার চতুর্দশ যম মোর নাগ উনকোটি।
বিষজ্বালে পুড়িয়া মারিব না রাখিব একগুটি।'

উভয় পক্ষের এই বাহ্বাস্ফোটের পর সত্যসত্যই যম ও মনসার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল:

'মহিষপৃষ্ঠে আরোহণ হাতে কালদণ্ড।
মনসার সাক্ষাতে যম দাঁড়াইল প্রচণ্ড ॥'

যম মনসার প্রতি শেলপাট ছুঁড়লেন—'শেলের গন্ধে পালায় সব বড় বড় সর্প।' মনসা তখন—'হুঙ্কার দিয়া যমের শেল করিল ভস্ম।' যম এবার অর্ধচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করলেন। পদ্মাবতী তা নিবারণ কবলেন। দেবী ছুঁড়লেন শিলীমুখ বাণ। ইন্দ্রবাণে তা যমরাজ দুখণ্ড করলেন। যম এবার ঐশিক বাণ ছুঁড়লেন—'বজ্রাঘাত শব্দে পড়ে মনসার বুকে।' বাণ খেয়ে পদ্মাবতী সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হলেন। তাই দেখে উল্লসিত যম গরুড় বাণ ছাড়লেন। দেবী প্রয়োগ করলেন অর্ধচন্দ্রবাণ! 'সেই বাণে কাটিলেন যমের সারথি।' দেবী পরপর অনন্ত বাণ এবং মাহেন্দ্র অস্ত্র যমের উপর প্রয়োগ করলেন:

'যত যত ব্রহ্ম অস্ত্র মনসার শিক্ষা।
যম রাজার উপর করিল পরীক্ষা ॥
বাণ খায়ে ব্যথা পাইয়া ধর্মরায়ে।
কাল মুদ্গর তুলিয়া লইল বাহে।'... ...
মুদ্গর ফুটিয়া পদ্মা ভয় পাইল ব্রাহ্মণী ॥

তখন সহচরী নেতার পরামর্শে মনসা: 'এড়িলেক নাগপাশ যম হইল বন্দী।' ফলে 'যুদ্ধ হারিলা রবির নন্দন।' আর :

'বন্ধন সহিত যম রহিল সত্বর ॥
তিন দিন বন্দী যম পদ্মার দ্বারে।'

দেবর্ষি নারদ একথা গিয়ে ব্রহ্মার গোচরে জানালেন। ব্রহ্মা পরামর্শ দিলেন—সপ্তর্ষিদের নিয়ে পদ্মার কাছে যেতে। সপ্তর্ষিদের সঙ্গে নারদও চললেন। মনসাকে:

'নারদ বলেন—দিদি শুন গো বচন ॥
ব্রহ্ম পাঠাইয়াছেন মোরে তোমার গোচর।
সত্বরে ছাড়িয়া দেও রবির কোঙর ॥'

তখন—'নারদের বচনে দেবী হাসেন ঘন ঘন।' বিপাকে পড়ে যম নারদের কাছে কেঁদে বললেন:

'মর্ত্যবাসীদের মধ্যে যারা রামের নাম নেয় তারা মৃত্যুর পর যমপুরীতে না গিয়ে স্বর্গে যায়। যারা নিরাহারে একাদশী করে তারা মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠে যায়। গঙ্গাজলে যে প্রাণত্যাগ করে তার ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয় অবশিষ্ট লোকদের উপর এতদিন আমার অধিকার ছিল। এখন থেকে যদি তাদের উপর পদ্মার অধিকার হয়; তাহলে আমার কি রইল? আমি বিপাকে বন্দী হয়ে এর কোনো প্রতিকারও করতে পারছি না।' নারদ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: 'যম, কেঁদো না। ঊষা আর অনিরুদ্ধ শিবপুরে গেছে।' নারদ এবার মনসাকে অনুরোধ করলেন—'বিদায় দেও যাউক যম আপন ভবন।' যমের কাতরতা দেখে পদ্মাবতী প্রসন্ন হলেন। তখন :

'যম বিদায় দিল জয় বিষহরী।
আনন্দে চলিয়া গেল আপনার পুরী ॥'

পুরোনো বাংলা সাহিত্যে যমের কথা এত বিস্তৃতভাবে আর কোনো কাব্যে নেই। এর মধ্যে পাচ্ছি যমের বর্ণনা, যমপুরীর কথা, যমদূতদের তালিকা, যমের দুই শালাব উল্লেখ, মর্ত্যবাসীদের উপর যমের অধিকারের সীমা, যমের অস্ত্রশস্ত্রাদির নাম, তাঁর যুদ্ধের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা এবং স্ত্রী-দেবতার কাছে যুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের বিশদ বিবরণ। পঞ্চদশ শতকের শেষ লগ্নের বাঙলাদেশে এর প্রয়োজন ছিল। ত্রয়োদশ শতকের তুর্কি বিজয়ের পর বাঙলায় দু-শতাব্দী কেটে গেছে। হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নশ্রেণী-পূজিত লৌকিক দেবদেবীকে পৌরাণিক দেবসমাজে মর্যাদার আসন দিতে হবে। যম পৌরাণিক দেবতা। মনসা লৌকিক ও অনার্যপূজিতা। মনসার হাতে যমের পরাভব দেখিয়ে লৌকিক দেবীর গৌরব পৌরাণিক দেবতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হল।

৫. দ্বিজ মাধবের 'সারদাচরিত' বা 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ যম-প্রসঙ্গ

১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত দ্বিজ মাধবের 'সারদাচরিত বা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও স্ত্রী-দেবতার সঙ্গে যমের সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের বণিকখণ্ডে 'স্বর্গে প্রত্যাবর্তন' অংশে দেখি বণিক ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত। তার বধূ, শ্রীমন্ত-জননী খুল্লনা, ধনপতি প্রমুখকে মর্ত্যলীলার শেষে দেবী সারদা দিব্যরথে চড়িয়ে স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এদিকে যম জানেন, মৃত মর্ত্যবাসীদের উপর তাঁর অধিকার। সুতরাং শ্রীমন্তদের ছিনিয়ে নিতে তিনি অগ্রসর হলেন :

'অতি ক্রোধে ডাকি বোলে দূত কালানল।
নর কাড়ি আনিতে আপনে সাজি চল ॥'

তখন মুদগর, মুষল, চামের দড়ি প্রভৃতি নিয়ে যম ও যমদূতরা 'সমর করিতে' দেবীর কাছে উপস্থিত হল। 'মৈষ বাহনে চড়ি আইসে ধর্ম্মরায়ে।' তখন মায়া বিস্তার করে—'আর এক যম মাতা সৃজিল লীলায়ে।' শুধু তাই নয় :

'যমের বাহন আর যথ সেনাপতি।
মায়া-যম করি তানে দিলেক বিভূতি ॥'

যম ছাড়বার পাত্র নন:

'যম বোলেন দুর্গা বলিয়ে তোমারে।
আম্মার নর লইয়া যাও কোন অহঙ্কারে ॥

প্রাণবন্ত যে জন জন্মিয়াছে ভবে।
এহার উপর অধিকারী হই আমি সবে ॥'

এখানেও সেই অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব। তখন দেবী-সৃষ্ট:

'মায়া-যম বোলে—যম মরিতে আইলা যে।
দুর্গার সেবকের উপর অধিকারী কে ॥
বারে বারে বোল যদি না মান প্রবোধ।
কালদণ্ড দিয়া তোর চিরিবাম গোদ ॥'

এখানে পৌরাণিক যমের মধ্যে লৌকিক গোদা যমকে দেখতে পাচ্ছি। দুই যমের মধ্যে লড়াই বেধে গেল:

'মায়া-যমে রণে দেবতা নাহি আঁটে।
গন্ধর্ব-অস্ত্রে যমের সকল সেনা কাটে॥
দুর্গার প্রসাদে সেই রণের জানে সন্ধি।
নাগপাশে ধর্মরাজার মহিষ কৈল বন্দী॥'

পরাজিত যম বেদনার্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে গেলেন:

'একাকী চলিলা যম করিয়া রোদন।
ব্রহ্মার সদনে গিয়া দিল দরশন॥
যমে বোলে—আর বিষয়ের কার্য কি।
নর আনিতে লাঘব করে হেমন্তের ঝি॥'

যমের করুণ বচন শুনে—'কহিতে লাগিল ব্রহ্মা দুর্গার মহিমা।' জগৎমণ্ডলে দুর্গা মহামায়া। তিনি প্রতিলোমকূপে কোটি ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে পারেন:

'হেন দুর্গার সনে তুমি করিতে চাহ রণ।
ভাগ্যবশে যম তোর রহিল জীবন॥'

ব্রহ্মার বচনে যমের ক্রোধশান্তি ও কাতরতা নিবারিত হল। তখন যম :

'দুর্গার গোচরে গিয়া করিল প্রণাম॥
অবনী লোটাইয়া যম কহে যুগপাণি।
অপরাধ ক্ষম মোর জগতজননী॥'

যমের ক্ষমা প্রার্থনায় দেবী প্রসন্না ও বরদা হলেন:

'পদ্মহস্ত বুলাইল ধর্মরাজার গায়ে॥'
সদয় হইয়া তার জিয়াইল কটক।
হরষিতে নিজপুরে চলিলা অন্তক॥'

দেবী কিন্তু তাঁর ভক্তদের উপর নিজ অধিকার ছাড়লেন না—যমের হাতে তাদের সমর্পণ করলেন না। লহনা, খুল্লনা আর ধনপতিকে পশুপতি নিজে নিয়ে গেলেন শিবপুরে। আর :

''সুশীলা জয়া আর সাধু শ্রীয়পতি।
তিনজন লইয়া গেলে দেবী পার্বতী ॥'

দ্বিজ মাধবের 'সারদাচরিত' কাব্যেও বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের মতো যুদ্ধে দেবীর কাছে যমের পরাভব এবং তাঁর অধিকারের সীমা-সঙ্কোচ দেখানো হয়েছে। উদ্দেশ্য একই। অনার্য দেবী 'চণ্ডী' হয়েছেন শিবঘরণী 'চণ্ডী' বা 'সারদা'। তাঁর কাছে পৌরাণিক দেবতা যমের পরাভব দেখিয়ে লৌকিক দেবীর গৌরবঘোষণা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ মৃত্যু-প্রসঙ্গ

আনুমানিক ১৫৪৪, অথবা ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সরাসরি যমের প্রসঙ্গ নেই, তবে মৃত্যুর প্রসঙ্গে দু-একবার যমকে স্মরণ করা হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গলে মৃত্যুবর্ণনা দেবখণ্ড, নরখণ্ড ও বণিকখণ্ডে নানাভাবে করা হয়েছে। দেবখণ্ডে সতী দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে যোগে অগ্নিকুণ্ডে তনুত্যাগ করেছেন :

'যোগেতে ছাড়িল তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গলের গাথা।।'

নীলাম্বরপত্নী ছায়া হাতে আম্রডাল ধরে সহমৃতা হয়েছেন। তিনি জানেন :

'দেহযোগ নহে নিত্য কেবল মরণ সত্য
সর্বলোক এই কথা জানে।'

তবু তরুণ যৌবনে নীলাম্বর এবং তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হল—এই তাঁর আক্ষেপ! তা সত্ত্বেও:

'ঢালি বহু ঘৃতভাণ্ড জ্বালিল অগ্নির কুণ্ড সুরনদীতীরে সুরপতি।
দুই কুলে দিয়া বাতি জীবন তেজিল সতী পতির আনলে ছায়াবতী।।'

সহমৃতা হবার সময় সেকালে নারীরা আম্রডাল ধরত। [যার থেকে বাংলা প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে: 'মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে' এবং পিতৃকুল ও পতিকুল—দুই কুলের কল্যাণকামনায় বাতি জ্বালত—এই দুই লৌকিক আচারের পরিচয় এখানে পাচ্ছি।]

কাব্যের নবখণ্ডে ফুল্লরা তার অতিরঞ্জিত দুঃখের বারমাস্যায় মাঘমাসের শীতকে যমের সঙ্গে তুলনা করেছে:

'উদর পুরিঅ অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম-সম শীত তথি নিরমিল বিধি।।'

কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু পরাস্ত ও বন্দী। তার মৃত্যু আসন্ন। কোটাল—'হাড়ি দিআ মহাবীরে কৈল উভমুএগ'। মৃত্যু আসন্ন জেনে কালকেতুর খেদ—'মাঁস বেচ্যা ছিনু ভাল/ এবে সে পরাণ গেল'/ বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী।' শেষ পর্যন্ত তার সুবুদ্ধির উদয় হল। বিষাদ ছেড়ে সে হৈমবতীর স্তুতি করল এবং প্রসন্ন দেবীর কৃপায় মুক্তি পেল।

কাব্যের বণিকখণ্ডে শ্রীমন্ত সিংহল-নৃপতিকে অত্যাশ্চর্য 'কমলে কামিনী' মূর্তি দেখাতে না পেরে বন্দী এবং শেষে মশানে মৃত্যুর সম্মুখীন। কিন্তু দেবী চণ্ডীর স্তুতি করায় সেও মুক্তি পেল। দেবী-সৃষ্ট দানারা কোটালের ঘাড়ে 'ঘাড়হাতা' মারল এবং করপ্রহারে তার 'ছিণ্ডিয়া লয় মাথা।' অন্যান্য অনুচরদেরও 'মাথার ভাঙ্গে খুলি।' এখানে কলিঙ্গ-কোটাল এবং তার অনুচরদের মৃত্যু এসেছে বীভৎস রূপে।

৭. কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ মৃত্যু ও যম-প্রসঙ্গ

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে নানারূপে। কাব্যের আদিকাণ্ডে দশরথের শব্দভেদী বাণে অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধুর মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। সিন্ধু তার পিতামাতার আসন্ন মৃত্যু জেনে কাতর হয়েছে। মৃত্যুকালে সে 'নারায়ণ' স্মরণ করেছে:

'মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে।।'

এই কাণ্ডেই দশরথের পিতা অজ ও মাতা ইন্দুমতীর অলৌকিক মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে স্বর্গের পারিজাত-মালার স্পর্শে। এর মূলেও আছে লোককথার জাদুক্রিয়া— পুষ্প [বৃক্ষজাত বস্তুর]-স্পর্শে অলৌকিক মৃত্যু।

এই কাণ্ডে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার কাহিনীতে তাঁদের পুত্র রুহিদাস বা রোহিতাশ্বের মৃত্যু এবং তার ফলে পিতা-মাতার বিলাপের বর্ণনা মর্মস্পর্শী। চণ্ডালরূপী রাজ্যহারা রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নী শৈব্যা এবং পুত্র রুহিদাসকে চিনতে পেরে পুত্রের জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন। শৈব্যাও তাই।—চন্দনকাষ্ঠের চিতার—'মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে মাতা-পিতা।' চিতায় জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দেবার সময় ধর্মরাজ যম উপস্থিত :

'হেনকালে ধর্মরাজ কহেন সাক্ষাতে।।
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবা জীবন।
আমি জিয়াইয়া দিব তোমার নন্দন।।
পদ্মহস্ত বুলাইয়া বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায়।।'

লঙ্কাকাণ্ডে কুম্ভকর্ণের মৃত্যুবর্ণনা উপলক্ষে দু'-বার যমের প্রসঙ্গ স্মরণ করা হয়েছে। রাম কুম্ভকর্ণকে হত্যা করতে যে বাণ প্রয়োগ করেছেন তাকে 'যমদণ্ড'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে:

'যমদণ্ড হেন বাণ রত্নেতে উজ্জ্বল।
ছুটিল রামের বাণ দশদিক আল।।'

ভাই কুম্ভকর্ণের মৃত্যুবার্তা শুনে লঙ্কেশ্বর রাবণ বিলাপ করেছেন:

'ভাই নহি আমিরে চণ্ডাল সহোদর।
কাঁচা ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর।।
চন্দ্র সূর্য বায়ু যম দেব পুরন্দর।
মহাসুখে নিদ্রা যাবে ঘুচে গেল ডর।।'

কুম্ভকর্ণের মৃত্যু উপলক্ষে যমের যে প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, তাতে তাঁর ভীষণ রূপের আভাস। কিন্তু রুহিদাসেব পুনর্জীবন-দাতা যমের মূর্তি মানবিক ও স্নেহকোমল। মৃতের পুনর্জীবন-লাভ লোককথার একটি সুপরিচিত 'motif' বা অভিপ্রায়। এখানে তার ব্যবহার করা হয়েছে।

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ রামচন্দ্রের মহিমা খ্যাপন করতে রাবণের কাছে যমের পরাভবের কথা স্মরণ করা হয়েছে। রাবণ—'শমনদমন'; আবার রামচন্দ্র—'রাবণদমন'। রামের পুণ্যনাম

নিলে আর কেউ মৃত্যুর পর 'শমনভবন' বা যমপুরে যায় না ; সে 'পরমপদ' বা মুক্তি পায়:

'শমনদমন রাবণ রাজা,
রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন—
যে লয় রামের নাম।।'

কবি রামনামের প্রশস্তি গেয়ে 'যমের দায়' এড়াতে চেয়েছেন:

'রামনামের স্মরণে যমের দায় তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম-পদতরী।।'

এমনকি রাবণও মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, ভাগ্যবলে যুদ্ধক্ষেত্রে রামের হাতে মৃত্যু হলে তিনি যমপুরে নয়, বিষ্ণুপুরে যাবেন:

'মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে।।
বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবনে-মরণে।।'

এখানে যমের অধিকারের সীমাবদ্ধতা এবং প্রচ্ছন্ন রামভক্তের মৃত্যুর পর বিষ্ণুপুরস্থিতির কথা বলা হয়েছে।

রাবণ একবার স্বর্গপুর থেকে [লঙ্কায়] আসার পথে শূন্য থেকে যমপুরী দর্শন করেছিলেন। যমের ভুবনে তিনদ্বারে সাধুজন থাকেন। কিন্তু 'অন্ধকার দক্ষিণদ্বারে পাতকীর থানা'। সেখানে—'অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড'! যমদূতরা—'তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড।' 'বিষম প্রহারে' তাদের—'না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে।' এমনকি যম স্বয়ং পাপীদের প্রহার করেন—'যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর।' এখানে যমের কঠোর শাস্তিদাতা মূর্তি চিত্রিত।

৮. কাশীদাসী 'মহাভারত'-এ যম ও মৃত্যু-প্রসঙ্গ

ব্যাসদেবের সংস্কৃত 'মহাভারত' অবলম্বনে কাশীরাম দাসের বাংলা 'মহাভারত' রচিত হয়েছে ১৫৯৫ থেকে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অষ্টাদশ পর্বের এই বিপুলায়তন কাব্যে মৃত্যুর প্রসঙ্গ বহুস্থানে নানাভাবে এলেও যমের প্রসঙ্গ সরাসরি এসেছে আদিপর্বের 'সাবিত্রী সত্যবান' আখ্যানে। আমরা শুধু এই আখ্যান প্রসঙ্গটিই দেখব।

কাল পূর্ণ হলে সত্যবান বনে কাঠ কাটতে গিয়ে 'সহস্র নাগের দংশন'-সম ঘোর শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন এবং মারা যান। পতিব্রতা পত্নী সাবিত্রী যমদূতদের আসার অপেক্ষায় থাকেন। যমের আজ্ঞায় যমদূতগণ বনে সত্যবানের মৃতদেহ নিতে গেল, কিন্তু 'পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।' তখন ধর্মরাজ নিজে সাবিত্রীর কাছে এলেন। সত্যবানের মৃতদেহ দেখিয়ে সাবিত্রীকে তিনি বললেন: 'কাল পূর্ণ হল আজি লয়ে যাই আমি!' সাবিত্রী বাধা দিলেন না, কিন্তু 'কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি।' যম তাঁকে প্রবোধ দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টায় বর প্রার্থনা করতে বললেন। তবে : 'সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্যবর।' সাবিত্রী প্রার্থনা করলেন:

'হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।' যম অসচেতনে সম্মত হয়ে বর দিলেন : 'মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি।' কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সত্যবান ত মৃত! স্বামী ছাড়া অন্যের সন্তান ধারণ করতে হলে সাবিত্রীকে অসতী হতে হয়। তখন 'পরম লজ্জিত' হয়ে মৃত্যুপতি সত্যবানকে পুনর্জীবন দান করলেন। সাবিত্রীকে বললেন :

'লহ ত তোমার পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥'

এখানে যম প্রসন্ন ও বরদ। তাঁর চরিত্র 'Benign and Benevolent'। কৃতান্তরূপ সংহরণ করে তিনি যে বরদ মূর্তি ধরে মৃত সত্যবানকে বাঁচিয়ে তুললেন, এতে লোককথার সেই মৃতের পুনর্জীবন দান 'Motif' বা অভিপ্রায়ই কাজ করেছে।

৯. 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ মৃত্যু-প্রসঙ্গ

চৈতন্যচরিতকাব্যে মৃত্যুর কথা মাঝে মাঝে এসেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যমের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। আনুমানিক ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে আদিখণ্ডে। ব্যাকরণের অধ্যাপক ও টীকাকার নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গে গেলেন বিদ্যাপ্রচার করতে। তাঁর পূর্ববঙ্গে থাকার সময় সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হল। বৃন্দাবনদাস এই ঘটনাকে একটু রূপকের আবরণ দিয়ে লিখেছেন : 'প্রভুর বিরহসর্প দংশিল লক্ষ্মীরে।' নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গ থেকে নবদ্বীপে ফিরলেন। সব কথা শুনে পুত্রবধূ-বিরহকাতরা জননী শচীদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে জগৎ ও মনুয্যজীবনের অনিত্যতার কথা বললেন। নিজে হয়ে উঠলেন পরম গম্ভীর। এরপর পরলোকগত পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্য গদাধর পাদপদ্মে পিণ্ড অর্পণ করতে তিনি গয়াধামে গমন করলেন। সম্ভবত এখানে তিনি লক্ষ্মীদেবীর জন্যও পিণ্ডদান করেছিলেন। এই ঘটনায় শ্রীগৌরাঙ্গ মানবজীবনে মৃত্যুর অনিবার্যতা মেনে নিয়েছেন এবং হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মৃত আত্মজনের জন্য গয়ায় পিণ্ডদান-ক্রিয়াও সম্পন্ন করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য সম্ভবত রচিত হয় ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে। এই কাব্যের অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ যবন হরিদাসের তনুত্যাগ এবং তাঁর পার্থিব দেহের অন্ত্যেষ্টি সৎকারের বিশদ বর্ণনা আছে। হরিদাসের মনে হয়েছিল, মহাপ্রভু শীঘ্রই মর্ত্যলীলা সংবরণ করবেন। সে দুঃখ তিনি সইতে পারবেন না। তাই প্রভুর আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করতে চান। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল। হরিদাস শ্রীচৈতন্যকে সামনে বসিয়ে, বুকে তাঁর দুটি শ্রীচরণ ধরে, সব ভক্তের পদরেণু মাথায় নিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলতে বলতে প্রাণত্যাগ করলেন। ভক্তবিয়োগে মহাপ্রভু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তখন :

'হরিদাসের তনু কোলে লৈল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥'

এরপর হরিদাসের মৃতদেহ নিয়ে সঙ্কীর্তন করতে করতে সমুদ্রতীরে যাওয়া হল। হরিদাসের মৃতদেহ সমুদ্রজলে স্নান করানো হল। তাঁর অঙ্গে প্রসাদ চন্দন মাখানো হল। জগন্নাথদেবের প্রসাদী পট্টডোরী ও প্রসাদী বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া হল হরিদাসের মরদেহে। তারপর সমুদ্রতীরে

স্বর্গদ্বারে বালুকায় গর্ত করে ঐ দেহ শোয়ানো হল। 'হরি বোল, হরি বোল' উচ্চারণ করতে করতে মহাপ্রভু :

'আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায় ॥
তারে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিগে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল ॥
তাহা বেড়ি প্রভু করে কীর্তন-নর্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥'

এখানে আমরা ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব মহান্তের মৃত্যুর পর তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং সমাধিদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাচ্ছি। মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসের 'তিরোভাব মহোৎসব'ও সম্পন্ন করেন, যা অধুনা মুসলমান পীরদের 'উরস' উৎসবের সঙ্গে তুলনীয়। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হয়েও মুসলমান ভক্তের এই অন্ত্যেষ্টি সৎকার ও তিরোভাব মহোৎসব সম্পাদনের মধ্য দিয়ে সেই কতকাল আগে শ্রীচৈতন্যের উদার প্রেমধর্ম, ব্যাপ্ত মানবিকতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রশংসনীয় পরিচয় ফুটে উঠেছে।

১০. 'ধর্মমঙ্গল'-এ মৃত্যু প্রসঙ্গ

'ধর্মমঙ্গল' রাঢ়ের আঞ্চলিক দেবতা ধর্মের পুণ্যগাথা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. সুকুমার সেন, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য ইতিহাসকারগণ ধর্মকে মিশ্রদেবতা বলেছেন। তাঁর উপাসনায় রাঢ়ের আদিম জাতির কুলকেতু বা 'Totem' কূর্মপূজার জড় আছে। তা ছাড়া তার মিশ্র দেবপ্রকৃতিতে বিষ্ণু শিব, সূর্য এবং সূর্যতনয় যমের সম্মিলন হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, যমের নামান্তরও ধর্মরাজ। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে মৃত্যুর প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে। তার সঙ্গে ধর্মরাজের প্রসঙ্গও জড়িত। তবে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মরাজকে যম-রূপে চিহ্নিত করা হয়নি।

বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুরের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর, 'অনাদ্যমঙ্গল' বা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচিত হয় ১৫৭১ শক বা ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে। 'অনাদ্যনিরঞ্জন'ই ধর্মরাজ। এই কাব্যে নানা পালায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ এবং 'যমঘর'-এর উল্লেখ আছে। যেমন 'মল্লবধ' পালায় দেখি, কাব্যনায়ক লাউসেনের সঙ্গে সংগ্রামে দুই মল্ল পরাস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে :

'দুই মল্ল লাউসেন ধরি দুই হাথে।
ঐমনি কাছাড় দিল গুরুর সাক্ষাতে ॥
দুই মল্ল তার যদি গেল যমঘরে।
দ্বিজ রূপরাম গান বাঁকুড়ার বরে ॥'

বাঁকুড়া রায় আঞ্চলিক ধর্মদেবতা। কবি তাঁর বরে কাব্য রচনা করেছেন।

দুই মল্লের মৃত্যুর পর চার মল্ল একসঙ্গে লাউসেনকে আক্রমণ করল। তারা—'অকালে পাবক যেন কালান্তক যম।' লাউসেন চারজনকে তুলে আছাড় মারল—'তাদের ভাঙ্গিয়া মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়।' এভাবে 'চারি মল্ল গেল যমঘর।'

'কলিঙ্গা বিভা' পালায় বীর কালু ডোমকে 'শমন' বা যমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে :

'বীর কালু মনে করে ঈশ্বরীচরণ।
সমরে রুষিল যেন এ কাল শমন।।
হানহান হুহুঙ্কার ঘন ঘন দেই।
অবহেলে যত সেনা যমঘরে লেই।।'

বর্ধমান জেলার কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচিত হয় ১৬৩৩ শক বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে। এই কাব্যের 'স্বর্গারোহণ' পালায় দেখা যায়, লাউসেন 'সংসারশরীর' বা পার্থিব শরীর নিয়েই রথারোহণে যমপুরে উপস্থিত। তাঁকে 'দেখে৷ অর্ঘ্যদানেতে আদর কৈল যম।' কিন্তু পাপীদের প্রতি যম এবং যমদূতরা নির্দয়। লাউসেন দেখলেন:

'যমদ্বার মহাঘোর অন্ধকার অতি।
দেখিল কাতর তায় পাপের দুর্গতি ॥
উঠে পড়ে মহাপাপী নরকের কুণ্ডে।
যমদূত অমনি ডাঙ্গশ মারে মুণ্ডে ॥
যে রূপোতে যে যে পাপ করেছিল নর।
নরক ভুঞ্জায় তার যমের কিঙ্কর ॥'

এখানে দেখা যাচ্ছে, যম পুণ্যবান লাউসেনকে সম্মান ও আদর ক'রে অর্ঘ্য দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দূত এবং কিঙ্করগণ নরকে পাপীদের কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়েছে।

১১. 'অন্নদামঙ্গল'-এ মৃত্যু-প্রসঙ্গ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ বড়ো শিল্পী-কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচিত হয় ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে। এটি মূলত দেবকথাকে অবলম্বন করে মানবিক জীবন-উল্লাসের কাব্য। কিন্তু এর মধ্যেও মাঝে মাঝে মৃত্যু প্রসঙ্গ এসেছে , তবে মৃত্যুর অধিদেব যমের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষত নেই।

কাব্যের দেবখণ্ডে দেখি, মুকুন্দ-কবির 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর মতো ভারতচন্দ্রেও দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে শিবঘরণী সতী যোগানলে তনুত্যাগ করেছেন।—'শরীর ছাড়িয়া উত্তরিলা হিমাচল।' তখন অনুচর নন্দীর মুখে সতীর দেহত্যাগের কথা শুনে শঙ্কর প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করবার জন্য তিনি প্রমথ অনুচরগণসহ ধেয়ে এলেন—'মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।' তাই দেখে—'কথা না সরে দক্ষরাজে ত্রাসে।' মৌনমুখে হেঁটমুণ্ডে দক্ষ ভাবল, তার মৃত্যু আসন্ন। সত্য সত্যই দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন হল— 'মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।' দক্ষের পত্নী প্রসূতি জামাই শিবের কাছে কেঁদে পড়লেন—'তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।' সলজ্জ শিব শ্বশুর দক্ষকে বাঁচিয়ে দিলেন কিন্তু দক্ষ তো কবন্ধ! তখন :

'শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেন আঁটিয়া।।'

দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য কাব্যে যম মৃতের পুনর্জীবন দিয়েছিলেন। 'অন্নদামঙ্গল'-এ সে-কাজ করেছেন শিব। পশুমুখ অ্যানুবিস্ প্রমুখ দেবতার কল্পনা মিশরীয় পুরাণে আছে ; পিরামিড-গাত্রে তার ছবিও দেখা যায়। দক্ষের ছাগমুণ্ডযুক্ত রূপ কি তার দূরাগত ভারতীয় প্রতিরূপ?

সতীহারা শিবের ধ্যানভঙ্গে হরকোপানলে মদনভস্ম, অন্নদার শাপে জায়াসহ বসুন্ধরের যোগাসনে তনুত্যাগ প্রভৃতি ঘটনায় অলৌকিক মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। ব্যাসের দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ প্রয়াসের বর্ণনায় মৃত্যুপ্রসঙ্গ এসেছে কৌতুককর রূপে ব্যাসের এই প্রয়াস ব্যর্থ করার জন্য দেবী অন্নদা সুবৃদ্ধা জরতীর বেশ ধরে 'চার পাঁচ ছয় সাত। / ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত।' প্রতিবারই তাঁর জিজ্ঞাস্য—ব্যাস-কাশীতে মানুষ মরলে কি হবে?' বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ব্যাস শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন—'গর্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে।' দেবীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় 'বুঝিনু বুঝিনু' ব'লে অন্তর্ধান করলেন। মৃত্যুর পর মানুষের পশুরূপে জন্মের কল্পনায় একদিকে যেমন হিন্দু জন্মান্তরবাদ আছে, আর একদিকে তেমনি মানুষ ও পশুর অবিচ্ছিন্ন প্রাণযোগ কল্পনায় লোককথার উপাদান রয়েছে।

১২. বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীতে মৃত্যু-প্রসঙ্গ

বৈষ্ণব পদাবলী অনন্ত ও দিব্য প্রেমের জয়গাথা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার দিব্য প্রেমের মাধুরী ও সুরভি এর সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত। কিন্তু শ্রীরাধার 'পূর্বরাগ' ও 'মাথুর'-বিরহের বর্ণনায় বৈষ্ণব পদকর্তারা মাঝে মাঝে মৃত্যুর কথা বলেছেন বৈষ্ণব দার্শনিক ও আলঙ্কারিক শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পূর্বরাগবতী শ্রীরাধার লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা ইত্যাদি দশটি দশার বর্ণনায় শেষে দশমী দশা রূপে মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন—'মোহো মৃত্যুর্দশা দশঃ।'

বৈষ্ণব পদাবলীতে মৃত্যুর প্রসঙ্গ সব থেকে বেশি আছে 'আক্ষেপানুরাগ' ও 'মাথুর' পর্যায়ে। চণ্ডীদাসের রাধা শ্যামবিরহে সাগরে ডুবে মরে পরজন্মে নিজে শ্রীনন্দনন্দন হতে চেয়েছেন আর প্রিয়কে করতে চেয়েছেন আত্মপ্রতিরূপ রাধা। আক্ষেপানুরাগের পদে তাঁর কণ্ঠে শুনি:

'কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হৈব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা ।।'

দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাধা আক্ষেপানুরাগে শ্রীকৃষ্ণের সামনেই মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন:

'বধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ।।'

গোবিন্দদাসের রাধা মাথুর-বিরহে মৃত্যুর পর প্রিয়ের সঞ্চরণস্থানের মৃত্তিকায় মিশে যেতে চেয়েছেন:

'যাঁহা পহু অরুণচরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইবে মঝু গাত ।।'

চণ্ডীদাসের বিরহিণী রাধা সখীদের অনুরোধ করেছেন, মৃত্যুর পর যেন তাঁর মৃতদেহ তমালের ডালে তুলে রাখা হয়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে ফিরে এসে তাঁর প্রিয় তমালবৃক্ষের ডালে শ্রীমতীর দেহাবশেষ দেখবেন. 'মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।'

বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার মৃত্যুকামনার সঙ্গে মিশেছে তাঁর নিবিড় প্রিয়-অনুরাগ এবং তীব্র অভিমান। মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্তিকা-অধিশায়ী অথবা বৃক্ষলগ্ন হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রাণের চিরন্তন সংযুক্তির দ্যোতক, লোকসংস্কৃতি-উপায়নে এটিও বিশেষ দিক।

শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি অষ্টাদশ শতকের রামপ্রসাদ সেন বীরাচারী মাতৃসাধক। আরাধ্যা

দেবী কালিকার সঙ্গে তাঁর জননী ও সন্তান, বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্যের সম্পর্ক। দস্যুর খড়্গাঘাতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তিনি শমন বা যমকে তিলেক অপেক্ষা করতে বলেছেন। এই অবসরে তিনি বদন ভরে মা কালীকে ডাকবেন:

'তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদনভরে মা কে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী আসনে কি না আসেন দেখি।।'

শমন বা যমকে অপেক্ষা করিয়ে, আসন্ন মৃত্যুকে সামনে রেখে, বীরাচারী সাধকের এই মাতৃদেবী স্মরণ তাঁর ইষ্টদেবীতে অগাধ আস্থা ও গভীর ভক্তির পরিচায়ক

তথ্য-উৎস :

১.	চর্যাপদ	মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত।
২.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত।
৩.	পদ্মাপুরাণ	বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত সম্পাদিত।
৪.	মঙ্গলচণ্ডীর গীত	দ্বিজ মাধব, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
৫.	চণ্ডীমঙ্গল	কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত।
৬.	রামায়ণ	কৃত্তিবাস, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত।
৭.	মহাভারত	কাশীরাম দাস, ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৮.	চৈতন্যভাগবত	বৃন্দাবনদাস, ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত।
৯.	চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত।
১০.	অন্নদামঙ্গল	রূপরাম চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত।
১১.	ধর্মমঙ্গল	ঘনরাম চক্রবর্তী, ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত।
১২.	অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়, বসুমতী সংস্করণ
১৩.	বৈষ্ণব পদাবলী	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত।
১৪.	শাক্ত পদাবলী	অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত।
১৫.	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

যম ও পৃথিবী

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুদেবকল্পনাব ব্যাপারটি বড় অদ্ভুত। তেত্রিশ কোটির হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখেছেন বলে জানা নেই। তবে আমাদের ধারণায় কুলানোর মত সংখ্যার হিসেবেও বিচিত্র মিশ্রণ-জটলার দিকটা সহজেই নজরে পড়ে। বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক দেবতা-অপদেবতা এবং একই দেবতার নানান রূপান্তরের হিসাব মেলাতে গেলে বেশ হিমসিম হতে হয়। তবে এঁদের ধাতুপ্রকৃতির সঙ্গে মর্ত্যলোকবাসী মানুষের স্বভাবসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। কারণ এরা কেউ কোথাও স্বয়ম্ভূ হননি। মানুষের ইচ্ছাবৃত্তি ও কল্পনাই এঁদের জনক। মানুষই অনুদঘাটিত রহস্যমোচনের দায় ও শ্রম এড়ানোর জন্য এক একটা কল্পিত দেবমূর্তিকে নিজেরা স্থানে স্থানে বসিয়ে দিয়েছে। এই দেব-জনন প্রক্রিয়ার একটা ভাল দিকও আছে। জীবচক্র ও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে পৃথিবী গ্রহের অচ্ছেদ্য সংযোগসূত্রের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মননশীল মানুষ যে দার্শনিক ব্যাখ্যার জাল বুনেছে, অনেক পরিচিত দেবতা তারই মধ্যে প্রতীকী[১] অবস্থানেব সুযোগ পেয়েছেন। যদিও মনন দর্শনের আবির্ভাব লগ্নে দেশ-পরিবেশকে গৌরবার্থেও বিশ্ব বলে ধবা হতো, এটাও ঠিক কথা। তখনকার মানুষের ভৌগোলিক চেতনা ছিল নগণ্য মাত্র।

কল্পনার ঝোঁকে মানুষের সচেতনতায় এবং অবচেতনায় আত্মগভাবের প্রতিভাসন ঘটেছিল স্বাভাবিক নিয়মেই, তাই পার্থিব ক্ষুদ্রতার স্তব থেকে মানুষ উত্তরণ ও মুক্তি চাইলেও দেবতারা মানুষেরই প্রকৃতি ও রিপুবশে ভারাকর্ষণের জায়গায় থেকে গেছেন। যে দেবতার কাছে আধ্যাত্মিক মুক্তি চাইছি আমরা, তাঁরা নিজেরাই তারাকর্ষণের শিকার। একটা স্তোক হয়তো আমাদের শান্ত করেছে। জীব জগতের মানুষের ক্ষেত্রে যা অন্যায় বা অপরাধ, দেবতার ক্ষেত্রে তা ঐশ্বরিক লীলা। অতএব বোঝা যাচ্ছে, দেবতা গড়তে গিয়ে মানুষ দ্বন্দ্বের ফাঁপরে পড়েছিল। কাঙ্ক্ষিত গুণবত্তা জাগতিক জীবনে বিরল ছিল বলেই হয়তো তার মডেল বা প্রতীক গড়ার দিকে ঝোঁক গিয়েছিল বেশি করে। দেবায়নের এই মহৎ উদ্দেশ্যেরই এক শিরোনাম হলো যম চরিত্র।

লোকজ্ঞানে যার ভাবমূর্তি অতীব ভয়ানক, তিনি কিনা সৎচিত্তবৃত্তির অনুসরণযোগ্য আদর্শ। দেবলোকের অনুশাসনকর্মে এক বড় বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাঁর হাতে। জীবলোক-প্রেরিত সৎ ও দুষ্ট আত্মার পরিসংখ্যান রক্ষা [Record keeping] তাঁর প্রথম কাজ। এদের যোগ্য অভিবাসনের দায়িত্বও তাঁর। সৎ আত্মার মর্যাদাপূর্ণ সংরক্ষণ যমদেবতার লক্ষ্য। পালন ও পোষণের সঙ্গে রাজোচিত দমন এবং শাসনকার্যের দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত। এই কার্যে তাঁর পরিপক্বতা অসাধারণ। প্রথমেই দুষ্ট আত্মাগুলিকে পৃথক করে 'নরক' আবাসস্থলে পাঠিয়ে নির্ধারিত শাস্তি বিধানের সাহায্যে তাদের দুষ্ট স্বভাবের দমন ও নিরাকরণ করেন তিনি।

এটিকে পরিশোধন ক্রিয়া হিসাবে ধরে মেয়াদ শেষে নিরাকৃত স্বভাব আত্মাগুলিকে বেছে নিয়ে স্বর্গধামে পাঠানো হয়। এই কর্মক্রিয়ার জন্যই যমদেবতাকে যমরাজ সম্ভাষণ করা হয়।

সর্বজ্ঞ পরিণামদর্শী যমের হাতে আর এক শক্তিশালী ছাড়পত্র তুলে দিয়েছেন দেবতারা। আর এ-জন্যই যমের অভ্রান্ত নিয়মনিষ্ঠ ও চরিত্রবান হওয়া সবাগ্রে প্রয়োজন। জীবচক্রের আয় নিয়ন্ত্রণ যমের হাতে। মৃত্যু নামক অমোঘ অনুশাসনের অধিকারে তিনি জীবদেহ থেকে আত্মা সংগ্রহ করেন। কিন্তু কাজটি যথেচ্ছমূলক নয়। তাঁর শাসননীতির কোন এক গুহ্য ফর্মুলায় এ কাজটি সাধিত হয়। যমসহ সকল দেবতাই জানেন, মৃত্যু নামক এই অপরিজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণ- বহির্ভূত ব্যাপারটি না থাকলে দেবলোক অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তো। তাই এই কাজটি সুচারু নিষ্ঠায় নিষ্পন্ন করেন যম। আজকের পরিবেশবিদ্যায় বহুকথিত ভারসাম্যই এই কর্মপদ্ধতির মূল চাবিকাঠি। দেবতার উদ্ভাবনার সঙ্গে জীবলোকবাসীর সংখ্যার নিশ্চিত কোন একটা অনুপাত আছে। জন্ম ও মৃত্যুর প্রাকৃতিক ভারসাম্য তাই সর্বথা রক্ষণীয় এক নীতি। ভারতীয় দেবকল্পনায় যমকে এই সর্বপ্রধান দ্বারপথটিতে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদায় স্থাপন করা হয়েছে। এই কাজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অবস্থান দুটোই তাঁর দখলে। সর্বোচ্চ মানে তিনি মৃত্যুর অধিদেবতা, আবার ক্রিয়া- সম্পাদনের সর্ব নিম্নস্তরে তিনিই হলেন অতন্দ্র প্রহরী। বলা যায় এক অর্থে তিনি দেবলোকের অন্যান্য দেবতাদের শান্তিপূর্ণ নিশ্চিত বসবাসের guaranter। কল্পিত নিয়মানুসারে জীবলোক- প্রেরিত আত্মার প্রথম মহড়া নেয় প্রবেশপথে মোতায়েন যম-প্রহরীরা। প্রক্রিয়া-মতে ঐ-আত্মার শ্রেণী নির্ধারণ হওয়ার পর দেবলোকের বিভাজিত দুই পথের [স্বর্গ ও নরক] যে কোন একটিতে প্রেরিত হয় ঐ আত্মা। নরকে গেলে দণ্ডদাতার কবলে পড়তে হয়, আর স্বর্গবাসে পরিশীলিত সংযত নিয়মানুবর্তিতার অধীন হতে হয়। এখানকার পাশপোর্ট পেলে তবে দেবসান্নিধ্য এবং দেবসেবার সুযোগ আসে। শাসন পালন ও ব্যবস্থাপনার নিখুঁত মানদণ্ডে দেবরাজ ইন্দ্রের তুলনায় যমের সততা ও পারদর্শিতা অনেক উচ্চাঙ্গের। এই স্বীকৃতিস্বরূপই কি তিনি যমরাজ? তাহলে কি ধরতে হবে দেবলোক দ্বৈতশাসনের [Diarchy] অধীন! অথবা ইন্দ্রই রূপান্তরে যমরাজ। বেদ- উপনিষদ-পুরাণে কিন্তু যমকে অগ্নির সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হলেও, কখনো ইন্দ্রের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত অবস্থায় দেখা হয়নি। আরও মনে হয় এক আধারে এত কিছুর সন্নিবেশ সম্ভব নয় বলেই যম আগাগোড়া এক প্রতীকী দেবতা। প্রতীক যখন আদর্শের মডেল, তখন তার মধ্যে সর্বগুণবত্তা এবং সর্বদর্শী ক্রিয়ার একত্র সহাবস্থান অনায়াসেই সম্ভব

সূর্যপুত্র যমের চারিত্রিক ভাস্বরতা পুরাণ-স্বীকৃত। অন্যান্য দেবতাকে বৈদিক বা পৌরাণিক অস্তিত্ব থেকে সরিয়ে এনে লোকধারায় চরিত্র স্খলনের দায়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু চারিত্রনীতিতে কেবল যমকেই ধর্মরাজ বলে মান্য করা হয়েছে এবং হয়তো সেই হেতুই কোন ধারাতেই তাঁর চারিত্রিক অবনমনের উল্লেখমাত্র নেই। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১০ সূক্তে বর্ণিত যম-যমীর কথোপকথনের কথা উল্লেখ করি। যমের সহোদরা যমী যমের কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করছেন।[২] অনিচ্ছুক যমকে রাজি করানোর জন্য যমী অনেক যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন, এমনকি স্বেচ্ছা- উপগতা নারীকে প্রত্যাখ্যানের জন্য না-পুরুষতার দায়েও ফেলেছেন যমকে। কিন্তু অনড় যমের একটি মাত্র উত্তর। তিনি স্বয়ং দিক্‌পাল [দক্ষিণদিকের দিক্‌পাল তিনি], জাগ্রত প্রকৃতি, জীব- চরাচর এবং দিক্‌পুরুষদের সামনে অনাচারের দৃষ্টান্ত রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, যমী তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সঙ্গে উপগতা হোন। হিরণ্য-আত্মার অধিপতির একেবারে যোগ্য কথা। প্রতীকের

তো নিজস্ব কোন স্বভাব নেই, তাই সর্বাবস্থায় অমলিন থাকা তাঁরই পক্ষে বোধ হয় সম্ভব।

যম যে চরিত্রসত্ত্বের প্রতীকী দেবতা, আর এক পৌরাণিক দৃষ্টান্তে তার সমর্থন মেলে। তথ্যসূত্রটি এই রকম :

> 'দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশটি কন্যাকে যম বিবাহ করেন। যমের ঔরসে এঁদের গর্ভে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে গর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয় এবং মূর্তির গর্ভে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।' [সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত 'পৌরাণিক অভিধান' (১৩৭০) : পৃষ্ঠা ৪৪৭]--এর সঙ্গে কুন্তীর গর্ভের ১টি সন্তান যোগ হবে [তদেব]

স্ত্রী-পুত্রদের নামগুলি মানবীয় চিত্তবৃত্তির নামানুসারেই পরিকল্পিত। গুণসত্ত্ব প্রতীক ছাড়া আর কি বলা যায় একে।

যম মরলোকের সঙ্গে দেবলোকের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র। মর্ত্যলোক বা পৃথিবীর সঙ্গে দেবতাদের নিত্য যোগাযোগের কথা পুরাণে নানাভাবে কল্পিত হয়েছে। শুধু যে যমদূতেরাই আত্মাসংগ্রহের জন্য প্রতিনিয়ত পৃথিবী ভ্রমণ করছে এমন নয়। অভিশপ্ত দেবরাজ্যের বাসিন্দারা মানবজন্ম পরিগ্রহের জন্য মর্ত্যলোককেই পছন্দ করেন, অন্যান্য সময়ে এই মর্ত্যধামই দেবতাদের সৌখিন ভ্রমণ ক্ষেত্র, পৃথিবীর নারীদের প্রতি অনুরাগ বা প্রলোভন বশতও এঁদের মর্ত্যাবতরণ। বিপরীত দিক থেকে, মর্ত্যধামের মানুষেরও সখ্যসূত্রে বা কলাবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্যে নরদেহ সমেত স্বর্গভ্রমণের কথা রয়েছে পুরাণে। দেবতারা যেমন মর্ত্যের মানুষের স্বীকৃতি ও ভক্তি-অনুরাগের উপর নির্ভরশীল, তেমনি মননশীল মানুষ অধ্যাত্ম রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য এবং প্রাকৃত লোকজন বরাভয় প্রার্থনার জন্য দেবরাজ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী। যমরাজের ক্ষেত্রে এই সংযোগ কিন্তু এক নিয়মিত শৃঙ্খলারই বিষয়।

লোকজ্ঞানে যমরাজ প্রতিভাত হন দু ভাবে। মৃত্যুভয়তাড়িত মানুষের কাছে মৃত্যুরূপী যমের আকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। যদিও পুরাণ বর্ণনানুসারে তার বর্ণ ঘোর সবুজ। অবশ্য ভীতিপ্রদ মানুষের চোখে গাঢ় সবুজও কালো ঠেকতে পারে এ-বর্ণবিভ্রম একেবারেই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ কোন প্রসন্ন নমনীয়তার মধ্যে কখনই যমকে দেখতে চাননি। করাল কৃতান্ত হিসাবেই তিনি সাধারণ্যে গৃহীত। কিন্তু দার্শনিক জিজ্ঞাসুরা যমের বহিরাকৃতির পিছনে আর একটি রহস্যাবৃত স্বরূপের সন্ধান পান শান্তিদায়ী শমনের লুক্কায়িত আসল মূর্তিটির মধ্যে প্রশান্তির অস্তিত্ব সন্ধানের জন্য মননশীল মানুষ ব্যাকুল এই ব্যাকুলতার একটি প্রতীকী কাহিনীও রচনা করেছেন পুরাণকারেরা। উচ্চ দার্শনিকতায় সে কাহিনী সমৃদ্ধ। পৃথিবী-পুত্র নচিকেতা মৃত্যুর পটোত্তোলন এবং সূক্ষ্মশরীরী আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়ার জন্য যমরাজ্যে সশরীরে গমন করেছিলেন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের একসপ্ততিতম অধ্যায়ে যম-নচিকেতার সাক্ষাৎকার বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ .

> ''ভীষ্ম কহিলেন, ... পূর্বে মহর্ষি উদ্দালকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে আপনার পুত্র নাচিকেতের নিকট আগমনপূর্বক

কহিলেন, 'বৎস! আমি স্নান ও নিবিষ্ট চিত্তে বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজন দ্রব্য সমুদয় বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি ; অতএব তুমি সত্বর তথায় গমন করিয়া তৎসমুদয় আনয়ন কর।' নাচিকেত পিতার আদেশ পাইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, নদীস্রোত তৎসমুদয় প্রবাহিত করিয়াছে। তখন নাচিকেত পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'পিতঃ আপনি আমাকে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থে আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না।'...... .....তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উদ্দালকি এইরূপ বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে 'আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' এই কথা বলিতে বলিতেই গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।'' [কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত অনুবাদ।]

নচিকেতা এই অবস্থায় রইলেন একদিন একরাত্রি পর্যন্ত। পরদিন প্রভাতে তিনি পুনর্জীবিত হয়ে ওঠেন। জাগরণের পর পিতাপুত্রের বাক্যালাপ থেকে জানা যায়, যমলোকে স্বয়ং যম সমাদরের সঙ্গে নচিকেতাকে গ্রহণ করেন এবং মর্ত্যলোকে তাঁকে পুনরায় ফেরৎ পাঠান। যমলোকগামী মানুষের সঙ্গে আত্মীয়দের মিলনে যাতে বাধা না জন্মায় এবং উদ্দালকের পূর্ব ক্রোধ যাতে প্রশমিত হয় এ-জন্য যম প্রয়োজনীয় বরদান করেছিলেন নচিকেতাকে।

কঠোপনিষৎ এই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর অংশ জুড়ে ঘটনাটিকে দার্শনিক[৩] করে তুলেছে। কাহিনী অংশেরও কিছু রূপান্তর রয়েছে সেখানে। যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদে দুই অধ্যায়ে মোট ছয় বল্লীতে এই বর্ণনা ব্যাপ্ত রয়েছে। এটিই ঐ উপনিষদের সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ। বর্ণনাভাগ এইরকম :

> ''বাজশ্রবার পুত্র বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া উহার ফল [স্বর্গ] কামনায় সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে একটি পুত্র ছিল। [বিভিন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকট] যখন দক্ষিণা সমূহ আনয়ন করা হইতেছিল তখন সেই অল্প বয়স্ক বালক নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। ....তিনি পিতাকে বলিলেন, 'বাবা আমাকে কাহার নিকট অর্পণ করিবেন? দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও তিনি এই প্রশ্ন করিলেন। তখন পিতা বলিলেন, 'তোমাকে যমকে অর্পণ করিব।'

যমলোকে নচিকেতা তিনদিন অনাহারে থেকে যমের জন্য প্রতীক্ষা করেন। যম প্রবাস থেকে ফিরে নচিকেতাকে যৎপরোনাস্তি আপ্যায়ন করেন এবং বলেন :

> 'হে ব্রাহ্মণ, তুমি অতিথি এবং আমার নমস্য; অথচ তিনরাত্রি আমার গৃহে অনাহারে বাস করিয়াছ। তজ্জন্য তোমায় নমস্কার করিতেছি ; আমার মঙ্গল হউক ; আর প্রতি রাত্রির জন্য একটি করিয়া তিনটি বর প্রার্থনা কর।'
>
> ['কঠোপনিষদ' : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ অনূদিত : উদ্বোধন প্রকাশিত।]

প্রতিশ্রুত তিনটি বর ছাড়াও নচিকেতা একটি অতিরিক্ত চতুর্থ বর প্রাপ্ত হন। প্রথম বরে পিতার উদ্বেগহীনতা, দ্বিতীয়ে অগ্নিবিদ্যার অধিকার প্রাপ্ত হন। চতুর্থ বরে 'অগ্নি তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হইবে' এই নির্দেশ পান। তৃতীয় বরটিই এক্ষেত্রে সর্বপ্রধান। মৃত্যু-পরবর্তী

পরলোকগামী আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের প্রার্থনা করেন নচিকেতা। যম সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব জানার বদলে নচিকেতাকে ভোগ্য পার্থিব জীবনের উপযোগী নানান দ্রব্য গ্রহণে ক্ষান্ত হতে বলেন। নচিকেতা রাজি না হওয়ায় যম ঐ স্বরূপ ব্যাখ্যায় বাধ্য হন। ধারাবাহিক পাঁচটি বল্লী ধরে এই দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছে কঠোপনিষৎ।

যম-নচিকেতা কাহিনীও প্রমাণ দিচ্ছে যম তত্ত্বজ্ঞ এবং লোকজ্ঞানানুযায়ী ভয়ঙ্করত্বের বদলে বরদপ্রসন্ন ও প্রশান্তচিত্তের দেবতা। উপনিষদকারেরা তাঁর অহংমদমত্ত চরিত্রের কথা আদৌ ভাবেন নি। নচিকেতার উদ্‌গত প্রশ্ন এবং যমের নিরসনচেষ্টার প্রতীকে মরলোক ও অমৃতলোকের মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধ কল্পনার বিষয়টিও সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই দেবতার প্রতি মর্ত্যবাসীর লৌকিক বিরূপতা যে অকারণ সংস্কারমাত্র তা বুঝতেও বিলম্ব হয় না। বরং বৈপরীত্যে অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যমচরিত্র।

১. এই প্রতীক ব্যাখ্যার জন্য এই সংকলনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২. সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
৩. কবি মোহিতলাল মজুমদার রচিত 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতা [আশ্বিন ১৩৩২ 'বিস্মরণী'] পঠনীয়।

❐

যমপুকুর ব্রত

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত

'আশ্বিন মাস যায় কার্ত্তিক মাস পড়ে, যমপুকুর ব্রত তখন ধরে ;
সারা কার্ত্তিক ব্রত করে।।'

আশ্বিন মাস গিয়ে কার্ত্তিক মাস আসবে,—সেই আশ্বিনের সংক্রান্তি দিন সকালবেলা, যমপুকুর ব্রত আরম্ভ করিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন পর্য্যন্ত রোজ সকালে ব্রত করিবে। এ ব্রত করিলে দেশে মড়ক হয় না। ব্রত চার বচ্ছর।

'নিয়ম-সিয়ম'

আজ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। সকাল বেলা। উঠান আগের দিন পরিষ্কার করে লেপা আছে। লক্ষ্মীরা সব! এস।

আচ্ছা; প্রথমে, উঠানে **পূবমুখো হয়ে বসে'** চার কোণা এক **পুকুর কাট**[১]। **পুকুরের** একটা 'যান্' [খাল] রাখিবে।—এই—এই রকম,—
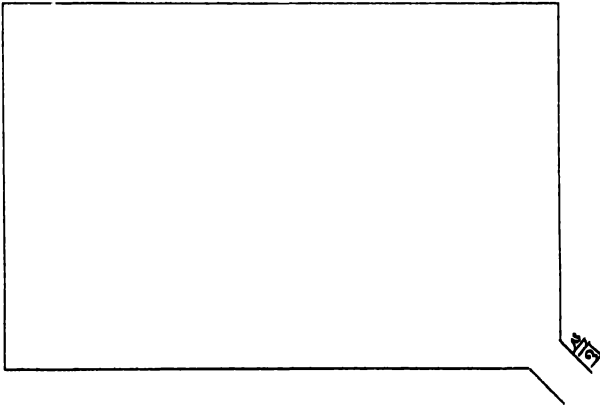
১. সব ব্রতীর মধ্যে এক পুকুর হইলেই চলে।

আচ্ছা ;—এখন, যা যা সব একত্র করে' রেখেছ, ত'র মধ্যে, প্রথম—

লাগবে—ধানগাছ, মানগাছ, কলাগাছ, কচুগাছ, কল্মী শাক, শুষ্ণী শাক, হলুদগাছ, তুলসীগাছ[২]।

সকল গাছ এক গোছায় বাঁধিয়া পুকুরের পূব পাড়ে পোঁত।

যমপুকুরের ব্রতের যোগাড়-যাগাড়

২. কোন কোন জায়গায়, কেবল—ধানগাছ, মানগাছ, কলাগাছ, কচুগাছ আর হলুদগাছ দেয়।

তারপর **চারিটা কড়ি, চারিটা সুপারী, চারিখানা হলুদ** চারি কোণে রাখ।

রেখেছ?—

আচ্ছা, পুকুর যে কেটেছ, তারি খানিকটা মাটি ছেনে', সেই ছানা মাটি নাও।

মাটি দিয়া একটা হাঙ্গর, একটা কুমীর, একটা **কুঁচে** আর একটা **কচ্ছপ** বানাও। **ষোলটা পুতুল** বানাও। **কাক, বক,** আর **চিলে ঢিলে** এই সব বানাও।

হইল? আচ্ছা, হাঙ্গর, কুমীর, কুঁচে, কচ্ছপ পুকুরের পাড়ে-পাড়ে দাও। কুচে, কচ্ছপ খালের কাছে দিও। চারিটা চারিটা করিয়া, পুতুল ষোলটা, পুকুরের চার পাড়ে বসাইয়া দাও।

তারপর, **যমের মা**[৩] গড়িয়া ধান মান কচুগাছের গোছার তলে বসাও।

আর, পুকুরের **মধ্যে কাটী পুঁতিয়া,** কাক বক চিলে-ঢিলে সেই কাটীর আগায় বিধাইয়া বসাও।[৪]

বেশ্। এখন, ঐ যে **প্রদীপ** আছে, প্রদীপটা জ্বালিয়া পুকুরের এক কোণে রাখ।[৫]

সব যোগাড়-যাগাড় হইল ;

* এখন **ব্রত**।

[যমপুকুরের ব্রতের যোগাড়-যাগাড়][৬]

লক্ষ্মীরা! খাটে[৭] বসে ফুল নাও, ফুল নিয়া মন্ত্র বল

মন্ত্র :

ধান মান কলা কচু তুলসী হলুদায় নমঃ ।।

ফুল পুকুরে দাও। এই রকম তিনবার দাও।

তারপর আবার ফুল নিয়া বল :

৩ যমের মা'র কোলে একটি ছেলে তৈয়ার করিয়া দিতে হয়, সেইটি যমরাজ। ছেলে যমের মা'র কোলে লাগানো থাকে বলিয়া, শুধু 'যমের মা' তৈয়ার কর বলিলেই যমরাজ শুদ্ধ তৈয়ার করা বুঝায়।

৪. কোন কোন জায়গায় শুধু কেবল— 'যমের মা', কাক, চিল, আর কচ্ছপ তৈয়ার করিয়া বসায়।

৫ কোন কোন জায়গায় প্রদীপ দেয় না।

* কোন কোন জায়গায় নিয়ম, --যমপুকুরের পুকুরটি সবদিকে একহাত মাপে কাটতে হবে। পুকুরের চারি কোণে চারটি মাটির ঢিপ বেঁধে' তারি সব ঢিপে কলাগাছ, কচুগাছ [কোন কোন জায়গায় ওলগাছও] পুঁতে দিতে হবে। পুকুরের ভিতর একখানি বাটা বা বাটি থাকবে, তাতে পাঁচকলাই [মুগ, মটর, মাষ বুট আর বড় বুট] রাখতে হবে, আর কিছু পাঁচকলাই চার ঢিপির এদিকে ওদিকে ছিটাইয়া দিতে হবে। পুকুরের মধ্যে একটা ছোট গর্ত্ত করিয়া, তাতে ধানগাছ লাগাতে হবে। আর, হলুদ একখানা, সুপারী ১টি, ছোট মাছ ১টি, আর, হেলেঞ্চা, কলমী, শুষুণী, কৈচুনী এই সব শাক লতা পুকুরে দিতে হবে। পুকুরের চারধারে চারটি ঘাট থাকিবে, ব্রতীরা খুব ভোরে উঠে' কোন এক পুকুর থেকে জল এনে আগে এই চার ঘাট নিকাবেন। তারপরে, শেফালিকা ফুলের মালা [কোথাও কোথাও শুধু শেফালিকা ফুল] দিয়ে বেশ্ করে' পুকুরটি সাজিয়ে, তখন ব্রতে বসতে হবে।

৬. সকল ব্রতীর মধ্যে এক 'যোগাড়-যাগাড়' হইলেই চলবে।

৭ প্রত্যেক ব্রতীর 'খাট' বা আসন আলাদা আলাদা লাগবে।

শুষ্‌ণী কল্‌মী লহ্ লহ্ করে[৮], রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষ শুকন্ বিল,[৯] সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল খসা'তে হাতের গেল ছড়, আমার মা বাপ লক্ষেশ্বর।[১০]
লক্ষ্মী-নারায়ণ দিয়ে যান বর,—ধনে পুতে বাড়ুক ঘর।[১১]

পুকুরে ফুল দাও।[১২] এও তেন্নি তিনবার।
তিনবার ফুল দিলে?—তো এখন, বল, :

যমগোদার মা সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি।
যমরাজ সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি।
ধোপা ধোপানি সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি।[ক]
মেছো মেছুনি সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি![ক]
ঘৃতের প্রদীপ সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি।[খ]
হাঙ্গর কুমীর সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি।[খ]
চিলে-টিলে সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি।[খ]
কাগা বগা সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি।[খ]
কুঁচে কচ্ছপ সাক্ষী থেকো—যমপুকুরটি করি।[খ]

বলা হ'লে এক ঘটি জল নিয়ে, পুকুরে জল ঢালতে ঢালতে বলবে, :

এ ঘটিটি কা'র?—বাপ মা'র।
এ ঘটিটি কা'র?—শ্বশুর শাশুড়ীর।[১৩]
এ ঘটিটি কা'র?—পাড়া প্রতিবাসীর।
এ ঘটিটি কা'র?—স্বামীর আর আমার।[১৩]

এ পুকুরটি কি?
ভাগ্যবতী পূজেছে পুকুর, জল ঘটিটি দি!

এই সময় সবটুকু জল পুকুরে ঢালিয়া দাও। তারপরে প্রণাম কব :

৮. যারা হেলেঞ্চা কৈচুনী প্রভৃতি দেয়, তারা এই সময় সে সকলেরও নাম করে।
৯. কোন কোন জায়গায় বলে—"মারুক পক্ষী শুকক্ বিল।"
১০. কোন কোন জায়গায় বলে—"আমার স্বামী যেন হয় **লক্ষেশ্বর**।"
আবার—ব্রতী সধবা [এই ব্রত নিয়ে, চার বচ্ছরে ব্রত প্রতিষ্ঠা হবার আগেই যে কুমারীর বিয়ে হয়ে যাবে, তিনি, বিয়ের পরের ব্রতে এবং (সধবাও এ ব্রত নিতে পারেন,—২নং 'কথা' দেখ) সধবাব্রতী] বলেন,—**"আমার স্বামী যেন হ'ন লক্ষেশ্বর।"**
১১. যারা শুষ্‌ণী কল্‌মী দেয় না, তারা এই মন্ত্রটি বলে না।
১২. কোন কোন জায়গায় এই মন্ত্র বলে' পুকুরে জল দেয়
ক. যারা পুতুল দেয় না, তারা এ দু'টি কথা বলে না।
খ. এর মধ্যে যারা যেটি দেয় না, তারা সেটি বলে না।
১৩. কেবল সধবায় বলবেন। কোন কোন জায়গায় কুমারী সধবা সকল ব্রতীই এই মন্ত্র বলেন।

প্রণামের মন্ত্র :—

সূয্যি গেলেন মায়ের কোলে, ব্রহ্মা গেলেন ভেসে ;
আমার ঠাকুর জপ কর্‌চেন যমপুকুরে বসে'।
যমরাজের মা গো! তোমায় এই মিনতি করি—
তোমার ছেলে হয় না যেন আমার বাপ মায়ের অরি!
তোমার ছেলে হয় না যেন আমার ভাইবোনের অরি।।
যমরাজ ধর্ম্মরাজ এই বর চাই,—
তোমার তাড়না হ'তে যেন মুক্তি পাই।।

হইল?

তারপর, এখন,—

'কথা'।*

যমপুকুর ব্রতের 'কথা' : ১নং **

এক যে সওদাগর, আর তার মা। সওদাগরের মা সওদাগরকে বিয়ে করিয়ে ঘরে বৌ আনিল; সেই বৌ যে, যমপুকুর-ব্রত করিত। করিত,—সওদাগরের ধন-জন দায়-দৌলত তা'তে উপচে' উঠতে লাগ্‌ল।

লাগ্‌ল,—যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ল, জন-মনুষ্য কেউ আর অকালে মরে না; সওদাগরের ঘর সংসার ভরা।

আছে;— সওদাগরের মায়ের ঘটে কি বুদ্ধি হইল, সওদাগর-বৌ কি-না একদিন চুপি চুপি ব্রত করে?-চুপি চুপি কর্‌বে না? আর তো কেউ এই ব্রত জান্‌ত না,—কেউ যদি কিছু বলে!— তা' ব্রত করে,—সওদাগরের মা তা'ই দেখতে পেল। দেখ্‌তে পেয়ে সওদাগরের মা ভাবিল কি,—বৌ বুঝি ছেলেকে 'যো' [জ্ঞান] করে। ভাবিয়া সওদাগরের মা বলে,—"ও বৌ! 'জ্ঞানকুমারীর জ্ঞানকুমারী'।—কি লো করিস্? কি লো 'উট্‌পুটাস', কি লো 'পুট্‌পুটাস্'? আমাকে খাবি, না, আমার পুত্‌কে খাবি! যে, নিত্যি সকাল না ই হইতে উঠানে গর্ত্ত খুঁড়িস্, বিড়বিড় করে' মন্ত্র পড়িস? তোর ভাব যে, আমি বুঝি না।" এই কথা বলিয়া, বুড়ী— সওদাগরের মা, ধেয়ে আসে ধেয়ে যায়, পায়ের হোঁচট্ দিয়া ব্রতের সব ফেলিয়া দিল। ফেলিয়া দিল,—উকুর পুকুর বুজাইয়া দিল ; সওদাগরণীর ব্রত নষ্ট হইল।

এম্নি, যে বচ্ছরই সওদাগরণী ব্রত করে, ব্রতের যোগাড় করে, সওদাগরের মা আসিয়া ভেঙ্গে' ভেঙ্গে' ফেলে! সওদাগরণীর ব্রত হয় না।

না হইতেই, আজ সওদাগরের গাই মরে, ক'ল সওদাগরের বাছুর মরে, আজ সওদাগরের মাল্লা মরে, কা'ল সওদাগরের মাঝি মরে। সওদাগর বলেন,—"একি! যত সব কুলক্ষণ।"

হইতে হইতে, ইহার মধ্যে সওদাগরের মা যে, মরিয়া গেল। মরিয়া গেল; সওদাগর খুব

* 'কথা' কোন কোন স্থানে বলে, কোন কোন স্থানে বলে না। কিন্তু বাঙ্গালার দুই অঞ্চলেই যমপুকুরের 'কথা' আছে। যেখানে যেখানে 'কথা' বলে সেখানে সেখানেও নানান্ রকম। তার মধ্যে দুই রকমই প্রধান।

** দুই রকমই দিলাম। ১ নং কথাটি পূব-অঞ্চলেই বেশি বলে।

দান-ধ্যান 'ব্যয়-বহ্বাড়ম্ব' করে' মায়ের শ্রাদ্ধ কর্‌লেন। কর্‌লে কি? মরিয়া গিয়া সওদাগরের মা 'আতালে' ঠাঁই পায় না, পাতালে ঠাঁই পায় না, স্বর্গে ঠাঁই পায় না, মর্ত্ত্যে ঠাঁই পায় না,—জলের 'তিয়াসে' সওদাগরের মা তিন পৃত্থিমী ঘুরে বলে।' না, সওদাগরের মা কোত্থাও এক ফোঁটা জল পাইল না।

যমপুকুর ব্রত ভেঙ্গেছে, জল কেন খেতে' পা'বে?

শেষে,—না, দিনও যায় রাতও যায়, রাত প্রভাত-প্রভাত সময়, সওদাগরের মা সওদাগরকে 'স্বপ্ন দিল'। স্বপ্নে সওদাগরের মা বলে,—

"বাপ আমার সওদাগর!—

যমপুকুর ব্রত ভাঙ্গিলাম, জল পাই না ঠাঁই পাই না, বৌকে দিয়ে যে, যমপুকুর ব্রত কর্‌।
যমপুকুর ব্রত না কর্‌লে, আমার 'এত শ্রাদ্ধ এত ব্যয়' কিছুতেই কিচ্ছু হ'বে না।"

স্বপ্ন দেখিয়া সওদাগর উঠ্‌লেন। স্ত্রীকে ডাক্‌লেন,—"হ্যাঁ সওদাগরণী! কথা কি সত্যি?

সওদাগরণী কি করেন, বলিলেন,—"হাঁ, যতবার ব্রতের যোগাড়-যাগাড় করিলাম, ঠাকুরাণী এসে' যে ভেঙ্গে' ভেঙ্গে' দিলেন। কিসে কি হইয়াছে, তা'তো জানি না ; তো এখন, সোণার যমের মা, চিল, কাক, তৈয়ার করাইয়া দাও, ব্রত করিযা দেখি।"

সেই দিন আশ্বিন মাস, সংক্রান্তি। যমপুকুর ব্রতের দিন। সওদাগর তাড়াতাড়ি করিয়া—রোদ উঠ্‌তে না উঠ্‌তে সাতে পাঁচে সেঁক্‌রা আন্‌লেন, দশে বিশে কারিকর আন্‌লেন, যমের মা, কাক, চিল, যত সকল গড়ি'য়ে দিলেন। সওদাগরণী সেই সকল দিয়া ব্রত কর্‌লেন।

সওদাগরণী ব্রত কর্‌লেন, সওদাগরণীর হাতের ঘটির জল ধা—রে পড়িল, যমপুকুর ছাপিয়া উঠিল,—সওদাগরের মা 'বুক ভরিয়া আত্মা ভরিয়া' সেই জল খাইয়া 'তৃপ্ত' হইয়া স্বর্গে গেলেন। ***

*** কোন কোন জায়গায় এই ব্রতের নাম – 'যমের মা বুড়ীর ব্রত।' কোথাও বা,—'কাক চিলের ব্রত'। 'কথা'টিও একটু আলাদা রকম।

এই রকম :

যমরাজার মা-ই তাঁ'র বৌকে যন্ত্রণা দিতেন। বৌ কাকচিলের ব্রত করিত। বৌ যেখানেই ব্রত পাতিতেন, শাশুড়ী সেইখানে গিয়াই 'ঠোক্‌রাইতেন'। ধানগাছতলা, মানগাছতলা, কচুগাছতলা, হলুদগাছতলা, কলাগাছতল', তুলসীগাছতলা, সব খান থেকে বৌকে শাশুড়ী ব্রত ভেঙ্গে' উঠিয়ে দিলেন। বৌয়ের ব্রত আর হ'ল না। তা'র পরে যমের মা মরে' গেলেন। মরে' গিয়ে চিল হ'য়ে রইলেন; আর, জল পান না, ঠাঁই পান না। তখন 'বৌর স্বামী বৌকে' বল্‌লেন,—"আমার মা চিল হ'য়ে আছেন কেন? জল পান না কেন? ঠাঁই পান না কেন?" বৌ বল্‌লেন,—

"তোমার মায়ের ঠোকর খাই, ছাঁচতলায় না পেলাম ঠাঁই।
তোমার মায়ের ঠোকর খাই—ধানতলায় না পেলাম ঠাঁই।

এই রকম—তুলসীতলা, হলুদতলা ইত্যাদি।

ব্রত হ'ল না, তাই অমন হ'ল।"

তখন স্বামী বল্‌লেন,—"যা'ই হোক, এখন ব্রত কর, আমার মা ঠাঁই জল পা'ক।"

বৌ বল্‌লেন,—"দুধের পুকুর কাটিয়ে দাও। সোণার সব সামগ্রী গড়ি'য়ে দাও, তবে ব্রত কর্‌তে পারি।" তা'রপর ব্রত হইল।

এই ব্রত কর্‌লে কি হয়?

ব্রতীর সংসারে যমরাজ তৃণ কুটাও' ছোঁ'ন না ; শ্বশুর শাশুড়ী 'মৃত্যুর' পর স্বর্গে গিয়া জল পায়। ****

যমপুকুর ব্রতের কথা : ২নং *****

আশ্বিন যেয়ে কার্ত্তিক আস্‌ছে, ডাক-সংক্রান্তি বাইরে বসেছে, যত লোক যমপুকুর কর্‌ছে।

উদ্ধবের মা কৃপণী গাঁয়ের 'ওরে' ঘরখানি, বেটাটি, বৌটি, আপনি, থাকেন। থাক্‌তে থাক্‌তে শাশুড়ী বললেন যে, গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে ধানসেদ্দোর হাঁড়ি আন গে।

বৌ হাঁড়ী আন্‌তে গেল। যেয়ে দেখেন তো যত লোক যমপুকুর কর্‌ছে। তখন জিজ্ঞাসা করিল যে, এ কি? তাঁ'রা বল্‌লেন যে, যমপুকুর। বৌ শুধালে যে, এ কর্‌লে কি হয়? ''এ করলে শ্বশুর শাশুড়ী জল পায়, হাতে হাতে স্বর্গে যায়।''

তো উনি সেখানে যমপুকুর কর্‌লেন। করে', বাড়ী এলেন।

শাশুড়ী বললেন,—''বিলম্ কেন হ'ল?'' উনি বল্‌লেন, -''গৃহস্থেরা ধান সিদ্ধ করে' হাঁড়ি দিলেন।''

শাশুড়ী বল্‌লেন,—''ধান সিদ্ধ করে' আমি হাঁড়ি দিতে যাব।''

হাঁড়ি দিতে গেলেন। গিয়ে বল্‌লেন,—''এ কি?''

তাঁ'রা বলেন,—''এ যমপুকুর।''

''এ কর্‌লে কি হয়?''

''শ্বশুর শাশুড়ী জল পায়। হাতে হাতে স্বর্গে যায়।।''

''এ কা'র?'' ''এ মায়ের।''

''এ কা'র?'' ''এ মাসীর।''

এইরকম, দিদির, খুড়ীর ইত্যাদির।

''এ কা'র?'' ''এ তোমাদের বৌয়ের।''

হপ্ করে পড়লেন—''বাপ্!'' করে' উঠলেন, ''আ —মর! 'হায়-খাগী ভাই খাগী' এক উদ্ধবের ধন খেতে আর বিলা'তে মন,—এখানে পুকুর কর্‌তে এসেছে!''

বৌ সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দেখা'তে যায়, তো, পুকুর নাই এই, —কাঁদ্‌লেন, কাট্‌লেন।

লোকে বলে, ''কেঁদে কি কর্‌বি? আর বছর ভাইকে বলে' পাঠা'স্, ভেয়ের বাড়ীযেয়ে ব্রত কর্‌বি গে।''

এই বছর গেল, ফের বছর এল। আশ্বিন যেয়ে কার্ত্তিক আস্‌ছে। যত লোক পুকুর ক'র্‌ছে।

শাশুড়ী বল্‌লেন,—'বৌ, বাঁশের পাতা কুড়িয়ে আন গে।''

উনি আপ্‌নার বাঁশের পাতা কুড়ুতে যেয়ে একটা গর্ত খুঁড়লেন, ফুল জল দিয়ে পুজো কর্‌লেন, রাখালকে বলে' এলেন যে প্রতিষ্ঠার সময় ছাতা জুতা কাপড় দেবো।

বৌ বাঁশের পাতা নিয়ে এলেন।

**** শ্বশুর-শাশুড়ীর মঙ্গলে কাজেই সধবারা এই ব্রত নিতে পারেন,

***** ২নং 'কথাটি' পশ্চিম অঞ্চলেই বেশি বলে।

শাশুড়ী বল্‌লেন,—"এত বিলম্ কেন হ'ল?"

বৌ বল্‌লেন,—"বাঁশের পাতা ঝেঁটিয়ে আন্‌লাম।"

তা'র পরদিন শাশুড়ী বল্‌লেন, -"আমি যা'ব।"

শাশুড়ী হপ্ করে' পাতা কড়তে গেলেন, গিয়ে হপ করে' পড়লেন খপ্ করে' উঠলেন,—"হায়-খাগী ভাই-খাগী এক উদ্ধবের বন খেতে আর বিলা'তে মন,—এইখানে পুকুর কাট্‌তে এসেছে।"

বৌ সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ দেখা'তে গেলেন, দেখেন যে, পুকুর নাই। কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

লোকে বলে, "কেঁদে' কেটে' কি করবি, আর বছর ভাইকে বলে' পাঠাস্, ভেয়ের বাড়ীতে যেয়ে ব্রত করিস।"

আশ্বিন গিয়ে কার্ত্তিক আসছে, যত লোক পুকুর কর্‌ছে। উদ্ধবের মা বল্‌লেন যে, —"বৌ। উদ্ধবকে ভাত বেড়ে' দাও গে।"

ভাত বেড়ে' দিয়ে গিয়ে বৌ ভাতের কোলতায় একটি গর্ত্ত করলেন। করে' ফুল জল দিয়ে পূজো করলেন।

করে', এলেন।

তা'র পরদিন শাশুড়ী আবার বল্‌লেন যে,—"বৌ। স্নান করে' এসে' উদ্ধবকে ভাত বেড়ে দাও।"

বৌ স্নান কর্‌তে গেলেন।

শাশুড়ী প্রদীপের তেল কানে দিলেন, ছুঁতো হাঁড়ির জলে স্নান করলেন ; করে', উদ্ধবকে ভাত বেড়ে' দিতে গেলেন।

গিয়ে হপ করে' পড়্‌লেন, "বাপ।" করে' উঠলেন, "আ মর্। হায়-খাগী ভাই-খাগী এক উদ্ধবের ধন খেতে আর বিলা'তে মন,—এইখানে পুকুর কর্‌তে এসেছিস্!" শাশুড়ী হেলেঞ্চা কল্‌মীর শাক খেলেন, সরাখানি বাটিখানি ঢাকন দিয়ে নিলেন, কড়ি পাঁচ কড়া ভাণ্ডারে রাখ্‌লেন, হলুদ পাঁচখানি মাছে খেলেন, গুপারী দিয়ে পান খেলেন ; খেয়ে, এলেন।

ফের বছর বৌ কি করেন, বলে' পাঠা'লেন ; ভাই এসে নিয়ে গেল। ভেয়ের বাড়ীতে যমপুকুর কর্‌ছেন। কর্‌ছেন,—এক পেছে' করে' মাটি উঠ্‌ছে, এক পেছে' করে' কড়ি উঠ্‌ছে, যত দেশের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেছেন—যত দেশের বামুণ এসেছেন।

শাশুড়ী আপন বাড়ী থেকে এসে' মধ্যি পথে দাঁড়িয়ে আছেন। যত বামুণ খেয়ে আস্‌ছে জিজ্ঞাসিছেন যে, হাঁ গো বামুণ সকলরা. তোমরা এত খাওয়া কোথা' খেয়ে এলে?

"আ মর্ বুড়ী! তোর বৌয়ের ব্রত প্রতিষ্ঠা, তুই জানিস্ না!"

শাশুড়ী বল্‌লেন যে, —"ও রে উদ্ধব দৌড়ে' যা! ধুতিখান পা'স্, শাড়িখান পা'স্ তা'ও কাজে লাগ্‌বে।"

উদ্ধব গেলেন।

উদ্ধবকে জুতা, ছাতা, কাপড় দিলেন। এই সব জিনিস নিয়ে, উদ্ধব বাড়ী এলেন।

উদ্ধবের মায়ের, শেষ দশা। উদ্ধবের মাকে লোহার ডাঙ্গসে বেড়েছে, নরককুণ্ডতে ডুবুচ্ছে। উদ্ধবের মা বললেন যে, বৌ নিয়ে এস গে।

বৌকে আন্‌লেন।

বৌয়ের সঙ্গে তিন জন বামুণ এলেন।

তিন জন বামুণ এসেছেন ;—বামুণরা বল্‌লেন যে, উদ্ধবের মা! বস্‌তে দাও।

উদ্ধবের মা ছেঁড়া সপে বস্‌তে দিলেন।

উদ্ধবের বৌ একখানি ভাল সপ দিলেন।

উদ্ধবের মাকে চাইলেন,—"তেল দাও।" উদ্ধবের মা মসিনার তেল মাখ্‌তে দিলেন।

বৌ ভাল তেল দিলেন।

"উদ্ধবের মা! জল খেতে দাও।"

উদ্ধবের মা জল খেতে দিলেন বোবা ভিজে খোসা, করকচে' মুড়ি—।

উদ্ধবের বৌ, ভাল করে' জল খেতে দিলেন।

উদ্ধবের মায়ের খেলেন না, বৌয়ের খেলেন, তা'রপরে বল্‌লেন,—"উদ্ধবের মা! রান্নার জায়গা করে' দাও।"

উদ্ধবের মা,—কেঁচো উঠ্‌ছে, ঘেগরে' উঠ্‌ছে, ভিজে জায়গা, ভিজে কাঠ, ভিজে উনোন দিলেন। মোটা চা'ল কলা'য়ের খোসা বাধ্‌তে দিলেন।

বৌ, ভাল জায়গা, ভাল রাঁধ্‌বার সব দিলেন।

ব্রাহ্মণেরা উদ্ধবের মায়ের খেলেন না ; বৌয়ের খেলেন। খেয়ে, উদ্ধবের মাকে বললেন যে, শোবার জায়গা করে' দাও।

উদ্ধবের মা ছেড়া সপ, ছেঁড়া বালিশ, ভিজে জায়গা দিলেন। উদ্ধবের বৌ, ঔবী চৌরী দক্ষিণ দুয়ারী, ছাপর খাট, ভাল বিছানা, ভাল বালিশ দিলেন।

বামুণেরা উদ্ধবের বৌয়ের দেওয়া ভাল বিছানায় শু'লেন।

বামুণরা সকাল বেলায় উঠে' উদ্ধবের মাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"উদ্ধবের মা! বাড়ী যা'বার পথ দেখিয়ে দাও।

উনি আপনার কাঁটা, খোঁচে', আগুন-পানি পথ দেখিয়ে দিলেন। তা'রপর, উদ্ধবের বৌ ভাল পথ দেখিয়ে দিলেন।

বামুণরা উদ্ধবের বৌয়ের দেখানো পথে গেলেন।

উদ্ধবের মাকে নিতে যমদূত এসেছে। উদ্ধবের মা বল্‌লেন যে,—বৌ! গৃহস্থদের ধার কর্জ্জ দিও না। ভিখারীকে ভিক্ষে দিও না। নিজেও কিছু খেয়ো না। মাথায় তেল দিও না। সন্ধ্যেবেলায় আধখানা কাঁচকলা দিয়ে উদ্ধবকে ভাত বেঁধে দিও। আর, যদি তুমি কিছু কর,—ঝিনুক ফুটানো থাক্‌ল চোক, ঝাঁটা বারুণ থাক্‌ল হা'ত পা, ছুতো হাড়ি থাক্‌ল মাথা, কুলো থাক্‌ল বুক, পাটি থাক্‌ল পিঠ্ এই সকল দিয়ে আমি সব দেখ্‌ব!

উদ্ধবের মা মর্‌লেন। উদ্ধবের মা'র উদ্ধার হয় না। শেষে উদ্ধব বামুণ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বল্‌লেন,—"আমার মায়ের কি করে' উদ্ধার হবে?" বামুণ পণ্ডিত বললেন যে, তোর বৌ তিনটি যমপুকুর করেছে তা' তোর মা ভেঙ্গেছে। যদি তোর বৌ শাশুড়ীর নামে একখানি ঘাট দেয়, তবে তোর মায়ের উদ্ধার হ'বে।

উদ্ধব এলেন, এসে খিল কবাট দিয়ে শু'লেন।

বৌ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, "শু'লেন কেন?" "শু'লেন কেন?" উদ্ধব বল্‌লেন, "যদি

আমার মায়ের নামে একখানি ঘাট দাও তা'হলে আমার মায়ের উদ্ধার হ'বে। তা' না হ'লে হয় না।"

তখন উনি বল্লেন যে,—"আমি ওঁর নামে ঘাট দেব না।"

লোকেরা বুঝা'লেন—"শাশুড়ী, গুরু! দিতে হয়। দাও।"

এই উনি, একখানি দিলেন মা-বাপের নামে, একখানি দিলেন শ্বশুর-শাশুড়ীর নামে, একখানি ইষ্টদেবতা'র নামে, একখানি দিলেন নিজের নামে।

চা'রখানি ঘাট দিলেন , উদ্ধবের মায়ের উদ্ধার হ'ল।

ড্যাং কুরু কুরু বাদ্য বাজে। উদ্ধবের মা স্বর্গে উঠে॥*

ব্রতী লক্ষ্মীরা!—

উলু! উলু! উলু! উলু!

'কথা' শেষ হ'ল, উলু দাও লক্ষ্মীরা! উলু দাও। উলু দিয়া--

"ধর্ম্মরাজ যমরাজ! ব্রতীর সংসারে মঙ্গল কর! শ্বশুর শাশুড়ীর,
অন্তে যেন স্বর্গ হয়।**--" বলে, সকলে মিলে' প্রণাম কর।

এই তো যমপুকুর ব্রত হইল।

এখন, 'যমের মা', পুতুল, ফুল টুল, এ সব জলে দাও ; পুকুর বুজিয়ে রাখ ***

ধান-মান-কচু-গাছের গোছা যেমন আছে তেম্নি থাক্। অথবা, রোজ নূতনও দিতে পার। এমনি রোজ রোজ করবে। যমপুকুর ব্রত, হইল।

* ১ নম্বরের কথা আর ২ নম্বরের কথা, দুইটির মাঝামাঝিতেও, আবার একটি 'কথা' পাওয়া গিয়াছে। সেটি এই রকম

১-এর কথার সওদাগরের মা'র জায়গায়, এটিতে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণীর এক ছেলে হ'লে ব্রাহ্মণ মরে' গেলেন , ব্রাহ্মণী কষ্টে ছেলেকে মানুষ করে' বিয়ে করাইলেন। ছেলের বৌ যমপুকুর ব্রত করত। ১ এর কথার মত শাশুড়ী ঐ রকম ব্রত ভেঙ্গে, তারপরে মরে' গেলেন। মরে' যাবার সময় ' পর চক্ষু দু'খানি ঝিনুক বৌর কাছে রেখে বলে' গেলেন, "ঝিনুক দু'খানা চালে গুজে' রেখো, আর ভিখিরী এলে ভিক্ষে দিও না, অতিথি এলে বস্‌তে দিও না।" বৌ তাই করেন। ওদিকে মরে' গিয়ে ১-এর কথার মতন, শাশুড়ী ঐ রকম জল পান না, [illegible]ই পান না। ঐ রকম ছেলেকে স্বপ্ন দিলেন। তা'র পরে ঝিনুক জলে ফেলে দেওয়া হইল, আর, ঐ রকম ব্রত করা হইল।

** শ্বশুর শাশুড়ীর কথা, কেবল সধবারা বলবেন।

*** কোন কোন জায়গায় প্রথম দিনের 'যমের মা', পুতুল, এই সবই রেখে রোজ ব্রত করে', মাসান্তে জলে দেয়, আর, পুকুর একেবারে শেষ দিনে বুজায়।

যম : বাঙলার ব্রত-পার্বণে

রীতা ঘোষ

কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'-এর শান্তিপর্বে শুনি :

"শুদ্ধচিত্তে ব্রত যেই করে আচরণ।
সর্ব দুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন।।"[১]

—এর মাধ্যমে ব্রত পালনের উদ্দেশ্যটি, বিশেষ করে বাঙালির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। দুঃখের ত্রাণ এবং পাপের বিমোচনের উপায় অনুসন্ধান মানুষ করে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। কারণ সময়ভেদে 'দুঃখ' এবং 'পাপ'-এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে দুঃখের উল্টোপিঠে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি এবং পাপের উল্টো পিঠে পুণ্যের কামনা নিরন্তর মানুষকে আকর্ষণ করেছে। 'ক্ষ্যাপা'র মতই সে এই সুখ [অবশ্যই পার্থিব] এবং পুণ্য [অবশ্যই পারলৌকিক]-এর 'পরশপাথর'কে খুঁজে ফিরেছে। অবনীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই বলেছেন : 'কামনা ছাড়া মানুষ নেই, মানুষ ছাড়া কামনা নেই।'[২] তাই, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলায় নানাবিধ মেয়েলি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, —যা কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় সমষ্টিগত, সম্প্রদায়গত এবং বর্তমানে ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ বিশেষ কামনার দিককেই প্রতিফলিত করে। বিনয় ঘোষ প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেছেন যে ব্রত কখনই ব্যক্তির জন্য নয়, তা জনসমষ্টি বা সমাজের জন্য ;[৩] —এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে ব্রতের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে।

ব্রতী একক হতে পারেন, আবার অনেকে একসঙ্গে মিলেও ব্রত পালন করতে পারেন। একক হলেও তিনি বিশিষ্ট কোনো সমাজ বা সম্প্রদায়েরই অংশীভূত। কাজে কাজেই যে-কামনাকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি ব্রত করেন, তা সেই সমাজ বা সম্প্রদায়েরই কামনা। ব্রত পালনের স্তরগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে কিভাবে এর মধ্যে ব্যক্তিমন নয়, গোষ্ঠীমনের কামনাই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমে আলপনা, যার মাধ্যমে ব্রতীর কামনার রূপকাশ্রয়ী প্রকাশ ঘটে; দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে ব্রতীর কামনার বাঙময় রূপ, যা প্রকাশিত হচ্ছে ব্রতের ছড়া বা গানের মাধ্যমে। তৃতীয় স্তরে কিছু আচার বা লৌকিক আচরণ এবং চতুর্থ স্তরে রয়েছে ব্রতকথা শোনা। এখানে কমপক্ষে দু-জনের প্রয়োজন, যেখানে একজন পড়বেন বা বলবেন [কাহিনী অংশ] এবং অন্যজন শুনবেন। এই অংশেই সম-আকাঙ্ক্ষী মানুষের মিলন ঘটে। শুধু তাই নয় কাহিনীটির মাধ্যমেও বোঝা যায়, কিভাবে গোষ্ঠীকামনাই ব্যক্তিকামনার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে।

এই কামনার সূত্র ধরেই আসা যাক্ 'যম'-এর প্রসঙ্গে। যম, অর্থাৎ মৃত্যু বা মরণ ; যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন, মানুষের কামনার একেবারে বিপরীত প্রান্তে তার

অবস্থান; কারণ মানুষ চায় জীবন এবং তদ্-উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য। মৃত্যু, যার দেবতা হিসেবে 'যম' আমাদের ধারণায় অধিষ্ঠিত, তার প্রসঙ্গ-চিন্তা মানুষ সচেতনভাবে কখনই করে না। অথচ ব্রতের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ব্রতগুলি মানুষের কামনার প্রতিচ্ছবি। তবে সেখানে যমের উপস্থিতি কিভাবে সম্ভব? ব্রতের কামনাগুলিকে যদি একত্রিত করি তবে দেখা যাবে শস্যকামনা, সন্তানকামনা, সর্ববিধ মঙ্গলকামনার পাশাপাশি রয়েছে দীর্ঘজীবন [আয়ু] কামনা; অর্থাৎ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে ব্রতের কামনাগুলি। অথচ বাস্তব জীবনে মৃত্যু অগ্রাহ্য বা অস্বীকার্য নয়। সেখানে মৃত্যুরূপী যমেরই প্রতিপত্তি যেন বেশি। অকালমৃত্যু বা স্বাভাবিক মৃত্যু, যে রূপেই হোক না কেন, যমকে অস্বীকার করে জীবনের স্রোতে মিশে থাকার আকাঙ্ক্ষার সূত্রেই বাঙালির ব্রত-পার্বণে যমের অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে। তাই বাঙালির ব্রতে যম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিহ্নিত একটি অস্তিত্ব। কিভাবে?

সেকথায় যাওয়ার আগে প্রথমে দেখা যাক বাঙালির ধারণায় যমের পরিচিতি কেমন। পুরাণমতে যম হলেন ভীষণদর্শন, কৃষ্ণ বা সবুজবর্ণ, পরিধানে রক্তবাস এবং মহিষবাহন। শ্যাম ও শবল নামে দুটি কুকুর এঁর অনুচর। পিতৃলোকের অধিপতি হিসেবে যমকে দেখানো হয়। ইনি মৃতদের পাপ ও পুণ্যের বিচারক। যম আবার ব্রহ্ম-সভার এক জন সভাসদও বটেন। প্রতি হাজার বছরে যম একবার বিন্দু সরোবরে যজ্ঞ করতে আসেন। সূর্য এবং বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞার সন্তান হলেন যম ও যমী। যমী সহবাস কামনা করেন যমের। কিন্তু যম তা প্রত্যাখ্যান করেন। পুণ্যবান ও পাপী—সকলকেই পক্ষপাতশূন্যভাবে ইহলোক থেকে পরলোকে যাবার উপযুক্ত শরীর দান করেন। পুরাণমতে যমকে সমস্ত জীবেরই রাজা বলা হয়েছে এবং ব্রহ্মা তাঁকে দক্ষিণের 'দিক্‌পাল' নির্বাচিত করেন। [লক্ষণীয় : বলা হয় 'যমের দক্ষিণ-দুয়ার'; মনসাব্রতের কাহিনীতে পাই ছোট বউকে দেবী মনসা সমস্ত দিকে বিচরণের স্বাধীনতা দিলেও দক্ষিণদিক সম্পর্কে নিষেধ করেছিলেন। নিষেধ লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে ছোট বউ মনসার সংহার, তথা মরণদায়ী রূপটি দেখতে পায়।] যম স্বর্গের দেবতা, কিন্তু নরকের অধীশ্বর। যমের পুরীর নাম সংযমনী বা যমপুরী। মনুষ্যলোক থেকে ৮১০০০ যোজন দূরে এর অবস্থিতি। এটি সোনার তৈরি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পুণ্যবানদের যম নরনারায়ণ রূপে এবং পাপীদের ভীষণ মূর্তিতে দেখা দেন। এখানে রয়েছে যমসভা, যার আয়তন, ১০০ যোজন x ১০০ যোজন। এই সভায় আসীন যমের সামনে 'মুদ্গর' হাতে মৃত্যু এবং পাশে জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য কালদণ্ড [যমের অপর এক নাম কালও বটে]। এই যমসভায় কোনো দুঃখ-কষ্ট-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীত-গ্রীষ্ম কিছুই নেই এবং কেবল পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই এখানে বাস করতে পারেন। যমের মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত পাপপুণ্যের সমস্ত হিসেব রাখেন [ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে, যাকে আবার যমদ্বিতীয়াও বলা হয়, কোনো কোনো অঞ্চলে এই চিত্রগুপ্তের পূজা করার রীতি প্রচলিত আছে।]

পুরাণ ব্যতিরেকে বেদের মধ্যেও যমের কথা বার বার পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে প্রায় ৫০ বার যমের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের তিনটি সূক্ত যমের উদ্দেশে রচিত। সেখানে বলা হয়েছে পুণ্যাত্মা মৃতদের মধ্যে তিনিই প্রধান, কারণ তিনিই প্রথম মারা যান। দেবতাদের সঙ্গে তিনি একসঙ্গে গাছে বাস করতেন। যম দেবতাদের সহায় হলেও কোথাও তাঁকে দেবতা বলা হয়নি, তিনি স্বর্গীয় পিতৃগণের সহায়। ঋগ্বেদে বিবস্বান ও সরণ্যুর যমজ সন্তান যম ও যমী। এই বেদে কখনো কখনো অগ্নি ও যমকে অভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে;

কোথাও আবার বরুণের সঙ্গেও যমকে বর্ণনা করা হয়েছে। অথর্ববেদে আছে যমই মৃতদের আশ্রয় দেন এবং ভবিষ্যৎ বাসের স্থান নির্দেশ করে দেন। যমের আত্মাই সর্বপ্রথম স্বর্গে যায়।

যমের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ককেন্দ্রিত একাধিক কাহিনী পুরাণে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, সত্যযুগে কোনো যম ছিল না ; কেউ মারা যেত না, ফলে পৃথিবী জীবজন্তু-মানুষের ভারে নেমে যেতে থাকে। আবার নৈমিষারণ্যে যম যখন যজ্ঞ করছিলেন, সেই সময় পৃথিবী জীবে ভরে গিয়েছিল দেবতারা গিয়ে যমকে অনুরোধ করলে যম আবার নিজের কাজে ফিরে যান। এছাড়াও ত্রিপুরদলনে শিবের বাণে যম অধিষ্ঠিত ছিলেন ; নৈমিষারণ্যে দেবতাদের সঙ্গে পশুবলি করেছিলেন , খাণ্ডব দাহনের সময় ইন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন, [প্রতিটি ঘটনাই যমের সঙ্গে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।] অন্যদিকে দেখি, যম সাবিত্রীকে বরদান করেছিলেন, [সাবিত্রী ব্রতের কাহিনী এই সূত্রে স্মরণীয়—সত্যবানের জীবন দান।] দময়ন্তীর স্বয়ংবরে সন্তুষ্ট হয়ে নলকে বর দিয়েছিলেন ইত্যাদি। [এগুলি যেহেতু জীবনদানের ঘটনা, সুতরাং যমের সঙ্গে মৃত্যুর যোগ পরোক্ষে এসে যাচ্ছে।] লক্ষণীয়, যেমন পুরাণে যমকে ধর্ম বা ধর্মরাজ বলা হয়েছে, কারণ, সেই-ই হল সবচেয়ে পুণ্যবান। আবার অন্যদিকে যমকে 'শাসন' বলা হয়, কারণ ইনি শান্তি ব নিবৃত্তি এনে দেন। ধর্ম বলতে পুরাণমতে যা ধারণ ও পোষণ করে। ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন এবং পারলৌকিক জীবনকে যা সুখান্বিত ও শান্তিময় করে। ধর্মের আচরণে নিজের পাপক্ষয় হয় এবং পুনরায় জন্মাতে নাও হতে পারে। যেহেতু পুনর্জন্মের ব্যাপার, সুতরাং ধম এবং যম প্রত্যক্ষত জড়িত।

দেখা গেল যে ঐতিহ্যগতভাবেই যম এবং মৃত্যু প্রায় সমার্থক, যদিও কোথাও এমন বলা হয়নি যে মৃত্যুর দেবতা হলেন যম। অর্থাৎ বোঝা যায় যদিও যম এবং ধর্মকে সমধর্মী করে তোলা হয়েছে, তবুও মানুষের অবচেতন ধারণায় যমকে কখনই দেবতা করে তোলা হয়নি ; কারণ মৃত্যু কোনোভাবেই বন্দনীয় হয়ে উঠতে পারে না। যম এবং যমপুরী ও যমসভা মিলে একটি সুস্পষ্ট স্থানের ধারণা হিন্দু মানসিকতায় তৈরি হয়েছে, সেখানে পক্ষপাতশূন্য একজন বিচারক আছেন যিনি পাপ-পুণ্যের হিসেব নিকেশ করেন; এবং আরো লক্ষণীয় যে সেই স্থানটিকে পিতৃলোক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পাপ-পুণ্যের বিচারের সূত্রেই পুনর্জন্মের বিষয়টি বিবেচিত হয়, যা কিনা মর্ত্যমানুষের কাছে এক রহস্যময় অবস্থানে বিরাজিত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে 'ভবিষ্যৎ অবস্থান' এবং 'পিতৃলোক-ধারণা'—এই দুই চেতনাকে কেন্দ্র করেই বাংলার ব্রত-পার্বণে যমের অস্তিত্ব। যমপুরীর চিত্রটি এমন, যেখানে প্রায় স্বর্গ-সুখ বিরাজিত এবং পুণ্যাত্মারাই সেখানে থাকতে পারেন। অর্থাৎ 'অক্ষয় স্বর্গবাস'-এর কামনার সঙ্গে এর মিল অবশ্যই আছে।

বাংলার ব্রতে বা পার্বণে যমের উপস্থিতি দু-ভাবে লক্ষ্য করা যায় : প্রথমত যমরূপে, দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মৃত্যুরূপে। ব্রতের কামনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে একটি তথ্য পাওয়া যায় যে, সেগুলি ইহমুখী; এই ইহমুখিনতার কারণেই মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখা বা মৃত্যুকে জয় করে অন্য কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সেখানে প্রবল। ফলে একথা খুব সহজেই বোঝা যায় যে, পৌরাণিক অনুষঙ্গ নিয়ে যমরূপী [দেবতার] অস্তিত্বের উপস্থিতির তুলনায় মৃত্যু হিসেবেই ব্রতের মধ্যে তিনি সমধিক গৃহীত। তাই 'যমপুকুর ব্রত' এবং 'যমদ্বিতীয়া' [যা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামে বেশি পরিচিত] ছাড়া বাংলার আর কোনো ব্রতে 'যম' নামের উল্লেখ দেখি না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, একাধিক ব্রতের কথা-অংশে যম কিন্তু প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে বিরাজিত, যেমন শিবরাত্রির ব্রতকথা, সাবিত্রী

ব্রতের কথা-অংশ ইত্যাদি। কিন্তু যমকে উল্লেখ করে ব্রতপালন, এই দুটি ছাড়া আর দেখা যায় না। এর মধ্যে যমপুকুর ব্রতের তুলনায় যমদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রচলন অনেক বেশি। লক্ষণীয় যে, যমপুকুর ব্রতের উদ্দেশ্য বর্তমানে একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে; কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে যমদ্বিতীয়া ব্রত পালিত হত, আজো সেই উদ্দেশ্যেই তা পালিত হয়; পরিবর্তন হয়েছে ব্রতের নামটির ক্ষেত্রে—যমদ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—ভাইফোঁটা।

প্রথমে যমপুকুর ব্রতের কথা : এই ব্রতটি এবং এর কথা-অংশটিকে সম্যক্‌ভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে আদি-রূপের সঙ্গে বর্তমান রূপের বিস্তর পার্থক্য আছে। সমগ্র কার্তিক মাস জুড়ে কুমারীরা এই ব্রত পালন করে। বাড়ির উঠোনে এক হাত চৌকো পুকুর কেটে [বা পুকুরের আলপনা এঁকে] তার চারদিকে চারটে ঘাট করতে হয়। মাঝখানে কলমি, শুষনি, হিংচে, কচু ও হলুদ গাছ লাগাতে হয় [বা আঁকতে হয়]। পুকুরটির দক্ষিণঘাটে যমরাজা, যমরানী ও যমের মাসির পুতুল বানাতে হয় [বা আঁকতে হয়], [স্মরণীয়, পুরাণমতে ব্রহ্মা যমকে দক্ষিণদিকের দিকপাল নির্বাচিত করেন], পুকুরের উত্তর পাড়ে মেছো-মেছোনির পুতুল, পূর্বঘাটে ধোপা-ধোপানী, শেকো-শেকোনী [মতান্তরে শেখ-শেখনী] পুতুল এবং পশ্চিমঘাটে কাক, বক, হাঙর, কুমির এবং কচ্ছপের পুতুল বসাতে হয় [বা আঁকতে হয়]। পশ্চিমদিকের পুতুলগুলিকে অনেক সময় ঘাটে না বসিয়ে সরাসরি পুকুরের জলে দেওয়া হয়। এরপর যমরাজা, যমরানী আর যমের মাসিকে সাক্ষী রেখে বলা হয় :

যমরাজা সাক্ষী থেকো যম-পুকুরটি পূজি।
যমরানী সাক্ষী থেকো যম-পুকুরটি পূজি।

এইভাবে প্রতিটি পুতুলকে সাক্ষী রেখে এই মন্ত্র [বা ছড়া] বলা হয়। একেবারে শেষে পুকুরে জল ঢেলে বলা হয় :

শুষনি-কলমি ল ল করে
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষীর শুকোর বিল,
সোনার কৌটা রূপার খিল
খিল খুলতে লাগলো ছড়,
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।
কালো কচু, সাদা কচু ল-ল করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষীর শুকোর বিল,
সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল খুলতে লাগলো জড়।
আমার বাপ-ভাই হোক লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ দিলে বর, ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর॥

ব্রতটি চার-বছর এক নাগাড়ে পালন করে তারপর উদ্‌যাপন দিতে হয়। পুণ্য অর্জন, মুক্তির এবং পিতৃকুলের ঐশ্বর্য কামনায় কুমারীরা এই ব্রত পালন করে।[৫] ব্রতপালনের ক্ষেত্রে এর মন্ত্র [ছড়া]-

অংশটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এক্ষেত্রে ছড়াটিতে যমের নিজস্ব ভূমিকা তেমন করে কোথাও পাওয়া যায় না; কিছু রূপকধর্মী বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'রাজার বেটার পক্ষী মারা', 'মারণ পক্ষী' 'সোনার কৌটার রূপার খিল', যা খোলার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু কোথাও এই রূপক ভেদ করা হয়নি। কিন্তু পিতৃকুলের লক্ষপতি হবার বাসনা বারবার ফিরে আসছে, এবং ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সন্তানকামনাও যুক্ত হচ্ছে [ধনে-পুত্রে বাড়ুক ঘর], পাশা-পাশি শুষনি, কলমি, কচু গাছের প্রসঙ্গ আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বোঝা যাচ্ছে যে, সময়ভেদে এই ব্রত-প্রসঙ্গ টিকে ঘিরে প্রচুর মিশ্রণ ঘটেছে; আদিতে যমরাজা-যমরানীর যে ভূমিকার কথা স্মরণ করে এই ব্রতটি করা হত, সম্ভবত সেটি হল পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আদিম সমাজে জাদুক্রিয়াজাত জল ঢালার অনুষ্ঠান। কারণ যমলোক বা যমপুরকে ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের স্থান হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। এবং পুকুর তৈরি করে, মন্ত্র বলে, সাক্ষী রেখে জল ঢালা হচ্ছে—ঠিক যেন পিতৃপুরুষের তর্পণ। যমকে যেহেতু পক্ষপাতশূন্য পাপ-পুণ্যের বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং তাকেই সাক্ষী রেখে জলদানের এই পুণ্যকর্ম। 'সোনার কৌটা'কে যদি পার্থিব জীবনের কামনা-বাসনাময় জগতের রূপক ধরি, তবে তাতে 'রূপার খিল' অবশ্যই ভোগসুখের পথের অন্তরায়, অর্থাৎ মৃত্যু। যা পেরিয়ে 'অনন্ত ভোগসুখ', যেখানে আর মৃত্যু নেই, ঐতিহ্যগত ধারণায় যেখানে একমাত্র পুণ্যাত্মারাই যেতে পারেন এবং যার নির্ধারণ ক্ষমতা একমাত্র যমরাজার হাতে। ব্রতটির উদ্দেশ্যের সঙ্গে এইভাবেই ইহজীবনের বাপ-ভাইয়ের সমৃদ্ধিকামনা এবং পরজীবনের মুক্তি ও পুণ্যকামনা ও পূর্বতন পিতৃপুরুষের সঙ্গে মিলনকামনা—সত্যিই এই ব্রতটিকে এক পৃথক মর্যাদা এনে দিয়েছে।

ব্রতটির অন্যতর এক ঐতিহ্যও আছে। এটি পৌরাণিক 'যমপুষ্করিণী ব্রত'-এর এক সহজ অনুকৃতি বলে স্বীকৃত। যমভয় বা মৃত্যুভয় মানবজীবনের সবচেয়ে বড় ভয়। ভবিষ্যপুরাণে স্বয়ং যমরাজই এই যমভয় নিবারণের উপায় বলে দিয়েছেন। রানী চন্দ্ররেখা শিবভক্তিপরায়ণ। এবং স্বামী সেবায় সতত নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুর পরে যমদূতেরা যখন তাঁকে যমরাজের সামনে উপস্থিত করল, তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু যমরাজ তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন এবং তাঁকে বরদান করতে চাইলেন। চন্দ্ররেখা নরকভয় নিবারণের উপায় জানতে চাইলেন। যমরাজ জানালেন 'যমপুষ্করিণী ব্রত' করলে এই ভয় আর থাকে না।[৬]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে 'বুধাষ্টমী' ব্রতেও লক্ষ্য করা যায় একদিকে যমভয় নিবারণ, অন্যদিকে ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যলাভ। 'এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে বীর নামক ব্রাহ্মণের কৌশিক ও বিজয়া নামধেয় পুত্র ও কন্যা হারানো বৃষভ খুঁজে পেয়েছিল এবং শ্রীদুর্গার বরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান পেয়েছিল বিশাল রাজ্যাধিকার এবং ব্রাহ্মণ-তনয়ার বিবাহ হয়েছিল স্বয়ং যমরাজের সঙ্গে। অন্তিমে দ্বিজবর বীর ও তস্য পত্নী রম্ভা নরকে নিপতিত হন। কিন্তু কন্যার গুণে মুক্তিলাভ করেন। যমরাজের উপদেশে বিজয়া গোপবালিকার বেশে মথুরাপুরে উপস্থিত হয়ে আসন্নপ্রসবা গৌতমী নাম্নী ব্রাহ্মণীকে দিয়ে বুধাষ্টমী ব্রত করিয়ে তৎফল নরকে পচ্যমান্ পিতা-মাতাকে দিলে কৃতান্তের কৃপায় উভয়ের মুক্তি হয়।'[৭]

এই সূত্রে যমপুকুর ব্রতের একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে—যমভয় বা নরকভয় নিবারণ ; যেটি ব্রতের নামের সঙ্গেও সাযুজ্যময়। প্রচলিত যমপুকুর ব্রতকথার কাহিনীটি এই পৌরাণিক 'বুধাষ্টমী' ব্রতের হুবহু নকল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সে প্রসঙ্গে প্রবেশের পূর্বে

'বুধাষ্টমী ব্রত'-এর যমভয় নিবারণের নিরিখে 'যমপুকুর ব্রত'-এর মন্ত্র [ছড়া]-টিকে একবার বিচার করে দেখা যেতে পারে। যেহেতু পৌরাণিক ব্রতের অনুকৃতি সুতরাং পৌরাণিক দৃষ্টিতেই এটি বিচার করা যাক : হিংস্র জলজন্তু, যেমন হাঙর-কুমির এদের যম-পুকুরে রাখা হচ্ছে। তাহলে কি এই যমপুকুর 'দুষ্পার' বৈতরণী'র প্রতীক? যে বৈতরণী পার হওয়া জীবের কাছে অতি কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার ; অথচ এই বৈতরণী পার না হলে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যম জীব সংহার করেন তাঁর সংহারক মূর্তিতে, কিন্তু তাঁর করুণা হলে জীব অনায়াসে মুক্তিও পেতে পারে। ব্রতের যে ছড়াটি উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, কিছুটা উচ্চারণ পার্থক্যসহ, একটু ছোট আকারেও কোথাও কোথাও এটি প্রচলিত আছে :

'শুষনি কলমি ল ল করে
রাজার বেটা পক্ষী মারে
মারেন পক্ষী শুকায় বিল
সোনার কৌটা রূপার খিল
খিল খুলতে লাগলো ছড়
আমার বাপ-ভাই হোক লক্ষেশ্বর ॥

—এইটুকুই। এখানে 'পক্ষী' শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে ধরলে, কোনো অর্থ থাকে না। কিন্তু ব্যাপক [সাংকেতিক] অর্থে যদি 'হিংস্র জলজন্তু' ধরি, তবে রাজার বেটা অর্থাৎ যমরাজার [কিংবা যমরাজার অনুচর, যারা তাঁর কাছে পুত্রতুল্য আদরণীয়, অর্থাৎ যমদূত] সংহারক মূর্তিটি প্রকাশিত হয় পড়ে। অন্য মন্ত্রটিতে পাই 'মারেন পক্ষী' এবং 'শুকায় বিল' অনেক বেশি গ্রহণীয়, কারণ এটি যমরাজার অন্য আরেকটি মূর্তি প্রকাশ করে, যেখানে তিনি করুণা-পরবশ হয়ে জীবের মুক্তি বিধান করছেন। পুণ্য অর্জন এবং মুক্তি—এই দুই উদ্দেশ্যই যমপুকুর ব্রতে মুখ্য, যদিও ব্রতের মন্ত্রে পিতৃকুলের ধনসমৃদ্ধির কামনাও আছে।

যমপুকুর ব্রতের একটি কথা অংশ আছে, যার মধ্যে যমের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং তাঁর ভূমিকা আছে, এবং তা খুব স্পষ্টভাবে। ব্রতের মন্ত্র বা ছড়াটির মত তা অনেকাংশে সাঙ্কেতিক নয়। কিন্তু তবু লক্ষ্য করা যায় যে, ব্রতের উপকরণ এবং ব্রতপালন রীতির সঙ্গে ব্রতের কথা- টির যেন খুব একটা যোগাযোগ নেই। সম্ভবত যমপুকুর ব্রতের আদি গল্পটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই গল্পের দৃশ্যসজ্জাটি তার আলপনা ও উপচারের মধ্যে নিখুঁতভাবে বজায় রয়েছে এবং একটি নতুন গল্প তৈরি হয়েছে, যার উপজীব্য সন্তানের নিরাপদে জন্ম। কিন্তু ব্রতটির আলপনা ও উপচারের মধ্য থেকে সেই হারিয়ে যাওয়া কাহিনীসূত্রটিকেও খুঁজে বের করেছেন আজকের পণ্ডিত-গবেষকরা। সাঁওতালী সৃষ্টি-পুরাণকথার সঙ্গে কোনো এক অদৃশ্য সূত্রে এই ব্রতটি গ্রথিত ছিল। সাঁওতালী এই মিথটি যে লৌকিক ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেটিই কালক্রমে বাঙালি সমাজে পরিবর্তিত চেহারায় যমপুকুর ব্রতের মধ্যে এসেছে। 'কচ্ছপ, কুমির ইত্যাদির সাহায্যে জমিলাভ', [সাঁওতালী মিথে দেখি জলের তলা থেকে মাটি তুলে আনতে ব্যর্থ হল অন্যান্য স্থলচর প্রাণী ; শেষ কালে কচ্ছপের পিঠের ওপর মাটি রেখে পৃথিবীর জমি তৈরি হল।] 'তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে [অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হয়ে] সন্তান লাভ', [সাঁওতালী মিথে দেখি ঠাকুরজিউ (ঈশ্বর) কচ্ছপের পিঠে জমি তৈরি করে আদি মানব-মানবীকে সেখানে রাখেন; ক্রমে তাদের ছেলেমেয়ে হয় এবং সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জমিও (সম্পত্তি/ধন/ঐশ্বর্য) বৃদ্ধি পায়।] ইত্যাদি

সংস্কার তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখল, শুধু পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে গল্পটা চরিত্র বদল করে আদিবাসী সমাজের জায়গায় বাঙালি সমাজের সঙ্গে মানানসই করে গড়ে তোলা হল।'[৯] লক্ষণীয় যে অস্পষ্টভাবে হলেও পিতৃলোকের প্রসঙ্গ [যম-চেতনার সঙ্গে যা জড়িত] এখানে ধরা পড়েছে।

এবার যমপুকুর ব্রতের 'কথা' অংশ · এক বুড়ি ছিল; তার ছেলের নাম শুক্‌রাজ আর মেয়ের নাম দুগ্‌রাজ। দুগ্‌রাজের বিয়ে হল যমরাজার সঙ্গে, শুকরাজের বিয়ে হল এক গেরস্তের মেয়ের সঙ্গে। দুগ্‌রাজ শ্বশুরবাড়ি গেল, যমরাজ আর তাকে বাপের বাড়ি আসতে দিলেন না। শুক্‌রাজেব বউ কার্তিক মাসে বাড়ির উঠোনে যমপুকুর ব্রত করতে গেলে শাশুড়ি তাবে অপমান করে পূজার আয়োজন নষ্ট করে দেয়। বউ ধর্মরাজকে সাক্ষী মেনে চুপ করে থাকে।

এই একই ঘটনা পর-পর চারবৎসর ঘটে। কিছুদিন যায়; দু-তিন বছর পরে শাশুড়ি শক্ত রোগে ভুগে মারা গেল। দুগ্‌রাজ মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করে বাড়ি ফিরে গেল। যমরাজ তাকে কেবল দক্ষিণদিক ছাড়া আর সর্বদিকেই ঘুরে বেড়াতে বলল। কিন্তু দুগ্‌রাজ দক্ষিণদিকে গিয়ে নরককুণ্ড দেখতে পেল এবং তার মধ্যে নিজের মায়ের নরকযন্ত্রণা ভোগ লক্ষ্য করল।

পরদিন দুগ্‌রাজ যমরাজকে নিজের মায়ের কথা জানাল; যমরাজ বলল তাব মায়ের এর থেকে মুক্তি নেই, কারণ যমপুকুর ব্রতকে সে অপমান করেছে। সেই পাপে তার এই শাস্তি। শুনে দুগ্‌রাজ যথেষ্ট অনুনয়-বিনয় করলে পব যমরাজ বল্লেন, ছেলের বউ যদি চারটি যমপুকুর ব্রত শাশুড়ির নামে করে, তবেই উদ্ধার হবে, নইলে নয়।

দুগ্‌রাজ ও তার স্বামী যমরাজ ঠিক করলে যে পোয়াতি ছেলের বউয়ের উপর যমরাজ ভর করবেন এবং সেই বেদনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবাব জন্য শেষ পর্যন্ত সে চারটি যমপুকুর ব্রত করবে। যেই ব্রত সমাপ্ত হবে, অমনি সুষ্ঠু প্রসব হবে এবং শাশুড়িও উদ্ধার পাবে।

ঠিক তাই ঘটলো। প্রথমে ছেলেব বউ অরাজি হলেও শেষে প্রসবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাড়াতাড়ি চারটে যমপুকুর পুজো করলে— অমনি সব ব্যথা-কষ্ট জুড়িয়ে গেল এবং সুন্দর ছেলে হল; শাশুড়িও নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার পেল।[১০]

ব্রতকথাটির মধ্যে যম সম্পর্কিত প্রচলিত সমস্ত ধাবণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুষ্ঠু সন্তান প্রসবের প্রসঙ্গ। বিশেষ করে যমের দক্ষিণ দিক সংক্রান্ত ধারণা এবং যম দ্বারা পাপের শাস্তি বিধানে নরকযন্ত্রণা ভোগের ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এখানে পাই। যদি ছেলে জন্মানোর অংশটিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে খুব স্পষ্টভাবে যমপুকুর ব্রতপালনের উদ্দেশ্য হবে যমের শক্তিকে অস্বীকার না করা এবং এই ব্রত করে নরকের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া। এই ব্রত-কথার মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে নরকের চিত্র এবং সেখানকার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে : 'নরককুণ্ডর মাঝে, অনেক পাপীরা সব হাবু-ডুবু খাচ্ছে, আর ভয়ানক চেঁচাচ্ছে, শেষে দেখলে, ঠিক যেন তার মার মত, এক একবার মাথা তুলে উঠছে, আর অমনি ভীষণ যমদূতরা, বড় বড় ডাঙস মেরে, গুয়ের ভেতর ডুবিয়ে দিচ্ছে, আবার খাবি খেয়ে উঠছে। বড় বড় পোকা সব নাকে মুখে ঝুল্‌ছে।...যমদূতরা বড় বড় মুগুর মেরে আবার ডুবিয়ে দিচ্ছে।'[১১] মূলত এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই যমপুকুর ব্রত পালন, সন্তান প্রসব এবং বাপ-ভাইয়ের লক্ষেশ্বর হবার কামনা সম্ভবত পরবর্তী কালের সংযোজন।

এই ব্রত আলোচনার সূত্রে প্রতিবেশী বাংলাদেশে পালিত একটি ব্রতের কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় পালিত একটি ব্রত হল গারশী ব্রত;—আশ্বিন সংক্রান্তির

দিন এই ব্রত পালিত হয়। বাড়ির উঠোনে একটি কুলগাছের ডাল বা তুলসীগাছের ডাল পুঁতে তার সামনে একটি পুকুর কাটা হয়। এই পুকুরের পাড়ে একদিকে শিশু-কোলে এক বৃদ্ধার মূর্তি এবং অন্য ঘাটে একটি অলক্ষ্মীর পুতুল তৈরি করে রাখা হয়। এরপর চাল-ডাল-বিবিধ রকম তরকারি, ফলমূল দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এর থেকে কিছু অংশ পুকুরে দেওয়া হয়, বাকি অংশ দিয়ে রান্না হয়, এর ফলে অলক্ষ্মী দূরে গিয়ে লক্ষ্মী ঘরে আসে এবং এর মাধ্যমে মৃত শাশুড়িকে জল দান করা হয়। স্বপুকুরের জল শাশুড়ির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়।ৰ এই ব্রতটিকে ঐ অঞ্চলে যমপুকুর ব্রত বলেও অভিহিত করা হয়।[১২]

ব্রতের কথা-অংশটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যমপুকুর ব্রতের কথা-অংশের মত এখানেও পুত্রবধূ পুকুর কেটে ব্রত পালন করছে এবং জলদান করা হচ্ছে মৃতা শাশুড়িকে। হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করার অর্থ হল সেই ব্যক্তির মুক্তি কামনা করা। যমপুকুর ব্রতেও এই ব্রতটির মতই দেখা যাচ্ছে মৃতা শাশুড়িকে জলদান করে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। আশ্বিন সংক্রান্তিতে গারশী ব্রত করে সধবা নারীরা এবং সমগ্র কার্তিক মাস জুড়ে কুমারীরা করে যমপুকুর ব্রত। যমপুকুর ব্রতে খুব নির্দিষ্টভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে যমের ভূমিকা লক্ষ্য করি [ব্রতকথা অংশে এবং ব্রতের মন্ত্র/ছড়া অংশে]; গারশী ব্রতে পৃথক করে যমের কামনা উভয় ব্রতকে একই ভূমিতে দাঁড় করিয়েছে; [আলোচনায় দেখানো হয়েছে এই 'মৃত আত্মা'র সঙ্গে যমের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কি ও কেমন?] সম্ভবত কাল-পরিক্রমায় যমপুকুর ব্রতই পরিবর্তিতরূপে প্রতিবেশী সমভাষী রাষ্ট্রে গারশী ব্রতে পরিণত হয়েছে। সে-ক্ষেত্রে বলা যায় এই যমপুকুর ব্রতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তনশীল স্তরবিন্যাসের ধারা আছে : সাঁওতালী সৃষ্টিপুরাণে যে আদি পিতৃলোক এবং তার অবস্থানের কথা বলা আছে, তার প্রতিফলন রয়েছে যমপুকুর ব্রতের উপচারের মধ্যে, যার অনেকগুলিরই উপযোগিতা সম্পর্কে [ব্রতকেন্দ্রিক] পরবর্তীকালে প্রশ্ন জাগে। আদি কাহিনীটি নির্মঞ্ছিত হয়ে, ঐখানে পিতৃলোকের মঙ্গলকামনা এবং জলদানের পাশাপাশি নতুন একটি সূত্র সংযোজিত হয়েছে, তা হল সুষ্ঠু সন্তান প্রসব—বিষয়টি অবশ্যই অনুধাবনীয়। সূক্ষ্ম ধারায় সৃষ্টিপুরাণটির সঙ্গেও এর যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে––সেখানে পিলচু হাড়াম [আদি মানব] এবং পিলচু বুড়ি [আদি মানবী] জলের উপরে পৃথিবী পেয়ে [ঠাকুর জিউর দয়ায়] ক্রমে বহু সংখ্যায় এবং নির্বিঘ্নে সন্তানের জন্ম দিতে থাকে। ক্রমে এই স্তরেও পরিবর্তন আসে ; গারশী ব্রতে দেখছি যে, পিতৃলোকের ধারণা এবং মৃতকে জলদান করে মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি নতুন করে যুক্ত হয়েছে 'অলক্ষ্মী বিতাড়ন' এবং 'লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা'র ধারণা। অর্থাৎ লক্ষ্মী ব্রতের একটি পরোক্ষ প্রভাব এই ব্রতটির উপর এসে পড়েছে। কিন্তু সন্তান-কেন্দ্রিত ধারণাটি এর উপচারের মধ্যেও থেকে গেছে,—শিশুকোলে বৃদ্ধা নারীর পুতুল প্রতিস্থাপনের মধ্যে। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলার ব্রতে যমপুকুর ব্রত এমন একটি ব্রত, যেখানে সর্বকালের নারীমনের সমস্ত কামনাই একত্রিত হয়েছে;—সুষ্ঠু সন্তান প্রসব, লক্ষ্মীর আবাহন এবং স্থাপনা [লক্ষ্মী কখনো শস্য, কখনো অর্থ] এবং পিতৃকুলের মঙ্গল ও মুক্তি। লক্ষণীয় যে, যমপুকুর ব্রতের ছড়াটিতে বাপ-ভাইয়ের লক্ষপতি হবার কামনার কথা আছে ; কিন্তু ব্রতপালনের রীতির মধ্যে কোথাও এই লক্ষ্মীর আরাধনার কথা নেই। গারশী ব্রতের পালন-রীতি, উপচার এবং কথা-অংশ––সবক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে অলক্ষ্মীকে বিতাড়িত করে লক্ষ্মীকে ঘরে আনার কথা আছে। এই সূত্রেও গারশী ব্রতকে যমপুকুর ব্রতের পরিবর্তিত রূপ বলা চলে।

বাংলার আরেকটি যে পার্বণের মধ্যে যমের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি আছে, তা হল ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। একে আদিরূপে যমদ্বিতীয়া বলে অভিহিত করা হত। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিটি এই ভাইফোঁটার জন্য নির্ধারিত [স্মরণীয়, যমপুকুর ব্রতে যমের তুষ্টি বিধানের জন্যও কার্তিক মাসটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে]। কথিত আছে যে, যমরাজার বোন যমুনা এই বিশেষ দিনে যমরাজাকে ফোঁটা দিয়েছিলেন। এবং সেইজন্যই ভাইফোঁটা নাকি যমরাজকে প্রীত করে। ভাইদের যমভয় থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বোনেরা এই ব্রত পালন করেন। ভাইয়ের সামনে মিষ্টির থালা, পান-বাতাসা রেখে প্রদীপ জ্বালানো হয়। বিশেষভাবে একটি হস্তমুদ্রা তৈরি করে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল বা অনামিকার সাহায্যে দই-চন্দন, মতান্তরে ঘি-চন্দন এবং কাজলের ফোঁটা তিনবার কপালে ঠেকানো হয়। এই সময় একটি ছড়া মন্ত্রের আকারে ব্রতিনী উচ্চারণ করেন। পাশাপাশি মাটিতেও তিনবার 'x' চিহ্ন আঁকা হয়। পরিশেষে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ ও প্রণামের পর্ব সারা হয়। যে ছড়াটি বলা হয়, অঞ্চলভেদে তার মধ্যে কিছু কিছু রূপান্তর নজরে পড়ে। যেমন :

ক. দ্বিতীয়াতে দিয়া ফোঁটা
তৃতীয়াতে দিয়া নিতা*,
যমুনা দেয় যমেরে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইরে ফোঁটা,
আজ অবধি ভাইয়ের আমার—
যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা ॥

খ. ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা,
ভাই আমার সোনার ভাঁটা,
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা,
যম যেমন অমর—
আমার ভাই যেন হয় তেমনি অমর ॥

গ. ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ুক কাঁটা
ফোঁটা যেন নড়ে না, ভাই যেন মরে না ॥

এই ব্রতটির কোনো কথা-অংশ পাওয়া যায় না। [হয়ত আদিতে ছিল।] লক্ষণীয় যে, ছড়াগুলির মধ্যে সর্বত্রই যম এবং তার বোনের প্রসঙ্গ আসছে। ঋগ্বেদে যম এবং তার বোন যমীর উল্লেখ পাওয়া যায় ; ভাইফোঁটার ছড়ায় যমের বোন হলেন যমুনা। 'পরবর্তীকালে হিন্দু-পুরাণে যমীকে আর বিশেষ দেখা যায় না। শুধু মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে যে, মত্ত বলরামের স্নানের আহ্বানে সাড়া দিতে অনিচ্ছুক হলে তাঁর হলের প্রবল আকর্ষণে যত্র-তত্র গমন করতে বাধ্য

*[নিমন্ত্রণ > নিমতন্ন > হিন্দী নেওতা > সংক্ষেপে নিতা]। বি. নিমন্ত্রণ। 'নিতায় ভাত' = শিবের গান [বঙ্গসাহিত্য পরিচয়]।

হয়েছিলেন। তখন থেকেই নাকি তাঁর যমুনা নদীরূপে পরিচয়।'[১৩] ঋগ্বেদে 'যম-যমী সংবাদ'-এ তারা ভাইবোন হওয়া সত্ত্বেও যমী বিয়ে করতে চাইছে এবং যম দেবতাদের ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা জানিয়ে তাকে অন্য পতি নির্বাচন করতে বলছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানাচ্ছে যে আদিমযুগে ভাই-বোনের বিয়ে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ পরবর্তীকালে বোনের ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনার মাধ্যমে উভয়ের সম্পর্কের 'পবিত্র তা' বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে, বস্তুতপক্ষে ভাইয়ের আয়ুকামনার মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি যমকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে ; যমুনার যমকে ফোঁটা দেওয়া, অর্থাৎ যমের অমর হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করে, বল' চলে সাক্ষী রেখে বোনেরা ভাইয়ের অমর হবার কামনা করছে। যমপুকুর ব্রতেও যমরাজ-যমরানী, এমনকি যমের পরিবারের সদস্যদেরও সাক্ষী রেখে বোনেরা ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করে। এই দুটি ব্রতকেই সেই সূত্রে সমধর্মী বলা যায়।

ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানটি বর্তমানে একটি আনন্দকেন্দ্রিত সামাজিক প্রথা হিসেবেই পালিত হয়; কিন্তু আদিতে এটি ছিল একটি খাঁটি জাদু অনুষ্ঠান। মৃত্যুকেন্দ্রিত আদিম ধারণা এবং তাকে প্রতিরোধ করার জাদু অনুষ্ঠান হল এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ফোঁটা দেওয়া এবং মন্ত্রপাঠ এই দুটি-ই জাদু অনুষ্ঠানের অঙ্গ। 'তিন' সংখ্যাটি লোকায়ত ধারণায় শুভ; [তিনবার ফোঁটা দেওয়া হয়] ফোঁটা দেওয়ার পাশাপাশি মাটিতে যে 'X' চিহ্ন আঁকা হয়, তাও জাদুকেন্দ্রিত বিশ্বাস। [স্মরণীয় বলি দেওয়া হয় যে হাড়িকাঠে, সেখানেও অনেকে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ঐ একই চিহ্ন এঁকে থাকেন, অমঙ্গল দূর করে দেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।] মন্ত্র [ছড়া]-গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ফোঁটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যম-দুয়ারে কাঁটা পড়ে যাবার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে : দ্বিতীয়ত যমের অমরত্বের সমান অমরত্ব কামনা করা হচ্ছে এবং ভাইয়ের কপালে ফোঁটার স্থায়িত্বের সঙ্গে অমরত্বকে প্রামাণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, এই ঘোষণাগুলি এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে যে, সেখানে যমের বিরুদ্ধে একটি 'চ্যালেঞ্জ' ঘোষিত হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে একটি লড়াইয়ের মনোভাব। অর্থাৎ ব্রতটির আপাতচেহারায় যদিও যমকে তুষ্ট করার ভঙ্গি রয়েছে, কিন্তু ছড়ার মধ্যে রয়েছে সমানে-সমানে আদায় করে নেবার ভঙ্গি। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নেপালী বোনেদের দ্বারা পালিত 'ভাইটিকা' উৎসবটির কথা স্মরণীয়। উৎসবটি দুটি ভাগে পালিত হয়; ভাইফোঁটার দিন বোনেরা অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে ভাইদের বাঁচানোর জন্য যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে, তখন পোড়া চালের ফোঁটা তাদের কপালে পরিয়ে দেয়। এখানেও ফোঁটাকে নিয়ে জাদুবিশ্বাস লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানটি আরো অনেক বেশি জাদু-ভাবাপন্ন; এদিন ফোঁটা দেওয়া হয় ঘি-চন্দন এবং কাজল দিয়ে [সম্পূর্ণভাবে বাংলার ভাইফোঁটার মত] । এই অংশে একটি আখরোটকে বোনেরা এক আঘাতে ভাঙে। এটি রাখা থাকে বাড়ির বাইরে দরজার সামনে। ভাঙার পর এটিকে ছাদের ওপর দিয়ে ঘর ডিঙিয়ে ঘরের ওপারে ফেলে দেয় বোনেরা। আখরোটটি যমরাজার মাথার প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়; এবং মনে করা হয় এক আঘাতে সেটি ভাঙতে না পারলে ভাইয়ের অমঙ্গল হবে।[১৪] এখানে, প্রক্রিয়াটির মধ্যে লড়াইয়ের ছবিই যেন প্রতিফলিত—ভাইয়ের সুরক্ষার জন্য বোনেরা যমরাজার মাথা ভাঙতেও প্রস্তুত। যে কথা আগে বলেছি, সেকথারই পুনরাবৃত্তি করতে হয় : যমপুকুর ব্রতের মধ্যে যমের শক্তি ও ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে সর্বত্রই তুষ্টিবিধান এবং আত্মসমর্পণের ভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু বাংলার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং সমধর্মী নেপালের ভাইটিকায় যমের

শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েও তাকে পরাভূত করার একটি মানসিক প্রবণতাই প্রতিফলিত হয়েছে।

দেখা গেল যে কার্তিক মাসেই বাঙালি যমকেন্দ্রিক মূল দুটি ব্রত বা পার্বণ উদ্‌যাপিত করে। এছাড়াও কার্তিক মাসেরই অমাবস্যাতে দেবী কালিকা মৃত্যুদেবীরূপে কল্পিতা হয়ে পূজিতা হন। প্রেত-নরক-মৃত্যু ইত্যাদি অনুষঙ্গ যে কালীপূজার সঙ্গে জড়িত, তা তন্ত্রশাস্ত্র না বুঝেও সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে নয়। [কালীপূজার পূর্বের রাতটিকে ভূতচতুর্দশী বা নরকচতুর্দশী হিসেবে উল্লেখ করাই তার প্রমাণ।] পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে কার্তিক মাসের চতুর্দশী এবং অমাবস্যার রাত্রে নদীর জলে জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসিয়ে দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে যে সেই আলোতে অন্ধকার রাত আলোকিত হবে এবং পরলোকগত পিতৃপুরুষেরা সেই আলোয় পথ দেখতে পাবে। এছাড়াও আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে গোটা কার্তিক মাস জুড়ে রাত্রে যে আকাশ-প্রদীপ জ্বালানো হয়, তার কারণও মৃত পূর্ব-পুরুষদের পথ আলোকিত করা। অর্থাৎ যম এবং যমলোক সম্পর্কিত ব্রত, পূজা এবং কিছু সংস্কারপালন সারা কার্তিক মাস জুড়েই ঘটে। এছাড়াও পুরাণবৃত্ত অনুযায়ী এই কাহিনী প্রচলিত যে, দেবীলক্ষ্মী অমৃতের পাত্র হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই কার্তিক মাসেরই কৃষ্ণাপঞ্চদশীর রাত্রে। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে এই তিথিতেই অলক্ষ্মী বিতাড়ন করে লক্ষ্মীপূজার রীতি প্রচলিত আছে। গোবর দিয়ে অলক্ষ্মীর মূর্তি তৈরি করে, কলার পেটোয় বসিয়ে পুজো করে, তারপর কুলোয় চাপিয়ে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে ফেলে দিয়ে এসে তারপরে পিটুলির লক্ষ্মী নারায়ণ কুবের মূর্তি পুজো করা হয়।[১৫] কালীপূজোর রাতে অশুভ ভূত- প্রেত [যমের অনুষঙ্গবাহী/মৃত্যুর অনুচর] বিতাড়নের অন্যান্য আর সব কল্পনার সঙ্গে অলক্ষ্মী বিতাড়নের ধারণাটি অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। ''অমৃত' উদ্ধার হয়েছিল যে তিথিতে—সেটিই মৃত্যুজয়ের তিথি বলে গণ্য হয়েছে; মৃত্যুদেবতাকে আরাধনা করার নির্দিষ্ট দিনরূপে সেটিই গণ্য হল অতএব।'[১৫] কার্তিক-অমাবস্যা রাতের এই অলক্ষ্মী-বিতাড়ন এবং লক্ষ্মীর আবাহনের পরিকল্পনাটি বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের 'গারশী ব্রত'-এ আমরা লক্ষ্য করেছি, সেটি আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন পালন করা হয়; সে অঞ্চলে এই ব্রতকেই 'যমপুকুরব্রত'-ও বলা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, মৃত্যুরূপী যম খুব নির্দিষ্টভাবে তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সারা কার্তিকমাস জুড়ে বিভিন্ন রূপ পরিকল্পনায়, প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে, বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্রত-পার্বণ এবং সংস্কারধর্মী অনুষ্ঠানের মধ্যে পূজিত হয়ে থাকেন।

প্রত্যক্ষ ভূমিকায় যমকে কিছু কিছু ব্রতকথার কাহিনীতে উপস্থিত হতে দেখি। এই সূত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শিবরাত্রি ব্রতের কথাটি। এই ব্রতকথাটিতে দেখা যায় স্বয়ং শিব এই কাহিনীটি পার্বতীকে বর্ণনা করছেন। কাহিনী-অংশে একটি ব্যাধের অজানিতে শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপনের প্রক্রিয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এবং এর ফলে ব্যাধটি শিবরাত্রি ব্রতের ফল পেয়ে শিবলোকে, অর্থাৎ কৈলাসধামে, অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গলাভ করেছে। কাহিনীর শেষ অংশটি এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য : যখন ব্যাধের মৃত্যু হল, তখন একই সঙ্গে যমদূতেরা এবং শিবের দূতেরা এল তাকে নিয়ে যেতে। দু-দলে মারামারি হবার পর শিবের দূতেরা যমদূতদের হারিয়ে তাকে কৈলাসে নিয়ে গেল; সেখানে স্বয়ং নন্দী ব্যাধের শিবরাত্রি পালনের কথা যমদূতদের জানাল তারা ফিরে গিয়ে যমকে সব কথা জানানোর পর তিনি বললেন যে, যে লোক শিবরাত্রির ব্রত পালন করে, তার উপর যমের কোনো অধিকার নেই।[১৬] দেখা গেল যে, যম স্বয়ং স্বীকার করেছেন তার অধিকারের

সীমা এবং সেখানে তার হাত এড়িয়ে স্বর্গবাসের অধিকার আদায় করে নেওয়া যাচ্ছে। এখানে যমের থেকেও শিবকেই বেশি শক্তিশালী করে দেখানো হচ্ছে। যমপুকুর ব্রতে যেমন দেখি যে, যমকে তুষ্ট করে মৃত্যুভয় নিবারণ বা নরকযন্ত্রণার হাত এড়ানোর প্রচেষ্টার কথা, তেমন এখানে শিবরাত্রি ব্রত করলেই যম পরাস্ত হবেন এবং ব্রতীর কৈলাস প্রাপ্তি বা শিবলোক প্রাপ্তি ঘটবে। অর্থাৎ সরাসরি স্বর্গে যাওয়া যাবে, যমের পাপ-পুণ্যের বিচারসভায় দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। এখানে যমের ভূমিকা অনেকটাই যেন নিষ্প্রভ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে সধবা নারীরা পালন করে সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত। পুরাণের সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীর পূর্ণ প্রভাব রয়েছে এই ব্রত এবং তার কাহিনীর মধ্যে। যমরাজেরও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে এই ব্রতের উপচার এবং কাহিনীর মধ্যে। এই ব্রত করার জন্য নৈবেদ্য, পঞ্চশস্য, সিঁদুর, অশ্বত্থ বা বটের ডাল ইত্যাদির সঙ্গে সাবিত্রী-সত্যবান-নারায়ণের বস্ত্র এবং ধর্মরাজের বস্ত্রও দেওয়া হয়। স্মরণীয় যে পুরাণে যমরাজকেই ধর্মরাজ বলা হয়েছে। ব্রতের কাহিনীতে পেয়েছি কিভাবে সাবিত্রী বুদ্ধির শক্তিতে যমরাজকে পরাস্ত করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছেন। ব্রতকাহিনীতেও ধর্মরাজ বলেই যমরাজকে পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং সাবিত্রী ধর্মরাজের ধর্মরক্ষা করাকে প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে ধর্মরাজ পরাস্ত হলেও তাঁর ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। কারণ সত্যবানের জীবন তিনি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই ব্রতে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে যমের চিত্র আঁকা হয় এবং তার জন্য আলাদা বস্ত্রও প্রদান করা হয় [যমপুকুর ব্রতেও যমরাজার পুতুল/ চিত্র তৈরি করা হয়]। এই কাহিনীটি পৌরাণিক কাহিনীর আদলে তৈরি বলেই সম্ভবত 'যম' সম্পর্কিত সমস্ত অভিব্যক্তিটুকু প্রকাশিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত জামাইষষ্ঠী বা অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথাটির মধ্যে 'যমের-মা' নামক একটি চরিত্র আছে, যার ভূমিকা অনেকটাই যমের মত।[১৭] তবে যেহেতু এটি ষষ্ঠী-ব্রতের কাহিনী, তাই সন্তানের দীর্ঘজীবন কিভাবে পাওয়া যাবে, তাই এখানে বর্ণিতব্য বিষয়। অন্যান্য ব্রত বা ব্রতকথাতে যমকে যেরূপে পাই, এখানে তার রূপটি একেবারেই অন্যরকম। তবে যম এবং মানুষের মধ্যে [প্রতীক রূপকে যমের মা এবং ষষ্ঠীর গোবিন্দ চরিত্রের মা] একটা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের প্রতিফলন এই কাহিনীতে ফুটে উঠেছে। ঠিক যেমন বলা হয় যে, যমে-মানুষে টানাটানি করে, বা মৃত্যুর মুখ থেকে কাউকে ছিনিয়ে আনা হয়, ঠিক তেমনি। আরো লক্ষণীয় যে 'ষষ্ঠীর গোবিন্দ' চরিত্রটি এমনভাবে পরিকল্পিত যে, সে অনায়াসে যমের মার কাছে যায় এবং পার্থিব মানুষের নানা কিছু সমস্যার সমাধান জেনে আসে। এই ভূমিকাটিও এখানে এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু পরোক্ষে যমের হেরে যাওয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

'যম' এই শব্দটির অন্য একটি রূপ হল 'মৃত্যু'। এই মৃত্যুরূপেও যমের অস্তিত্ব একাধিক ব্রতের মধ্যে লক্ষিত হয়। কখনো বা সেই মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ব্রত, আবার কখনো বা মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়ে কিছু ব্রত বা তার ছড়া। কিছু কিছু ব্রত পালিত হয় হিংস্র প্রাণী, যেমন বাঘ, কুমির, সাপ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। বাংলাদেশের বহু অঞ্চলের কুমির পূজা, বাঘাই বা বাঘাই শিরনি, দক্ষিণরায় ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীকেন্দ্রিক ব্রত পালন করতে দেখা যায়। এগুলি অপঘাতজনিত মৃত্যুকে রোধ করার কারণেই পালিত হয়। এই সূত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মনসা ব্রত বা সর্পপূজা। অধুনা বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ,

সর্বত্র এই ব্রতের ব্যাপক প্রচলন। কোনো কোনো অঞ্চলে একে নাগ পঞ্চমীও বলা হয়। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন এই ব্রত পালিত হয়। ব্রতগুলির উদ্দেশ্য বিচার করলে একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, মৃত্যুকে [যমকে] রোধ করাই এর মূলমন্ত্র।

কিছু কিছু ব্রত এমন আছে, যার ছড়া [মন্ত্র]-গুলির মধ্যে মৃত্যু বা মরণকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই ব্রতগুলির কোনো 'কথা' অংশ নেই। যেমন 'দশপুত্তল ব্রত'-এর ছড়াটি :

এবার মরে মানুষ হব, ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নেব।
এবার মরে মানুষ হব, সীতার মত সতী হব॥
এবার মরে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব।
এবার মরে মানুষ হব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব॥
এবার মরে মানুষ হব, দশরথের মত শ্বশুর পাব।
এবার মরে মানুষ হব, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
এবার মরে মানুষ হব, লব-কুশের মত পুত্র পাব।
এবার মরে মানুষ হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব॥
এবার মরে মানুষ হব, দূর্বার মত লজ্জাশীলা হব।
এবার মরে মানুষ হব, দুর্গার মত সোহাগী হব।
এবার মরে মানুষ হব, ষষ্ঠীর মত জেওজ হব॥
এবার মরে মানুষ হব, গঙ্গার মত শীতল হব।
এবার মরে মানুষ হব, পৃথিবীর মত ভার সব॥

—বৈশাখ মাসে পালিত এই ব্রতে ইহজীবনের যাবতীয় সুখকেই কামনা করা হচ্ছে। প্রতিবারই মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েই পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা ; এবং প্রতিবারই মানুষ হিসেবেই জন্মাতে চাওয়া। এই পুনর্জন্মের কামনার মধ্যেই মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার একটা পরোক্ষ প্রয়াস লক্ষিত হয়। পুনর্জন্মের কামনা হিন্দু বিশ্বাসের ঐতিহ্যধারার এক বিশেষত্ব। এর মাধ্যমে মৃত্যুকে যেমন স্বীকার করে নেওয়া হয়, তেমনি তাকে অতিক্রম করে জীবনের আকাঙ্ক্ষায় ফিরে আসাকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। আবার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টির কামনায় পালিত বসুধারা ব্রতের ছড়ায় খুব স্পষ্ট করে পুনর্জন্মকে অস্বীকার করা হচ্ছে :

বসুন্ধরা দেবী মাগো তোমায় করি নমস্কার।
এই পৃথিবীতে জন্ম যেন আর না হয় আমার॥

প্রিয়জনের মৃত্যুকে নিজের চোখে দেখার যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে, এমন ব্রতের ছড়াও পাওয়া যায়। যেমন বৈশাখ মাসে পালিত চাঁপাচন্দন ব্রতের ছড়াটি :

চাঁপাচন্দনে পূজলে হরি শোক দুঃখ না পায় নারী।
জন্মিয়ে না দেখি যেন বন্ধুর মরণ,
জন্মিয়ে না দেখি যেন গুরুর মরণ,
জন্মিয়ে না দেখি যেন স্বামীর মরণ।......ইত্যাদি,

—ব্রতটি পালিত হয় পতি-পুত্র এবং সুখ ও ঐশ্বর্যের কামনায়। একই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়

সেঁজুতি ব্রতের কিছু ছড়া। এই ছড়াটিতে যে প্রিয়জনের মৃত্যুকে না দেখার আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে, সেঁজুতি ব্রতের ছড়ায় ঠিক উল্টোভাবে অপ্রিয়জনের মৃত্যু কামনা করা হয়েছে এবং সেই কামনার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতার আনন্দ লক্ষ্য করা যায়। অঘ্রান মাস জুড়ে এই ব্রত পালন করা হয়—বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও কামনা নিয়ে। বাংলাদেশে এক সময় সতীন সমস্যা নারীদের কাছে এক যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা ছিল। নারীদেব কাছে প্রধান কামনা ছিল যেন জীবনে সতীন সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয়। তাই অকপটে সতীনের মৃত্যুকামনা,—ব্রতের মাধ্যমে হলেও —করতে এরা এতটুকু লজ্জিত হয়নি। সেঁজুতি ব্রতে বিভিন্ন বস্তুর আলপনা এঁকে নিজের মনস্কামনা ব্যক্ত করতে হয়। সেখানে পাই :

* আয়না আয়না আয়না।
সতীন যেন হয় না॥

এই না হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত এই ব্রতেরই অন্য ছড়ায় :

* সতীন যদি হয়, সে যেন মারা যায়।

* তাল গাছেতে বাবুই বাসা।
সতীন মরে দেখতে খাসা॥

* পাখি পাখি পাখি
নিচেয় মলো সতীন
আমি উপর থেকে দেখি॥

* উদ্‌বেড়ালী উৎ খা।
স্বামী রেখে সতীন খা॥

* হাতা হাতা হাতা।
খা সতীনের মাথা॥

* অশ্বত্থ তলায় বাস করি
সতীন কেটে আল্‌তা পরি॥

* অব্‌ভরের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি॥

* বঁটি বঁটি বঁটি
সতীনের শ্রাদ্ধের কুটনো কুটি॥...ইত্যাদি।

বোঝা যাচ্ছে, সমস্যাটি কত গভীর যে, নিষ্ঠুর মৃত্যুকামনাতেও আনন্দ ফুটে উঠেছে। এই মৃত্যুকামনা যখন ব্রতিনীর নিজের ক্ষেত্রে ঘটছে, তখন তাকে মহিমান্বিত করে তোলা হচ্ছে। যেমন, অনেক ব্রতেই গঙ্গাজলে নিজের মৃত্যুকামনা করছে ব্রতিনী। এর পিছনে অবশ্যই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করি, যেখানে বৈতরণী পার হওয়ার অনুষঙ্গে গঙ্গাজলের পবিত্রতা এবং সেইসূত্রে গঙ্গাতীরে মৃত্যুর ফলে স্বর্গবাসের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ভাবনা-চিন্তা কাজ করেছে। যেমন 'পুণ্যিপুকুর ব্রত'-এর ছড়াটি। সেখানে আকাঙ্ক্ষাগুলি এরকম :

হয়ে পুত্র মরবে না।
পৃথিবীতে ধরবে না॥...

পুণ্যি পুকুরে ঢালি জল,
শ্বশুরকুলের হউক মঙ্গল ॥...

এবং ব্রতের ফল নিরূপণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

নির্ধনের ধন হয়,
সাবিত্রী সমান সতী হয়,
স্বামী সোহাগিনী হয়,
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
মরণ হবে গঙ্গাজলে ॥

আবার 'হরিরচরণ ব্রত'-এও এই আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে :

হবে পুত্র মরবে না, চক্ষের জল পড়বে না
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে, মরণ যেন হয় একগলা গঙ্গাজলে।

'চাঁপা-চন্দন' ব্রতেও নিজের মৃত্যুকামনা করা হয় :

এই বর মাগি আমি শিবের চরণতলে
মরণ হয় যেন স্বামীর কোলে।

'রণে এয়ো ব্রত'-এও এই একইভাবে বলা হয় :

একগলা গঙ্গাজলে, শুক্ল মল্লিকার ফুলে
মরণ হয় যেন স্বামী পুত্রের কোলে ॥

এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন ব্রতের বিভিন্ন কামনা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে ব্রতিনী নিজের এই অন্তিম কামনাকে কি সুন্দর সাযুজ্যময় করে দিয়েছেন। পুণ্যিপুকুর ব্রতটির বৃষ্টিকামনা এবং শস্যক্ষেত্রকে উর্বর করে তোলার জাদুকেন্দ্রিক কামনার সঙ্গে, হরিরচরণ ব্রতের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ গৃহিণী হওয়ার কামনার সঙ্গে, বা চাঁপা-চন্দন ব্রতের সুখী বিবাহিত জীবনের কামনার সঙ্গে, অথবা রণে এয়ো ব্রতের স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনার আর্তির সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে,— ব্রতিনীর এই গঙ্গাজলে মৃত্যুর কামনা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামনা এইভাবেই মিশে যায় ব্রতগুলির মধ্যে।

যদিও পৌরাণিক ধারণায় কোথাও যমকে দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়নি, বা অন্যান্য দেবতার সমতুল্য মর্যাদাও দেওয়া হয়নি, তবু একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বাঙালির লৌকিক জীবনে যম হলেন মৃত্যুরূপী দেবতা। তাকে ঘিরে রয়েছে রহস্যময় এক ভীতির অনুভূতি, যা মৃত্যুরই সহোদর। সম্ভবত মৃত্যুর বাস্তবচেতনা-জনিত রহস্যময়তাই যম সম্পর্কে বাঙালি মানসকে আগ্রহী করে তুলেছে, যার প্রতিফলন একাধিক ব্রতপার্বণেও ঘটেছে। চূড়ান্ত দুর্ভোগকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যবহৃত হয় 'যমযন্ত্রণা' বা 'নরকযন্ত্রণা' শব্দটি—এটিই প্রমাণ করে পুরাণ-নির্দেশিত যম সম্পর্কিত ধারণাই অজানিতে তাকে অন্যান্য দেবতার মতই মর্যাদা দিয়েছে। বাংলার ব্রত-পার্বণে যমের মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে জীবন-দানের। যমপুকুর ব্রত, যমদ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মত ব্রতের কথা বাদ দিলেও একাধিক ব্রতের কাহিনী/ছড়া অংশে পাওয়া যায় যে ব্রতিনী স্বামী-পুত্র-প্রিয়জনের দীর্ঘজীবন কামনা করছেন। কোথাও কোথাও [যেমন সাবিত্রী

ব্রত, পৃথিবী ব্রত] আবার এমনও দেখি যে যমরাজা বাধ্য হচ্ছেন মৃতের জীবন ফিরিয়ে দিতে। বস্তুতপক্ষে বাংলা ব্রতকথার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা [Functional Unit, বাংলায় একে সক্রিয়মূল একক বলতে পারি] হল মৃতের পুনর্জীবন লাভ। বাংলা ব্রতকথাগুলির মধ্যে [বিভিন্ন সূত্রে প্রায় ১২৮টি বাংলা ব্রতকথা পাওয়া গেছে] প্রায় ৩৪টি ব্রতকথায় এর পরিচয় পেয়ে থাকি। যেমন লোটন ষষ্ঠীর ব্রতকথা, মৌনী অমাবস্যার ব্রতকথা, ইত্যাদি। পুনর্জন্মের ঘটনা বাংলা ব্রতকথায় নেই বললেই চলে। কেবল ভিতাষ্টমীর ব্রতকথার মধ্যে এর প্রকাশ দেখি। এখানেই যম এবং যমকেন্দ্রিত ধারণায় বাংলার ব্রতপার্বণের অবস্থানটি খুব স্পষ্ট হয়ে যায়। পুনর্জন্ম ব্যাপারটি ততটা অভিপ্রেত নয়, যতটা অভিপ্রেত লড়াই করে বা 'যমের দুয়ারে' কাটা দিয়ে বা যমরাজাকে তুষ্ট করে দীর্ঘজীবন প্রাপ্তি। যেহেতু জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য হল মৃত্যু, সম্ভবত সেই কারণেই এই মরণজয়ী সাধনা। বাংলার ব্রতগুলিতে যমের ভূমিকা তাই শুধু একমুখী নয়; এখানে আধ্যাত্মিকতা আছে, দার্শনিকতা আছে, আছে তার শক্তিতে বিশ্বাস। সর্বোপরি আছে লড়াই করে জীবনকে ছিনিয়ে আনার [ব্যর্থ] প্রচেষ্টা।

তথ্যসূত্র :

১. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', শান্তিপর্ব ; [প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ; ১৩৬০] পৃ ৯৬৬।
২. 'বাংলার ব্রত' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩ 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' : বিনয় ঘোষ।
৪ পৌরাণিক এই তথ্যগুলি গৃহীত হয়েছে অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পৌরাণিকা-১ম ও ২য় খণ্ড' থেকে। প্রকাশকাল ১৯৭৯।
৫. 'বাংলার ব্রত-পার্বণ' : ড. শীলা বসাক [১৯৯৮] পৃ. ১৬৪।
৬ 'বারো মাসে তেরো পার্বণ—কি ও কেন?' : স্বামী নির্মলানন্দ [১৩৮৫] পৃ. ১০৯।
৭. ঐ পৃ. ১০৯।
৮ ঐ পৃ ২০
৯ 'পূজা পার্বণের উৎসকথা' : ড. পল্লব সেনগুপ্ত [১৯৯০] পৃ. ৬১
১০ ৫ নং পাদটীকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃ. ১৬৪-১৬৮
১১ ঐ পৃ ১৬৬।
১২. ঐ পৃ ৩৮০।
১৩. ৯ নং পাদটীকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃ. ১২৭।
১৪. ৫ নং পাদটীকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃ ২৩১।
১৫. ৯ নং পাদটীকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃ. ১২৫-১২৬
১৬ ৫ নং পাদটীকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃ. ১৬৪।
১৭. ঐ, পৃ. ১৭৮

যমের রাজিত্তি : ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ

বরুণকুমার চক্রবর্তী

সেধে কে আর যমের সান্নিধ্য প্রার্থনা করে? অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। যার জীবনের প্রতি আর কোনো আসক্তি নেই, পৃথিবীর, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ যাকে আর টানে না, সর্ববিষয়ে যে বীতশ্রদ্ধ, সে হয়ত যমের দাক্ষিণ্য পেতে ব্যাকুল : অর্থাৎ হতভাগ্য মানুষই যমকে চায়। এ চাওয়ার মধ্যে থাকে নেতিবাচকতা। যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ, এক ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তির প্রকাশ, ইংরেজিতে যাকে বলে escapcism অবশ্য যাকে আমরা নেকনজরে না দেখে বিষনজরে দেখি, যার অস্তিত্বই আমাদের কাছে অনভিপ্রেত বলে মনে হয়,— তার ক্ষেত্রে দ্রুত মৃত্যুকামনা করতে যমকে সুপারিশ করি - তার প্রতি আনুকূল্য দেখানোর জন্য। আর এক শ্রেণীর মানুষের জন্যও আমাদের মৃত্যুকামনা উচ্চারিত হয় যারা নাকি সহায়সম্বলহীন, রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, প্রিয়জনের সঙ্গসুখভোগে বঞ্চিত, যাদের জীবনের কোনো আশা নেই, বেঁচে থাকাটাই যাদের কাছে নিরতিশয় বিড়ম্বনাজনক;—মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ ব্যতিরেকে যাদের দ্বিতীয় কোনো মুক্তির পথ রুদ্ধ।

বাংলা লোকসাহিত্যে যমের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরেই এসেছে। লোকসমাজ কি দৃষ্টিতে যমকে দেখে, তার প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের ছড়ায়-ধাঁধায়-প্রবাদে। প্রথমে ছড়ায় যমের প্রসঙ্গ কেমনভাবে এসেছে দেখা যেতে পারে। বাঙালি হিন্দু সমাজে যে কটি সামাজিক উৎসবের চল রয়েছে, তার মধ্যে বোধকরি সর্বোত্তম হল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। চলতি কথায় যাকে আমরা বলি ভাইফোঁটা। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া,—যে উৎসবের স্নিগ্ধতা বাস্তবিকই অতুলনীয়। ভাই-বোনের প্রীতি-মধুর সম্পর্ক নিয়ে এমন উৎসবের সন্ধান সচরাচর মিলবে না। ভাইফোঁটায় বোন অথবা দিদি যেই হোক, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে তার দীর্ঘজীবন কামনা করে ছড়া আবৃত্তি করে :

প্রতিপদে দিয়ে ফোঁটা দ্বিতীয়েতে নিতে
আজ হতে ভাই আমার যমের ঘরে
নিমের অধিক তিতে।
ঢাক বাজে ঢোল বাজে, আরও বাজে কাঁড়া,
বোনের ফোঁটা না নিয়ে ভাই না যেও যমের পাড়া,
না যেও যমের ঘর।
আজ হতে ভাই আমার রাজ রাজেশ্বর।

যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দেই আমার ভাইর কপালে ফোঁটা,

ভাইর কপালে দিলুম ফোঁটা
যম দুয়ারে পড়লো কাঁটা।
স্বর্গে শঙ্খের ধ্বনি, মঞ্চে জোকার,
বোনে ভাইকে ফোঁটা দেয়,
ভাই না যাইও, যমের দক্ষিণ দুয়ার।
যম দোয়ারে দিয়া কাঁটা
যম খরত বাইড়া আইতা
ভাই দ্বিতীয়ারে দিলাম ফোঁটা॥

ব্রতের ছড়াতে যমের উপস্থিতি না ঘটলেও যমকে প্রসন্ন করার প্রয়াস লক্ষণীয়। যমপুকুর ব্রত তারই নিদর্শন। আসলে এ হল যমরাজা ও যমরানীর পূজা। এতে যে ছড়াটি বলা হয় তা অবশ্য যম-প্রসঙ্গ বিমুক্ত :

শুষনি কলমি ল ল করে,
রাজার বেটা পাখি মারে।
মারণ পাখি সুখোর বিল,
সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল খুলতে লাগল দড়,
আমার বাপ ভাই হোক লঙ্কেশ্বর।

বাংলা ধাঁধাতেও যম সশরীরে বর্তমান। তবে যমকেন্দ্রিক ধাঁধার সংখ্যাল্পতা চোখে পড়ার মত। একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে :

দুই অক্ষরে নাম তার সর্বলোকের ভয়
প্রথম অক্ষরে আকার দিলে সর্বলোকে খায়,
পরের অক্ষরে আকার দিলে সর্ব অঙ্গ ঢাকে
তার উপরে তা দিলে আদর করিয়া ডাকে

এই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি দেখি পুরুলিয়ার একটি ধাঁধাতে :

দুই অক্ষরে নাম তার
ভয়ঙ্কর মূর্তি তার দেখলে পায় ভয়,
এক আকারে খাবার জিনিস,
দুই আকারে পরবার জিনিস হয়।

খাবার জিনিস বলতে জাম, পরার জিনিস বলতে জামাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
আর একটি ধাঁধায় যমের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে অত্যন্ত কৌশলে, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে :

সূর্য, যম, কুন্তী
পিতা পুত্র এক নারী করে আলিঙ্গন,

উভয়ের ঔরসে জন্মে উভয়েব নন্দন।
কি নাম তাদের ছিল বল দেখি শুনি
সত্য মিথ্যা কিসে ইহা শাস্ত্রের শিখনি।

আমরা জানি পাণ্ডুর প্রথম পুত্রসন্তান যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির জননী কুন্তীব ধর্মের ঔরসে গর্ভধারণ। যুধিষ্ঠির যমপুত্র এবং কুন্তীর গর্ভজাত। যমপুত্র যুধিষ্ঠির, সূর্য এবং কর্ণ। আবার সূর্যের পুত্র কর্ণ যমের পুত্র যুধিষ্ঠির উভয়েরই জন্ম কুন্তীর গর্ভে।

যমরাজ মন্ত্রীর নাম কি সে হয়,
পাপ পুণ্যের হিসাব যার কাছে রয়। [চিত্রগুপ্ত]

যমের জমজমাট রাজত্বি প্রবাদে। ছড়া ও ধাঁধার সঙ্গে প্রাত্যহিকতার সম্পর্ক ক্ষীণ। কিন্তু প্রবাদ আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তাই জীবনের দুটি চরম সত্যের একটিকে প্রবাদ কোনমতে অস্বীকার করতে পারেনি। তা হল মৃত্যু। মৃত্যু ও যম একে অন্যের শুধু সহায়ক নয়, মানুষের চোখে একে অন্যের সমনাম, Synonym। এ-হল প্রচলিত ধারণা। কিন্তু দুইয়ে পার্থক্য তো কম নয়। যম বা যমরাজ হল মৃত্যুর দেবতা। দেব ও দেবরাজের যেমন পার্থক্য। কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামের মত যমেরও অনেক নাম—অন্তক, কৃতান্ত, ধর্মরাজ, শমন, সংযম।

যাইহোক, এবারে আমরা প্রবাদ অবলম্বনে যম সম্পর্কিত লোকসাধারণের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হব। প্রবাদে যমকেই মৃত্যু বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

অভাগাব যমও নেই।—এই প্রবাদে সেই হতভাগ্য সম্পর্কে খেদোক্তি প্রকাশিত হয়েছে যাকে যমেও দেখে না। যমও যাকে আনুকূল্য করে না।

কাজে কম খেতে যম—এই প্রসঙ্গে বৈপরীত্যকে বোঝাতে যমের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এমন ব্যক্তির সংসারে সাক্ষাৎ মেলে যে নাকি কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, কিন্তু খেতে ভারি দড়। এক্ষেত্রে যম যেমন খায় তেমনি নিষ্কর্মা ব্যক্তিটির আহারের পরিমাণ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রায় অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত আর একটি প্রবাদ—এক মায়ের এক পুত খায় দায় যেন যমের দূত। এক মায়ের সন্তান হলে স্বভাবতই তার উপর মায়ের নজর কিঞ্চিৎ অধিক থাকে। তারই ফলে সন্তানটির খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর এরই পরিণতিতে যমদূতের সঙ্গে সে উপমিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে বসে।

কুঁড়ে গরু বিচালি খাবার যম—এই প্রবাদটিতে যে গরু তেমন কাজে লাগে না কিন্তু অধিক পরিমাণ বিচালি খেতে অভ্যস্ত তার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এখানে বলা বাহুল্য 'কুঁড়ে গরু' বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হয়নি, রূপকার্থে প্রযুক্ত।

একটি প্রসঙ্গে পুরুত ও যজমানের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে :

বামুনকে হরিনাম, ওজন তার কম।
এল যে পুরুত ওই যজমানের যম॥

পুরুতের জীবিকা পৌরোহিত্য করা, তাই যজমানের বাড়ি কাজে-কর্মে পুরোহিতের ডাক পড়লে তিনি সচরাচর যে দীর্ঘ তালিকা পেশ করেন, তাতে বেচারি যজমানের 'আত্মারাম খাঁচা- ছাড়া' হবার যোগাড়। পুরোহিতের মাত্রাতিরিক্ত প্রলোভনকে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যজমানের পক্ষে তাকে যম ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে যমকে পাই শত্রুরূপে।

প্রচলিত একটি বিশ্বাস হল :

তিন ঝি বইয়া হয় পুত,
ঘরে সামায় যমদূত।

অর্থ হল কোন পরিবারে যদি পরপর তিনটি কন্যাসন্তানের জন্মগ্রহণ করার পর পুত্রসন্তানের জন্ম হয় তবে তা দুর্ভাগ্যের সূচক। দুর্ভাগ্যের সূচকরূপেই যমদূতের সেই পরিবারে উপস্থিত হবার কথা বলা হয়েছে।

'মেয়ের নাম ফেলি,
পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি'।

Proper names sometimes connotative, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে মেয়েটির 'ফেলী' নামেব Connotation, তার পরিণতির প্রেক্ষিতে রক্ষিত হবার সম্ভাবনাকেই দ্যোতিত করেছে। পরের ঘরে মেয়ে দেওয়া আর যমের দৃষ্টিতে পড়া—একই পরিণতি উভয় ক্ষেত্রেই।

সতীনের প্রসঙ্গে নারীর মানসিকতার সন্ধান মেলে এই প্রবাদটিতে :

যমকে ভাতার দিতে পারি
সতীনকে তবু দিতে নারি।

অর্থাৎ স্বামীর যদি মৃত্যু হয় তাও সইবে, কিন্তু প্রাণ ধরে স্বামীকে সতীনের হাতে তুলে দিতে নারাজ পতিপ্রাণা স্ত্রী।

সমাজে যাদের আপনজন বলে মেনে নেওয়া হয়নি তাদের মধ্যে রয়েছে জামাই ও ভাগ্নে, আরও রয়েছে যম—যম জামাই ভাগ্নে, তিন নয় আপনে।

রোগের চিকিৎসার জন্য যোগ্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়। নতুন হাতুড়ে বদ্যির পাল্লায় পড়লে মৃত্যুর আর বিলম্ব থাকে না, রোগ নিরাময় তো দূরের কথা :

'হাতুড়ে বদ্যি যমের দোসর।'

হাতুড়ে বদ্যিকে যমদূত না বলেও যমের দোসরের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।

একটি প্রবাদে শাশ্বত সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে!' অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য, তাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। একই বক্তব্য আর একটি প্রবাদেও উল্লিখিত হয়েছে :

পালাবার আশা মিছে, যম ধাওয়া করছে পিছে।

বাংলা ছড়ায় বধূ ও শাশুড়ির অহি নকুল সম্পর্কের কথা আমাদেব জানা। প্রবাদেও সেই একই সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে, একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে :

বউমা ক্ষীর রইল খাবে।
যদি খাবে ত যমের বাড়ি যাবে।।

এই প্রবাদটির প্রথমাংশের বক্তব্যের নিরিখে শাশুড়িকে স্নেহশীলা বলেই মনে হয়, যে নাকি তার পুত্রবধূর জন্য ক্ষীর রেখেছে, শুধু তাই নয় তাকে যথাসময়ে ক্ষীর খাবার নির্দেশও দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রবাদটির দ্বিতীয়াংশে শাশুড়ির প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে ; সত্য সত্যই বধূ যদি ক্ষীর ভক্ষণ করে তবে তার গন্তব্য হবে যমের বাড়ি। একে কি বলব Caution না অভিশাপ?

যমের হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা অবজ্ঞাসূচক, ঘৃণা উদ্রেককারী নামকরণ করি জাতকের। যেমন গুয়ে, মুতে, হেগো। কিন্তু প্রবাদে সার কথাটি বলে দেওয়া হয়েছে; তা হল, যত চেষ্টাই করা যাক যমের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই—'গায়ে গু মাখলেও যম ছাড়ে না'।

কেউ যদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়, জীবনের আশা যদি সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে তখন আমরা প্রায়শই বলে থাকি : 'যমে মানুষে টানাটানি'।

নিজেদের অজ্ঞতা অথবা অবিমৃষ্যকারিতার কারণে অনেক সময়ে নিজেরাই যমকে ডেকে আনি :

'তপ্ত অম্ল, ঠাণ্ডা দুধ, এই জানবে যমের দূত'।

যদি গরম টক খাই তবে তা বিপজ্জনক, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। একইভাবে ক্ষতিকারক হল ঠাণ্ডা দুধ। এইসব খেলে মৃত্যুকেই আহ্বান জানানো হবে।

মৃত ঘোড়া সমগ্র পল্লীকে দূষিত করে তোলে। সত্বর তার গতি হওয়া কাম্য। প্রবাদের ভাষায় : 'মড়া ঘোড়া পাড়া খাওয়ার যম'।

মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা সচরাচর বলে থাকি, 'যমের খাতায় তলব পড়েছে'। নানা ব্যাধি, নানা প্রতিকূলতা, নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও বয়স্ক বা বয়স্কা কেউ যদি বেঁচে থাকে, শত কষ্টেও মৃত্যু বরণ না করে, তবে তাকে বলা হয় 'যমের অরুচি।'

বয়স্ক ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই মৃত্যুর নিকটবর্তী হন। প্রবাদের ভাষায় : 'সাদা চুলে যমের পরোয়ানা।' মানুষের সব থেকে ভয় মৃত্যুকে। মৃত্যু অনিবার্য অথচ তাকে আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। কৌশলে একটি প্রবাদে মানুষকে মৃত্যুভয় অতিক্রমণের সূত্র দেওয়া হয়েছে :

পাপ করলেই যমের ভয়, পাপ মনে বড় হয়।

যদি পাপকাজে রত না হই, তবে যমের ভয় থাকবে না। অর্থাৎ পাপ করলে তার শাস্তিস্বরূপ যমের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা।

মিটমিটে ডান ছেলের ক্ষতির কারণ বোঝাতে বলা হয় : 'মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার যম।' যে ঘর পছন্দের নয়, যে ঘর অনভিপ্রেত, তাকে তুলনা করা হয় যমের ঘরের সঙ্গে—'পরের ঘর না যমের ঘর'।

আসলে নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘর আমাদের অপছন্দের, তাই অন্যের বা পরের ঘর মাত্রেই যমের ঘরের তুল্য বলে বিবেচিত হয়।

প্রকৃত কাজের বেলায় যে অষ্টরম্ভা—অথচ অকাজে যাকে বেশি সক্রিয় দেখা যায়, তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যে প্রবাদটি, তা হল: 'কাজের নাম নেই, যম কিলানোর যম।'

যম যতই অবাঞ্ছিত হোক, দুর্বিষহ জীবন যার, জীবনের আকর্ষণ যে নাকি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে, তার কাছে যম মুক্তিদাতা—সকল যন্ত্রণার অবসানকারী। তাই মৃত্যুকামনা করা সত্ত্বেও যখন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা পূরণ হয় না তখন সে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে :

'বুঝি হতভাগার দেশে যম গিয়েছে বানে ভেসে।'

বেশ কয়েকটি ইডিয়মে যমের উল্লেখ পাই। যেমন:

যমের উপবাস, যমের দোসর, যমের দক্ষিণ দ্বার, যমের মার গঙ্গা স্নান ইত্যাদি।

মোটা মত ঢাক পরোটার অসীম বলকে গুরুত্ব দিতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে :

মোটা মতন ঢাক পরোটা
যম ডরায় তার বলকে,
পিতা হয়ে করেছ বর
দোষ দিব পরকে।

মানুষ পাঁজি পুঁথি দেখে এবং মেনে কাজে অভ্যস্ত, তাই বলে যমকে ত আর পাঁজি পুঁথি মিলিয়ে কাজ করলে চলবে না। একটি প্রবাদে তাই রসিকতা করে বলা হয়েছে:

যমের বাড়ি নেই পাঁজি পুঁথি।

আঘাতকারী মাত্রেই যম বলে বিবেচিত হয়, মানুষের শত্রু সে:

যে মারে সেই যম।

অন্য অনেক পথ অজানা থাকলেও মৃত্যুর পথ যমের বাড়ির পথ সকলেরই জানা; কেননা জীবমাত্রেই মৃত্যুর শিকার, তাই প্রবাদের ভাষায়, 'যমের পথ সকলেই চেনে'।

একসময় ডোম যোদ্ধৃজাতি বলে বিবেচিত হত, এরা ছিল শৌর্য-বীর্যের আধার। বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত সাহসী যুদ্ধনিপুণ ডোমদের সকলেই ভয় পেত। একমাত্র ব্যতিক্রম যম: 'কেননা ডোমকে নেই যমের ভয়।'

ডোমের সঙ্গে অনেক সময়ে যমের তুলনাও করা হয়েছে, সেই সুবাদে 'ডোমের পুত যমের দূত।'

এসব ছাড়াও আরও অনেক প্রবাদে যম-প্রসঙ্গ এসেছে, যেমন—খাওয়ার সময় যমেও ছোঁয় না; নি-মুখো কুকুর, কাঁটা খাবার যম; যমের মুখে পিঁপড়ে ভাজা; যে দেয় ভাত শালা পানি শালি, যম তারে পাড়ে গালি ইত্যাদি।

যম : আদিবাসী ভাবনায়

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস, ঠাকুর প্রত্যেক মানুষের আয়ু মেপে তাকে এ পৃথিবীতে পাঠান। আয়ুর মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পরলোকে ফিরে যেতে হয়। মৃত্যুর পর নশ্বর দেহটি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়. সেই অবস্থা দিনের পর দিন চোখে দেখা যায় না বলে মৃতদেহটি দাহ করা হয় নতুবা কবর দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষ মারা গেলেও আত্মা অমর, অবিনশ্বর। আত্মার মৃত্যু হয় না বলেই মৃতদেহটিকে ভালোভাবে বিদায় জানানো হয়। শ্রাদ্ধের সময়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলা হয় : 'জহার! তবে আম বঙ্গা তালা আকান, নঃঅয় মিৎ ফুড়ুঃ হাঁণ্ডি..........এমাম, চালাম কানা, খুসিতে খুসালতেম আতাঙা, তেলায়া নিয়ী বাড়ে সুককঃ রেবেন কঃ মে।' অর্থাৎ—'প্রণাম! হে বিদেহী আত্মা, এক বাটি হাঁড়িয়া....... তোমাকে অর্পণ করছি, নিবেদন করছি, খুশি মনে আনন্দ সহকারে এটা তুমি গ্রহণ কর।'

আত্মা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরলোকে আশ্রয় নেয়। সাঁওতালী ভাষায় 'পরলোক' বলতে 'হানাপুরি' বোঝায়। 'হানাপুরি' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'অন্য পুরী'। মৃত্যুর পর 'হানাপুরি'তে আত্মা হাজির হয়। সেখানে ভালো-মন্দের বিচার হয়। এ-পৃথিবীতে যারা ভাল কাজ করে তাদের স্থান স্বর্গে [সেরমাপুরি], আর যারা নানারকম দুষ্কর্ম করে, তারা ঠাঁই পায় নরকে। সেখানে তাদের ভীষণ শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু 'নরক' কথাটা যতদূর সম্ভব সাঁওতালী কথা নয়। সাঁওতালী পুরাণ, শ্রুতিকথা, লোককথা, কিংবা বিন্‌তী কোথাও এ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে, সাঁওতালীতে 'মরণ' বলে একটি কথা আছে, এই 'মরণ' কথাটির যা অর্থ 'নরক' কথাটিরও অর্থ তাই। 'মরণ' কিংবা 'নরক' যে শব্দই ব্যবহার হোক না কেন, তাতে যন্ত্রণাদায়ক কষ্টকর একটি জায়গা বোঝায়। সেজন্য কেউ মরণে যেতে চায় না, সবাই জিয়নে [জীবন]থাকতে চায়।

এবার 'জিয়ন' ও 'মরণ' মতবাদটিকে একটু স্পষ্ট করে তুলে ধরি। এক সময়ে সাঁওতালরা বিশ্বাস করত যে, ছেলেদের বাম হাতে 'শিকা' এবং মেয়েদের শরীরে 'উল্‌কি' চিহ্ন না থাকলে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হয়। পঞ্চাশ/ষাট বছর আগেও অধিকাংশ সাঁওতাল ছেলের বাম হাতে বেজোড় সংখ্যক অর্থাৎ একটি, তিনটি, পাঁচটি কিংবা সাতটি শিকা চিহ্ন টিকার মত দেখা যেত। আজকাল তা আর দেখা যায় না। বেজোড় সংখ্যক 'শিকা' চিহ্নের তাৎপর্য জীবনে থাকা আর জোড় সংখ্যক হলে মরণে যাওয়া অর্থাৎ 'নরক বাস'।

মরণ [নরক] অতি ভয়ঙ্কর স্থান, সেখানকার শাস্তি খুবই কঠিন। মরণের অধিপতি হুদুলরাজ

ওবফে যমবাজেব নির্দেশে তাব অনুচববা দুষ্কর্মকাবীদেব নানাবকম শাস্তি দেয ছেলে ও মেযেদেব শাস্তি বিভিন্ন বকম। ছেলেদেব সবসময একই বকম পবিশ্রম কবতে হয না কবতে চাইলে গবম লোহাব ছেঁকা দেওযা হয ছুঁচলো অস্ত্র দিযে গুতানো হয মোটেই বিশ্রাম কবতে দেওযা হয না , সেজন্য ছেলেবা এ পৃথিবীতে তামাক খাওযা অভ্যাস কবে নেয যেন

আদিবাসী পুবাকথা জডানো পট

মরণে তামাক খাওয়ার অছিলায় কিছুক্ষণ অন্তত বিশ্রাম নিতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে শাস্তি অতখানি কঠোর নয়। তাদের নির্দয়ভাবে আঘাত কিংবা গরম লোহার ছেঁকা দেওয়া হয় না। তবে শাস্তি তাদের পেতে হবেই, ঢেঁকির মত বিরাট বিরাট সাপ কিংবা ঢাক-ঢোলের মত বড় বড় পোকা তাদের কোলে তুলে দেওয়া হয়। এতেই তারা অস্থির হয়ে ওঠে, মোটেই শান্তি পায় না।

আবার সাঁওতাল সমাজে এ রকম একটা জনশ্রুতি আছে যে, এ-পৃথিবীতে যারা নানারকম কু-কাজ করেছে নরকে গিয়ে তাদের কু-কাজ করার আসক্তি থাকলেও তারা তা পারে না। কু-কাজ করতে পারে না বলে তারা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে।

যমপুবী জেলখানার মত। আনন্দ-উল্লাস নেই, সেখানে যমরাজের শাসন বড় কড়া। কথার খেলাপ তিনি করেন না। যমপুরীর নিয়ম-কানুন তিনি অদল-বদল কবেন না। কঠোর হাতে সবকিছু প্রয়োগ করেন। তবুও একবার তাঁকে যমপুরীর নিয়ম পাল্টাতে হয়েছিল, যার ফলে আদিবাসী সমাজে বাহা পূজা/সহরুল [Flower Festival] চালু হয়। খুব সুন্দর লোক-কথা সবাইয়ের ভাল লাগবে। লোককথাটি হল :

ধরিত্রীমাতা তাঁর একমাত্র কন্যার নাম রেখেছিলেন বিন্দি। বড় আদুরে কন্যা। ধবিত্রীদেবী মেয়েকে বড় ভালোবাসতেন, সব সময় চোখে চোখে রাখতেন কিছুক্ষণ চোখের আড়ালে থাকলে অস্থির হয়ে উঠতেন। মেয়েও মাকে সে রকম ভালোবাসত।

একদিন বিন্দি একাই নদীতে চান করতে গেছলো। কিন্তু সেই যে গেল আর ফিরলো না। মেয়ে ফিরছে না দেখে ধরিত্রীদেবী অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর লোকজনকে খোঁজ নিতে পাঠালেন, কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ভাবনা-চিন্তায় উতলা হয়ে ধরিত্রীদেবী বলতে লাগলেন ‧ 'মেয়েকে যদি আমি না পাই তাহলে এ জীবনই আর রাখব না। আমি আর কাব জন্যই বা শুধু শুধু বেঁচে থাকব!'

ধরিত্রীমাতার দুঃখ দেং প্রকৃতিদেবীও ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। দেখতে দেখতে গাছেব পাতা সব পাণ্ডুবর্ণ হতে লাগল, এক এক করে ঝরে পড়তে লাগল আর প্রকৃতির চেহারাই পাল্টে গেল।

এদিকে ধবিত্রীমাতার অনুচরেরা খুঁজতে খুঁজতে যমপুরীতে গিয়ে শুনলো যে বিন্দিরানী সেখানে আছে। তারা যমরাজার সঙ্গে দেখা করে বলল যে তারা বিন্দিরানীকে নিতে এসেছে। কারণ, বিন্দিরাণী নেই বলে ধরিত্রীমাতা ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেছেন।

অনুচরদের এ-কথা শুনে যমরাজ বললেন যে তাদের এ-অনুরোধ রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, যমপুরীতে একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে বাইরে আর কেউ বেরুতে পারে না, এটাই যমপুবীর নিয়ম। বিন্দিরানীর ক্ষেত্রেও এ নিয়ম বজায় থাকবে।

তবুও, ধরিত্রীমাতার অনুচরেরা বিন্দিরানীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ জানাতে লাগল, কিন্তু যমরাজ কিছুতেই রাজি হলেন না।

শেযে অনুচরেরা যমরাজকে বলল যে বিন্দির'ণী যদি না ফেরে তবে ধরিত্রীমাতা তাঁর জীবন বিসর্জন দেবেন। বিন্দিরানী কাছে নেই বলে ধরিত্রীমাতা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর দুঃখ দেখে প্রকৃতিরও রূপ পাল্টে গেছে। গাছের পাতা সব ঝরে যাচ্ছে, গাছগুলো সব খাডরা হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির অবস্থা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ধরিত্রীমাতা বেঁচে না থাকলে

সৃষ্টিই লোপ পাবে, পৃথিবী চিরদিনের মত ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ-কথা শুনে যমরাজও চিন্তায় পড়লেন, কি করবেন তা ঠিক করা কঠিন হয়ে উঠল। ধরিত্রীমাতার অনুচরেরা যা বলছে তা তো সত্যিই! পৃথিবীই যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে তিনিই বা কি করবেন? আবার অঘটন যদি কিছু ঘটে অর্থাৎ ধরিত্রীমাতার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহলে তাঁর উপরে সমস্ত দোষ এসে পড়বে, তিনিই দোষী হবেন। অনেক চিন্তা করে ঠিক করলেন, ধরিত্রীমাতাকে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে বড় কাজ। এজন্য প্রয়োজন হলে যমপুরীর নিয়ম বদল করতে পেছপা হলে চলবে না।

শেষ পর্যন্ত কথা ঠিক হল যে বিন্দিরানী ছ-মাস যমপুরীতে থাকবে, আর বাকি ছ-মাস পৃথিবীতে। তারপর থেকে বিন্দিরানীর এই পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় হলে প্রকৃতি নতুন সাজে ফুলে-ফলে ভরে ওঠে। ফুলের গন্ধ আর পাখিদের কলরবে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যায়,—আর আদিবাসী সমাজ মহানন্দে বাসন্তী পূজায় মেতে ওঠে। তাদের বিশ্বাস, কঠোর হৃদয়হীন যমরাজের দয়াতেই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষেরা বাহা, সরুল, সহরুল বা 'বা-পূজা'র [Flower Festival] সুযোগ পেয়েছে।

❐

যমের বাহন

সুহৃদকুমার ভৌমিক

সূচনা

হিন্দুদের কাছে 'যম' সর্বাধিক বাস্তব দেবতা [মনে হয় পৃথিবীব সব ধর্মের, সব মানুষেব কাছেই]। অন্য দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা যায় ঠিক নেই—তবে যমের সান্নিধ্যে আমাদের একদিন আসতেই হবে। প্রসঙ্গক্রমে রামমোহনের সেই প্রবাদপ্রতিম গানের কথা স্মরণে আসে: 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর,/অন্যে লোকে কবে কথা তুমি রবে নিরুত্তর।' কার অভাবে বা কার প্রভাবে সেদিন কেন যে তুমি নির্বাক, জড়বৎ থাকবে একথার একটিই উত্তর--মৃত্যু বা যম। কঠোপনিষদে যম ও মৃত্যুকে এক করে দেখানো হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিভিন্ন শ্লোকে যম ও মৃত্যু-দেবতার স্থান একত্র। আবার মহাভারতে দেখা যায় যম, মৃত্যু ও কাল পৃথক সত্তা। বোঝাই যায়, যম সম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের চেতনায় বা লোকধারণায় বিস্তৃত ও বিশ্লিষ্ট। কিন্তু যমের অস্তিত্ব দৃঢ়। তারপর লোকমানসে এই যমধারণা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে—একেবারে ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদ্, মহাভারত ও পুরাণ ছাড়িয়ে বর্তমান লোকসমাজ পর্যন্ত, তার ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। পরবর্তীকালে সাধারণ লোকমানস প্রিয় দেবতাদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের কথা ভেবেছে—এবং কেন শেষপর্যন্ত যমের বাহন হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে 'মহিষ', এরও নেপথ্য-ইতিহাস আছে। বলাবাহুল্য শেষোক্ত প্রস্তাবের সমালোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

বৈদিক ধারণা অনুসারে যম মৃত আত্মাসমূহের অধীশ্বর। বেদে যমদেবতাকে বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে;—কখনো সূর্যের সঙ্গে, কখনো বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে। মৃত্যুর পর যমপুরীতে যাওয়ার সময় আত্মাসমূহকে দুটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন কুকুরের সামনে দিয়ে যেতে হয়।

বেদে যমদ্বারবর্তী দুই কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি : হে মৃত! এ যে দুই কুক্কুর, যাদের চার চার চক্ষু ও বর্ণ বিচিত্র, এদের নিকট দিয়ে শীঘ্র চলে যাও। তারপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোব যমের সঙ্গে সর্বদা আমোদ-আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়ে তাদের নিকট গমন কর। [১০]। হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে যাদের চার চার চক্ষু, যারা পথ রক্ষা করে এবং যাদের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হতে হয়, তাদের কোপ থেকে এ মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজন! একে কল্যাণভাগী ও নিরোগী কর। [১১]। সেই যে দুই যমদূত যাদের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ

পশ্চাৎ গিয়ে থাকে, তারা যেন আমাদের অদ্য এ স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে। যেন আমরা সূর্যের দর্শন পাই।[১২]। ব্লুমফিল্ড সহ বহু পণ্ডিত মনে করেন, এই দুই কুকুর মূলত প্রতীক। সূর্য ও চন্দ্রের রূপক মাত্র। কোথাও কোথাও মহিষকেও যমদূত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই যমদূতই বাহনে রূপান্তরিত হয়েছে। সেইজন্য কত রকমের যমদূত আছে—জানা দরকার।

যমদূত হিসাবে একাধিক পাখির উল্লেখ আছে। তারাই যমের পূর্বে পূর্বে আগমন করে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে দশম মণ্ডলের ১৬৫ সংখ্যক সূক্তটি স্মরণীয়। সেই সূক্তে যমদূতস্বরূপ কপোত ও পেচককে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূক্তের চার সংখ্যক মন্ত্রে যম ও মৃত্যুকে এক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পেঁচকের ডাক লোকধারণায়ও অশুভ বলে ধরা হয়। এই সূক্তের টীকায় বলা হয়েছে 'এ সূক্ত পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশের মন্ত্র।' 'মানুষের মৃত্যুর পূর্বে পেচকের আগমন' [উলূক বা owl] আমাদের মগ্নচৈতন্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাছাড়া মানুষের মৃত্যু হলে তার আত্মা যে পাখি—বিশেষত কাক হয়ে ঘুরে বেড়ায় এ ধারণাও আমাদের গ্রামজীবনে রয়েছে। মৃত্যুদিন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত এই লোকাচার খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে একটি ক্ষীণ মিশরীয় স্মৃতি মনে আসে। যে-কোনো কারণে হোক এ লোকাচারটি হারিয়ে যায়নি। তা ছাড়া প্রাচীন মিশরে মৃতের আত্মা [KA] কা অর্থাৎ একটি পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যেত এবং তা মমির কাছে বসে থাকত। তাম্রলিপ্ত অঞ্চলের লোকধারণায় মৃতের আত্মা একটি নতুন দাঁড়কাকে [ডমরা কাওয়া] রূপান্তরিত হয়ে যায়। শ্রাদ্ধ পর্যন্ত প্রতিদিন পুষ্করিণীতে ভাসিয়ে দেওয়া পিণ্ডের দিকে আত্মীয়স্বজন অধীর আগ্রহে লক্ষ্য করে, কোনো দাঁড়কাক তা খাচ্ছে কিনা। অবশ্য এই জাতীয় লোকধারণা বাঙলা দেশের সর্বত্র প্রচলিত। সাধারণের ভাষায় মৃতের প্রতি ঐ পিণ্ডদানকে বলা হয় 'কাকবলি'।

আমাদের এই প্রসঙ্গের পশ্চাতে রয়েছে মৃত্যু বিষয়ক লোকধারণার তুলনামূলক বিচার। পৃথিবীর সবদেশেই মৃত্যু বিষয়ক ধারণা প্রখর।

এই প্রসঙ্গে বলি যে, সারা বিশ্বে যম-চিন্তার যতখানি বিস্তার রয়েছে তাঁর বাহন মহিষ সম্বন্ধে তত নয়। ঋগ্বেদে যমের সহচর বা দূত হিসাবে উলূক [পেচক], কপোত, ভীষণাকৃতি কুক্কুর ইত্যাদির বর্ণনা থাকলেও মহিষের প্রসঙ্গ নেই। বরং মহিষের প্রতি [মৃগ-মহিষ] অসম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। সামান্য জন্তু হিসাবে তাকে কেটে খাওয়া হয়েছে [দ্রষ্টব্য ৫/২৯/৭]। আবার দশম মণ্ডলে যেখানে মৃত্যুদেবতা বা যমের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে মাত্র একবার প্রসঙ্গক্রমে মহিষের কথা বলা হয়েছে [১০/২৮/১০ : 'যদি মহিষ রুদ্ধ হয়ে তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তাহলে গোধা তার জন্য জল আহরণ করে দেয়।']।

ঋগ্বেদে 'যম' দেবতার উল্লেখ প্রায় ৫০ বার থাকলেও তাঁর বাহন মহিষের কল্পনা সম্ভবত তখনও হয়নি। বরং কুকুর, কপোত, উলূক প্রভৃতি জীবের সঙ্গে যমের সম্বন্ধ রয়েছে এমন দেখা যায়।

দশম মণ্ডলের ১৩৫ সংখ্যক সূক্তে যম দেবতা এবং ঋষি যম-পুত্র কুমার। সেই মন্ত্রে দেখি তিনি মহিষের উপর উপবিষ্ট নন। বরং দেখি তিনি একটা পল্লবিত ঝাঁকড়া গাছের ডালে বসে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সোমরস পান করছেন।

যমের বৈদিক যে বিবরণ পাই—তাতে মহিষের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক দেখি না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যম-বিষয়ক পুরাণে যে সমস্ত বর্ণনা আছে, সেগুলোতে দেখা যায় বিভিন্ন জীবজন্তুর উল্লেখ আছে—কিন্তু মহিষের নেই। গ্রীক ও ভারতীয় পুরাণের মধ্যে যে কিছু সাদৃশ্য আছে সেসব জায়গাতেও যমের সঙ্গে মহিষের সম্পর্ক পাই না।

বৈদিক যমকে যদি প্রাকৃতিক শক্তির এক ব্যক্তিত্ব-আরোপিত [personified] কল্পনা বলে মনে করি, কিংবা যদি মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্র-এর অবস্থান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত কোনো সংস্থান মনে করি, তবে দেবতা হিসাবে তাঁর বাহনের কথা তখনও ভাবনার মধ্যে আসেনি।

উপনিষদের সময় দেখি, যম সম্পূর্ণ দেবতা হিসাবে স্বীকৃত এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা-সমূহের নিয়ামক। সেখানে তিনি এক মহান বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত। কঠোপনিষদে দেখা যায়, বাজশ্রস মুনি তাঁর শিশু পুত্র নচিকেতাকে মৃত্যুর নিকট সম্প্রদান করেন। তখন নচিকেতা ভাবলেন—যমের নিকট পিতার এমন কি প্রয়োজন যা আমার দ্বারা সম্পাদিত হবে [এখানে লক্ষণীয় মৃত্যু ও যম অভিন্ন]। নচিকেতা যমের গৃহে উপস্থিত হয়ে জানলেন—যম কর্মোপলক্ষে বাইরে গেছেন। তখন বালক নচিকেতা অভুক্ত অবস্থায় তিন দিন তিন রাত্রি তাঁর বাড়ির দাওয়ায় অপেক্ষা করার পর, যম যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন মহিষের পিঠে চড়ে আসেননি। নচিকেতার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তা উল্লেখিত হয় নি।

মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে যমকেন্দ্রিক বহু কাহিনী আছে। সেগুলির মধ্যে কোথাও যমের বাহন মহিষের কথা নেই। মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে, অশ্বত্থদণ্ডধারী ব্রাহ্মণের বাড়িতে যম, কাল ও মৃত্যু তিনজন উপস্থিত হয়েছিলেন।

মহাভারতের এই কাহিনী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ যম, মৃত্যু ও কাল আমাদের কাছে একই শক্তি। কারণ কালস্রোতে প্রতিটি জিনিসের মুহূর্তে মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়াই মৃত্যু। যাই হোক, এখানে যম, কাল ও মৃত্যুর সঙ্গে কিভাবে এসেছিলেন জানা যায় না। কিন্তু কারোরই বাহন হিসাবে মহিষকে দেখি না।

মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতেও যমরাজ সাবিত্রীর কাছে মহিষের পিঠে চেপে আসেন নি। প্রায় সমরূপ চিত্র দেখি মৎস্যপুরাণে। সেখানে সত্যবানের প্রাণপুরুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাগত ধর্মরাজকে সাবিত্রী দেখলেন : 'সেই প্রভু নীলপদ্মের পাপড়ির মত শ্যামবর্ণ পীতবস্ত্রধারী যেন বিদ্যুল্লতাবেষ্টিত জলভারাক্রান্ত মেঘ। তিনি সূর্যবর্ণের মুকুট ও কুণ্ডল শোভিত, বক্ষঃস্থলে হার ও বাহুতে অঙ্গদভূষিত, কাল ও মৃত্যু তাঁর অনুগমন করছে।' [অনুবাদ : ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য] এখানে কাল ও মৃত্যুকে যমের অনুচর হিসাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। এরই পাশে পাশে এই পুরাণেই প্রতিমা-লক্ষণ বর্ণনায় প্রদীপ্ত অগ্নির মত চক্ষু মহিষ ও চিত্রগুপ্তকে তাঁর অনুচর হিসাবে পাচ্ছি। [মৎস্যপুরাণ ২৬১/১২-১৪]।

এইভাবে মাত্র পুরাণের যুগেই যমের বাহনের অবয়ব গড়ে উঠল। কিন্তু কেন মহিষ যমের বাহন : এখানে পাচ্ছি [ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ] যমের নাম ধর্মরাজ, শাসন, কৃতান্ত, দণ্ডধর ও কাল। ধর্ম ও যম এখানে পৃথক। ধর্মের অংশে যমের জন্ম। যিনি বিশ্বকে ধারণ করেন তিনিই ধর্ম বা সূর্য অথবা সূর্যাগ্নির তেজ। যম তাঁরই অংশ। যমের বাহন মহিষ :

'রুদ্রৌজঃ সম্ভবং ভীমং কৃষ্ণবর্ণং মনোজবম্।
পৌণ্ড্রকং নাম মহিষং ধর্মরাজস্য নারদ।'

[বামন পুরাণ : ৯/৬]

[অর্থ : রুদ্রের তেজসম্ভূত ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মনোগতিসম্পন্ন পৌণ্ড্রক নামে মহিষ ধর্মরাজের বাহন।]

রুদ্র হলেন সূর্য। তাঁর তেজ থেকে জাত কৃষ্ণবর্ণ মহিষ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মত ঘন কালো মেঘ ছাড়া আর কি? যাঁরা সূর্য ও যমকে একাকার করে দেখেছেন তাঁদের চোখে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পিঠে চেপে যাত্রার মাধ্যমে মহিষের ধারণা আসা স্বাভাবিক।

ইন্দ্রদেবতার কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রের বাহন হাতি যার নাম 'ঐরাবত'—তার কল্পনা করি। মূলত ঐরাবত শব্দটি ইরা শব্দ জাত। ইরা শব্দের অর্থ হল জল। পঞ্জাবের ইরাবতী নদী প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়। ঐরাবত অর্থাৎ জলপূর্ণ এই ধারণায় শব্দটি গৃহীত হয়েছে। হাতিও তার শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে দেয়। ঠিক এমনিভাবেই যমের বাহন হিসাবে মহিষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মহিষ শব্দের মৌলিক অর্থ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ অথবা তেজঃ। যেমন মহিষী মানে প্রধানা, রাজপত্নী। মহিষাসুরের অর্থ শ্রেষ্ঠাসুর বা তেজোযুক্ত অসুর। এমনকি পশু অর্থে মহিষ কথার আসল মানে বৃহৎ বা প্রধান পশু। মনে হয় শব্দটি আদিতে মহঃ ছিল। ঋগ্বেদে শুধু 'মহিষ' শব্দ থাকলেও 'মৃগ-মহিষ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে দুবার [৯।৮৭ ও ৯।৯২।৬ সূক্তে] সেখানে মৃগ শব্দের অর্থ পশু। মূলত মৃ = মর এবং গ = যা মৃত্যুতে গমন করে। অর্থাৎ যে-কোনো মরণশীল জীব। সেই অর্থে মৃগ-হস্তী [অর্থাৎ হস্তের মত অঙ্গ যুক্ত জীব]। স্মরণীয় ঋগ্বেদে [৪।১৬।১৪] শ্লোকে ইন্দ্রের ক্ষমতাকে মৃগ-হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

যমের বাহন যে মহিষ—এর উৎসও ঐ নামশব্দটি। মহিষ শব্দ দৃঢ়তা, অপরিবর্তনীয় শক্তির প্রকাশক। মহিষারূঢ় যম এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিলেন। যম কালের প্রতীক এবং অপ্রতিরোধ্য; যেমন সোমবারের পর মঙ্গলবার আসবে—তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। এইরকম এক অপ্রতিরোধ্য-ক্ষমতায় আসীন বলেই যম মহিষারূঢ়, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার দ্বারা যিনি বাহিত হন। কিন্তু Folk-etymology বা লোকধারণায় পরবর্তীকালে তিনি অবয়ব লাভ করেছেন। মূর্তি নির্মাণে যমকে তাই অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রতীক মহিষের উপর স্থাপিত করা হয়েছে।

যম বা মৃত্যু, যা-ই হোক না কেন তাঁকেস্বীকার করে নিতে বাধ্য হই। তাঁকে তাই ভীতির সঙ্গে গ্রহণ না করে সাদরে গ্রহণ করাই ভালো। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি তাই বলেছিলেন: 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' বলেছিলেন—মৃত্যুই হল শান্তি পারাবার। মর্ত্যের সমস্ত-বন্ধন ক্ষয় করে, অনন্ত বিশ্ব তার বাহু মেলে দিয়ে মহা অজানায় নিয়ে যাবে নির্ভয়-পরিচয়ের সঙ্গে। আমাদের সর্বদাই মনে হয় :

'পণমহ জমসস চলনে কিং কজ্জং দেব এহিং অন্নেহিং।'

—যমের চরণে প্রণাম জানাও, কি কাজ অন্য দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে।

সংযোজন : সম্পাদক :

ওপরে প্রবন্ধকার যথেষ্ট পারদর্শিতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন মহিষ কেন যমের বাহন হলো— এবং এই কারণ-নির্ণয়, ভাববাদী দৃষ্টিকোণ বা ভক্তের আবেগ থেকে করা হয়নি। তবু এর পরেও কয়েকটি কথা যোগ করা যেতে পারে। যেমন :

১. ঋগ্বেদ থেকে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পুরাণ পেরিয়ে যম অমোঘ মৃত্যুকে বহন করে নিয়ে এলেও মূর্তি গড়িয়ে যমের পুজোর সংখ্যা বলা যেতে পারে অঙ্গুলিমেয়—যদিও যম-ভীতি সবারই।

২. ঋগ্বেদের যম আর পুরাণের যম এক নয়। ঋগ্বেদের যম নরকের অধিকর্তা নন;—ইনি পিতৃলোকের অধিকর্তা, পুণ্যকারীকে তাঁর সুকৃতির জন্য পুরস্কৃত করেন, পিতৃগণের সঙ্গে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। [ঋগ্বেদ : ১০/১৪/৪]।

৩. 'পুরাণে যম মৃত্যু-দেবতা, নরকের অধিপতি এবং দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর—দশদিক্‌পালের অন্যতম।'

৪. 'যম শব্দের অর্থ যুগ্ম'—এই যুগ্মতা কিসের? আলো-অন্ধকারের, জীবন-মৃত্যুর?

৫. যমের বাহন মহিষ হওয়ার আরও দুটি কারণের উল্লেখ করা যায়। প্রথম :

৫.১. প্রাণীতত্ত্বের বিচারে মহিষের রক্ত উষ্ণ—তাই সে শীতের কটা দিন বাদে খানা-ডোবায় গা ডুবিয়ে বসে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে থাকে— নিজের দেহের তাপকে প্রশমিত করে—আর অগ্নি বা যম তাপশক্তিরূপে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংযমিত বা নিয়ন্ত্রিত করেন [অগ্নি ওরযে যম জলপ্রবাহের ন্যায় ইতস্তত জ্বালা প্রেরণ করেন। ঋগ্বেদ : ১। ৬৬। ৫]। এই তাপনিয়ন্ত্রণ সাদৃশ্যে মহিষ যমের বাহন কল্পিত হয়েছে।

৫.২. যম শস্য-উৎপাদকের সহায়ক, আর মহিষও হাল টেনে, ফসলবাহী গাড়ি টেনে কৃষককে সাহায্য করে। তাই মহিষই তো এমন দেবতার যোগ্য বাহন হতে পারে। আসলে যম হচ্ছেন প্রজননের দেবতা—সে সন্তান হতে পারে এবং শস্যও। আর মহিষ ঐ গুণকর্মের [দ্বিতীয়ের] সহায়ক হিসাবেই বাহনের মর্যাদা পেয়েছে।

৫.২.১. 'যাস্ক-এর মতে যম শব্দের অর্থ সংযমন বা নিয়ন্ত্রণ। সূর্যরশ্মি জগৎকে সংযমিত করে—গ্রীষ্ম-বর্ষা ইত্যাদি ঋতু নিয়ন্ত্রণের দ্বারা, জলগ্রহণ ও জলদানের দ্বারা। অতএব সূর্য রশ্মিই যম [ঐ : ১০। ২০। ৫]। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডল ৬৬ সূক্ত ৪-৫ ঋক মতে 'যা জন্মেছে ও যা জন্মাবে সে সমস্তই অগ্নি ; অগ্নি কুমারীগণের জার [উপপতি] ও বিবাহিতা স্ত্রীর পতি ['যমকে কন্যাগণের জার ও বিবাহিতা রমণীদের পতি বলার তাৎপর্য কি? অগ্নির সন্নিকটে কুমারী কন্যাদের বিবাহকালে—কুমারীত্বের বিনাশ ঘটে; অতএব যম বা অগ্নি কন্যাদের জার। আর বিবাহের পরে পত্নী পতির সঙ্গে অগ্নিতে হবিঃ প্রদান করে। সুতরাং এক্ষেত্রেও অগ্নি বিবাহিতা রমণীর পতি' (ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য : 'হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' : ১ পর্ব : পৃ. ২৯৭-৮)]।

৫.২.২. এই অনুষঙ্গে আরো একটি বিষয় ভাবা যেতে পারে। অভিধানকার [হরিচরণ: পৃ. ১৭৫৩] 'মহিষ' শব্দের আরো অর্থ উল্লেখ করে বলেছেন যে : 'মহিষ' অর্থে 'সৈরিন্ধ্রী' ['দস্যু হইতে আয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্য স্ত্রীতে জাত সন্তান' এবং 'ব্যভিচারিণী'। অতএব অগ্নির 'জার যে স্ত্রীতে বিবাহিত-স্বামী যখন দ্বিতীয়বার উপগত হন তখন সে তো 'সৈরিন্ধ্রী' এবং 'ব্যভিচারিণী'। তাই যমের বাহন হয়েছে মহিষ। পৌরাণিক যুগে এসে গবাদি পশুর অন্যতম সদস্য হিসাবে ঐ মহিষ যমের বাহন।]

যম : কলকাতায়

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

'যম জামাই ভাগনা
তিন হয়না আপনা'

জামাই ও ভাগনার পরিচয় আমরা জানি : কিন্তু এই 'যম' কে? বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিধির মধ্যে—'যম' সম্পর্কে নানান রকমের ধারণা রয়েছে; যেমন যম মানুষের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করে এবং এ পৃথিবীতে সময় শেষে অর্থাৎ পরমায়ু শেষ হলে 'যমরাজার' দূত এসে মানুষের আত্মাকে নিয়ে যায়। যমরাজের দরবারে বিচার হয়, মৃত ব্যক্তির আত্মা নরকে যাবে না স্বর্গে যাবে। প্রত্যেকটি মানুষের সারাজীবনের কৃতকর্ম যমরাজার মন্ত্রী চিত্রগুপ্তর খাতায় সব লেখা থাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা যমরাজার দরবারে বিচারের পর জীবনের কাজ অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ধূর্ত মানুষ মৃত্যুর পর যমরাজার দরবারে গিয়ে কিভাবে যমরাজকে পর্যন্ত বিপদে বা বিপাকে ফেলেছে তা নিয়ে নানারকম গল্পকথা প্রচলিত আছে।

মৃত্যুর পর প্রতি ব্যক্তির আত্মাকে 'যমরাজার' দরবারে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এই ধারণা গ্রাম, এমনকি শহুরে মানুষ আজও বিশ্বাস করে। ছোটবেলায় 'গোলকধাম' খেলার মধ্য দিয়ে এইরকম একটা সামাজিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। যেমন ঐ খেলায় ছিল, যে মিথ্যা কথা বলেছে যমরাজার দূতরা তার জিব টেনে কেটে দিচ্ছে। ঐ রকম ছকের খেলায় ছবিও দেওয়া থাকত। চোরকে গরম তেলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। খেলার মধ্য দিয়ে যমরাজার বিচার দেখানো হত, এইভাবে লোকশিক্ষার প্রসার ঘটত।

যমরাজার সম্পর্কে অনেক ধর্মীয় গল্প রয়েছে, যেমন বাংলার মেয়েদের সূর্যপূজা বা ইতু পূজার ব্রতকথায় আছে;— যম আর শনি দুই ভাই—সূর্যদেবতা তাদের পিতা। একদিন পুজোর সময় শনি পুজোর উপকরণ নিয়ে বাবার কাছে এসেছে, যম সঙ্গে নেই। সূর্যদেব বললেন, 'আমার যম কোথায়', শনি বললেন, 'তার কুড়ি-কুষ্ঠি-মহাব্যাধি হয়েছে, তাই সে মাঠে পড়ে চেঁচাচ্ছে'—তারপর সূর্যদেবতা যমকে উদ্ধার করলেন আর সৎমার পরিচয় পেয়ে আসল মার সন্ধান হল; যিনি সূর্যদেবতার ভয়ে উত্তরমেরুর মাঠে ঘুড়ীরূপ ধরে ঘুরছিলেন। এইসব ঘটনা দেখে সাধারণ মানুষ সূর্য পুজো শুরু করল,—সুখ সমৃদ্ধি লাভের আশায়। এই ইতুপুজোয় যেমন যমকে পাওয়া যায়, বাংলার ঘরে ঘরে অঘ্রান মাসে, তেমনি উড়িষ্যাতে আছে *সাবিত্রীব্রত।* জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় সধবা স্ত্রীরা এই ব্রত করেন। বটগাছের তলায় ঘট স্থাপন করে সূর্যকে স্মরণ করে, যমদেবতা, দেবী সাবিত্রী ও সত্যবানের পুজো হয়। পুজোর উপকরণে শিলনোড়া,

ধান, নববস্ত্র, পঞ্চগুড়ি, আম, কাঁঠাল, শশা, ঝুনা নারকেল, কলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হয়। এই ব্রতে যমরাজার স্তুতি করে পাঁচবার অঞ্জলি প্রদান করেন মহিলারা,—তা হল :

" ওঁ যমায় পাশহস্তায়—
মহিষবাহনায় চ
সর্বজীবাপহারায়
নমঃ দেব সতান চ।

এই যমরাজার পূজা দেবী সাবিত্রী ও সত্যবানের সঙ্গে পুরোহিত দর্পণে লেখা আছে। কিন্তু বাংলার লোকায়ত পূজা-পার্বণে যমরাজা কেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না তাব একটা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ঈশ্বরের কাছে পূজার মাধ্যমে ভক্তরা কিছু মনস্কামনা পূরণ করেন। আর যম-দেবতা ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন না, তিনি শুধু বিচারক মাত্র। কলকাতা শহরের চারিদিকে এই প্রশ্নের উত্তরের সমীক্ষায় প্রমাণিত হল যে, একথা সত্য নয়। উত্তর কলকাতার বাগবাজার এলাকায় ১২১২ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক মন্দিরে যমরাজের নিয়মিত পূজা-পাঠ হয়। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় ক্ষীরগাঁয়ের বাসিন্দা কালীশরণ মুখোপাধ্যায় কর্ম উপলক্ষে কলকাতায় এসে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে যমরাজার বড় মূর্তি স্থাপিত হল মা ভবতারিণীর মূর্তির ডান দিকে; আর বাঁয়ে বসল বড়ঠাকুর—শনি।

কালীশরণ বাবু ও তাঁর পুত্র অমূল্যরতনের ঈশ্বরভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে এবং শোভাবাজারের রাজবাড়ির লোকেদের ঔষধ দিয়ে বসন্তরোগ থেকে বাঁচিয়েছিলেন বলেই রাজা খুশি হয়ে ঐ মন্দিরের স্থানটুকু দানপত্র করে দেন।

বাগবাজার মন্দিরের পুরোহিত, তাঁর ডান দিকে লেখক

প্রতি বৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন যমরাজের ঘটা করে পুজো হয়, অন্নভোগ হয়। চাল, মাষকলাই, হলুদ, ঘি, আনাজপত্তর সব একসঙ্গে মিশিয়ে খিচুড়ি বা পোলাওর মত তৈরি করে প্রসাদ হিসাবে ভক্তদের বিতরণ করা হয়। এবং ভক্তরা সকলেই কারোর কারোর বোন-ভাইদের মঙ্গল কামনায় যমের দোরে কাঁটা দিতে, যমরাজকেই সন্তুষ্ট করতে ছুটে আসেন। মনে মনে তাঁরা ছড়া বলেন [এটাই মন্ত্র] :

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দোরে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দি আমার ভাইকে ফোঁটা।
ভাই যেন হয় সোনার ভাঁটা'।

ভাইদের মঙ্গল কামনায় যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে যমরাজকেই পুজো দেওয়া হয়। অতএব জনজীবনে যমরাজ অপাঙ্‌ক্তেয় নন। তা ছাড়া মৃত্যুর দেবতা 'যম' জীবনদান ও সুরক্ষায় সক্ষম।

বাগবাজারের উক্ত মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত বা সেবাইত শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন, বুধবার যমরাজার বার। ঐ দিন পুজো দিলে যে-কোনো কঠিন রোগ ভাল হয়। এই বিশ্বাসে দূর-দূরান্ত থেকে, এমনকি বিহার, আসাম, উড়িষ্যা থেকে পর্যন্ত ভক্তরা এসে এই মন্দিরে যমরাজার পুজো দেন, বলি দেন। পশুবলি এই মন্দিরে হয় না, তার বদলে আখ, চালকুমড়ো, কলা, শসা প্রভৃতি বলি হয়। যমরাজার ভোগে নুন চলবে না কারণ যম রাজার সঙ্গে সম্পর্ক মধুর না হয়ে নোনতা হলে মৃত্যু রুখবে কে? ভোগের উপকরণে মধুর সঙ্গে কারণবারিও চাই, রাজার ভোগ রাজকীয় না হলে চলবে কেন? প্রতি ২৭ ফাল্গুন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে মা ভবতারিণীর পুজোর সঙ্গে যমরাজার পুজো-অর্চনা খুব ধুমধাম করে হয়ে থাকে।

পরেশনাথবাবু বললেন যমরাজার ভক্ত এই শহরে দিন দিন বেড়ে চলেছে, আগতভক্তদের নানা প্রকার দান-দক্ষিণার ওপর নির্ভর করেই ত তাঁর মন্দিরের সেবাকার্য নির্বাহ হয়। পরেশবাবুর গুরুদেব স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের কাছে তিনি শুনেছেন যে, পুরীতে, কামাক্ষ্যাতে যমরাজের বড় মন্দির আছে এবং এক সময়ে কালীঘাটেও ছিল।

'যমরাজ' যেভাবে এই শহরের মানুষের মনে রেখাপাত করেছেন তাতে লোকায়ত দেবতা হিসাবে বিভিন্ন মন্দিরে যমদেবতার প্রতিষ্ঠা হতে আর খুব দেরি নেই। ধর্ম মানুষের একান্ত আপন চিন্তার ও বিশ্বাসের ক্ষেত্র। সেই সূত্রে যম কলকাতায় মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছেন।

❒

যম-নরক : পশ্চিমে

চিদানন্দ ভট্টাচার্য

আকাশ ও পাতাল, মাঝখানে মর্ত্য-পৃথিবী; ক্রমে স্বর্গ নরক, আর দুয়ের মধ্যে পার্থিব জীবন: 'মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেই সুরাসুর'—এই মনোভাব আধুনিক যুগের,—সভ্যতার ইতিহাসের দৈর্ঘ্যের বিচারে মাত্র গতকাল, অর্থাৎ রেনেসাঁসের সময় থেকে।

ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন কল্পনা যেমন দ্যৌঃ, অন্তরীক্ষ, সপ্তদ্যাবা পৃথিবী এবং মৃত্তিকাতলবর্তী তল, তলাতল, পাতাল, রসাতল ইত্যাদি জাগতিক স্থানের ঠিকানা দিয়েছে, ঠিক তেমনই ইউরোপের নানান জাতিবলয়ের বিভিন্ন ধর্ম ও অধ্যাত্মচিন্তায় তাদের বহু পুরোনো, ইতিহাস-পূর্ববর্তী জ্যোতিষ-ধারণা ও কল্পগাথার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু একটি বিশেষ জায়গায় এই দুই [ভারতীয় এবং সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য] সংস্কৃতির ভিন্নতা প্রকট। ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যে 'যম' [শব্দটির অভিধানগত অর্থ : ✓যম্ + অ (অচ্)-ক। যমজ, যুগল, দ্বয়। (অক্) ভাববাচ্যে। উপরম, নিবৃত্তি, নিগ্রহ, সংযম, আত্মসংযম, দম ইত্যাদি।] পরম ভগবৎ-সত্তার একটি বিশেষ প্রকাশ মাত্র। তাঁর দেবত্ব পৌরাণিক, কিন্তু তাঁর ব্রহ্ম-সাযুজ্য স্বতঃসিদ্ধ। মহাভারতে তিনি যুধিষ্ঠিরকে দেখা দেন, কিন্তু তাঁর নিয়তি রূপটি আসলে ধর্মাধীন, তাই ধর্মরাজ। নচিকেতার ঈশ্বরস্থান প্রয়োজন হলে এই ধর্মরাজের আশ্রয় নিতে হয়।

পৃথিবী-স্বর্গ-নরক-এর এই তুরীয়বাদী এক-ঈশ্বর-অধীনতা কিন্তু পাশ্চাত্যের ধর্ম-সাহিত্যে এতটা মজবুত নয়, যদিও খ্রিস্টীয় দর্শনে এই একীকরণ করার চেষ্টা হয়েছে খানিকটা। তবু শয়তান ও তার বিদেহী আত্মামাত্রেরই নরক গন্তব্যস্থল নয়। এর কারণ খুব গভীরে। সুপ্রাচীন যুগে লোককাহিনী ও বিশ্বাসগুলির উৎস ছিল ভিন্ন ভিন্ন। জনজাতি-চলাচল ও সময়ের বিবর্তনে গল্পগুলির মেশামেশি ও রসায়ন হয়তো হয়েছে, কিন্তু একটা বর্তুলাকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে 'স্বর্গ-নরক-পৃথিবী' একক ভাবে জন্ম নিতে পারেনি। ইউরোপের সব থেকে শক্তিশালী তিনটি ধারার মধ্যেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ : স্ক্যান্ডিনেভীয়, গ্রীকো-রোমান [ক্লাসিকাল] এবং খ্রিস্টীয়।

প্রথমেই বরং ক্ষীণতম ধারাটির কথা সেরে নেওয়া যাক। স্ক্যান্ডিনেভীয় ধারাটি 'টিউটন' জাতিসত্তা ও সভ্যতারই উত্তরাংশের রূপ। এর অপর নাম নর্ডিক অর্থাৎ উত্তরের। টিউটন-দের ধর্মচিন্তা অতীন্দ্রিয়তায় বা তুরীয়বাদে পৌঁছায়নি। তাঁরা প্রকৃতি-নির্ভর ধর্মের আলগা আশ্রয়ে থাকতেন একথা বললে খুব একটা অনৃতভাষণ হবে না। এঁরা খ্রিস্টপূর্ব অন্যূন দুই-সহস্রাব্দ যাবৎ ইউরোপে নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানায় স্থায়ী সভ্যতার আমানত বজায় রেখে এসেছেন এবং তারপরেও এ সভ্যতা মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে প্রসারিত— যত দিন না এঁরা খ্রিস্ট-ধর্মের অধীন হয়েছেন।

টিউটনীয়দের মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস বা সে-সম্পর্কে ধারণা ছিল না। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার 'হেল' শব্দটি নর্ডিক, এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—তিন প্রকার। যার প্রত্যেকটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত : ক. লুকোনো জায়গা, খ. কু-কর্ম অনুষ্ঠানের জায়গা, এবং গ. কু-কর্মের কারণে শাস্তি পাবার জন্য নির্দিষ্ট স্থল। 'হেল' টিউটনদের কাছে মৃত্যুপরবর্তী নরক ছিল না। বর্তমান অর্থটি শব্দটির খ্রিস্টীয় সংজ্ঞা হিসেবে অভিযোজিত হয়েছে মধ্যযুগের কোনো এক সময়ে—খ্রিস্টধর্মে অভিবাসনের পরে। তবে সেই অর্থে নরক না থাকলেও ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার অস্তিত্ব ছিল জনমনে। প্রাচীন লোকায়ত বিশ্বাসে 'ট্রোল' নামক প্রেতিনীর কাহিনী বিদ্যমান, যদিও তা মানুষ-মরা ভূত নয়, অনেকটা দানব আর ভূতের সংমিশ্রণ। খাল-বিলের থেকে উৎপন্ন মিথেন-জাতীয় গ্যাস 'বেওয়া' নামক অপার্থিব শক্তির নাম নেয় আদিম কল্পনায়। এই 'বেওয়া' কোন কাহিনীতে যম-সুলভ অন্ধকারের শক্তি, মৃত্যুর রূপকার। আবার কাহিনী-অন্তরে, অন্য উপাখ্যানে, সে সূর্য-দেবতা যা অন্ধকার ও বায়বীয় গ্যাস নাশ করে ও জীবন রক্ষা করে।

স্ক্যান্ডিনেভীয়দের, বা তদর্থে টিউটনীয় বা জারম্যানিক জনজাতির, নিয়তির নাম হচ্ছে 'উইর্ড', যার থেকে আধুনিক ইংরেজি বিশেষণ 'উয়্যার্ড'। গা-ছমছমে, অদ্ভুতুড়ে। জীবনভর এই উইর্ডের সঙ্গে প্রত্যেক টিউটনের সংগ্রাম। উইর্ডসমগ্র প্রকৃতির নিয়ন্তা, তাই গোটা প্রকৃতিই মানুষকে শেষ করে দিতে উদ্যত। যাবৎ বাঁচি, তাবৎ সংগ্রাম। এই বিষণ্ণ উপলব্ধি সারা টিউটন জাতির সত্তার গভীরে প্রোথিত। ওল্ড ইংলিশ মহাকাব্য 'বেওউল্ফ'-এ এই নিয়তিকে স্বীকার করে বলা হচ্ছে : 'গেয়াথ আ উইর্ড সোয়া হে উইল্', অর্থাৎ 'অদৃষ্ট/নিয়তি সদা ধেয়ে চলে তার যথা ইচ্ছা'। এই উইর্ডের মধ্যে অদৃষ্ট ও নিয়তি এই দুইয়ের সীমারেখা বা বিভাজন স্পষ্ট নয়।

স্ক্যান্ডিনেভীয় উপাখ্যানে আরও পাওয়া যায় তিন রহস্যময়ী দেবী-দানবীর কথা। তাঁরা তিন ভগিনী যৌথভাবে মানবজীবনের ওপর নিয়ম জারি রাখেন, অর্থাৎ কিনা নিয়তি। নর্ড্, উর্ড্ এবং এস্ট্। এই উর্ড্-এর সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত বিমূর্ত 'উয়্যার্ড'-এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা বিবেচ্য। কিন্তু সেখানে আর ঢুকলাম না। লক্ষণীয় এই নর্ডিক ভগিনীত্রয় 'সাধারণ সংস্কার' [Popular superstition] হিসেবে কাহিনী ও লোকমানসে এতো পাকা আসন পেতেছেন যে খ্রিস্টীয় লোকজনের সাহিত্যেও পরবর্তীকালে এঁরা উঁকিঝুঁকি দিয়েছেন। শেক্সপীয়ার তাঁর 'ম্যাকবেথ' নাটকে যে তিন ডাইনী-বোনদের দেখিয়েছেন তাঁরা যেমন একদিকে গ্রীক লোকসংস্কারের "ফেট্স-সিস্টারজ' তেমনই [গবেষকরা দেখিয়েছেন যে] আবহমান-কাল ধরে চলে আসা টিউটনীয় 'নর্ডিক সিস্টারজ'। ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে—গ্রীক, ফিনিশিয়ান, ফ্রিজিয়ান ইত্যাদি জ্ঞাতি-জাতিগোষ্ঠীর—ইতিহাস-পূর্ব যুগ থেকে ধারণা ছিল যে, উত্তরদিক থেকে বয়ে আসা হাওয়া-জীবনের বীজ বহন করে আনে। এটা অসম্ভব নয় যে এ-বিশ্বাস নিওলিথিক বা নব্য-প্রস্তর যুগের, অর্থাৎ যে সময়ে 'আরিয়ান'দের দক্ষিণ শাখা থেকে 'জারম্যানিক' উত্তর শাখা তখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। এবং 'নর্থ' অর্থাৎ 'উত্তর' বায়ু জীবনের বীজ বহন করে এই বিশ্বাস টিউটনদের 'আরিয়ান'-পূর্ব-পিতারা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সে বিশ্বাস পরে থেকেই গেছে। 'নর্ড' ও 'নর্থ' শব্দ দুটি বৈদিক 'নৈর্ঋত' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিক। 'নর্ড' ভগিনী তাই জীবনের শুরুর দায়িত্বে। 'উর্ড্' শব্দটি বৈদিক 'উষস্' [উষা] শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত—এটি তাই জীবনের যাত্রার দ্যোতক। আর 'এস্ট' শব্দটি সংস্কৃত 'অস্ত' এবং ইংরেজি 'West' ও লাতিন 'Occi'-র সগোত্র। তাই এই তৃতীয় ভগিনী জীবনের অস্তায়নের দায়িত্বে—নিয়তির যম-অংশ!

মানুষ চিরকাল সবিস্ময়ে তার বাসযোগ্য পৃথিবীর সবটুকু পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। যুগে যুগে কালে কালে চলেছে তার অবলোকন। আর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তার বাসস্থানের স্বরূপ-চিন্তার সঙ্গে তার নিজের জীবনের সম্পর্ক-চিন্তা। সভ্যতার উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রথম সোপানগুলিতে তার বিজ্ঞান-চিন্তা ধর্মচিন্তার থেকে সেভাবে আলাদা হতে পারেনি। সেভাবেই আলাদা হতে পারেনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুটি ধারা—জ্যোতির্বিদ্যা ও ধর্ম-অতীন্দ্রিয়তা-নির্ভর জ্যোতিষশাস্ত্র [astronomy and astrology]। এর ফলে বহু সহস্র বৎসর ধরে মানবজাতির সভ্যতার অভিযান ব্যাহত হয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্য-কল্পনার লাভ হয়েছে বিস্তর এ কথাও সত্যি। বিজ্ঞানের আলো মিথ্-এর আলেয়ার পক্ষে অনেক সময়ই প্রাণনাশী। 'কল্প' হল গল্পের সার। মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায় এ ব্যাপারে অতীতের মানুষের ব্যাকুল উৎকণ্ঠাকে সামাল দিয়েছে নানা মাপের, নানা স্বাদের কল্পনা। সে কল্পনা কিন্তু আসছে, তার এই বিশ্ব-জগৎ-কে পর্যবেক্ষণের ফলে। সীমিত জ্ঞানের সীমিত পর্যবেক্ষণ-কে তৎক্ষণাৎ 'না' বা 'অলীক অসম্ভব' বলার মত সামর্থ্য তখনো বিজ্ঞানের হয়নি। বিজ্ঞানের আলো একটু একটু করে ফুটতে থাকলেও তাকে আলেয়ার মোহময় রঙ হিসেবে কল্পনা করতে বাধছে না। যেটা কিনা এই বিংশ-একবিংশ শতকে অসম্ভব সেটাই খ্রিস্টপূর্ব জগতের একমাত্র সম্ভাব্যতা।

গ্রীক পুরাণ-সাহিত্যে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। রোমক পুরাণ অনেকাংশেই গ্রীক পুরাণ অনুসারী, এবং এগুলি প্রায়শই সমোদ্ভব এবং এদের মধ্যে ছোটখাট ব্যবধান ও পাঠান্তর এত জটিল যে তার মধ্যে এই ছোট পরিসরে ঢুকে ন্যায়বিচার করা অসম্ভব। সুতরাং গ্রীকো-রোমক পুরাণ ও সাহিত্যে লোকগাথা ও কাহিনী এখানে একসঙ্গে 'ক্লাসিকাল মিথোলজি' হিসেবে আলোচনা করব। বিদগ্ধজন ক্ষমা করে নেবেন, আশা।

হোমার, হেসিয়দ, প্লিনি, হেরোদোতুস্ প্রমুখ সাহিত্য ও ইতিহাস রূপকার মূলত যে পৌরাণিক ধারার পৃষ্ঠপোষণা করেছেন তা হেলেনীয় সভ্যতার অলিম্পীয় রূপ। কিন্তু প্রাক্-হেলেনীয় সভ্যতার 'পেলাসজীয়' [Pelasgian] ধারা ছিল আদিরূপ। তার কিছুকাল পরে প্রেক্ষাপটে দেখা দেয় 'অরফীয়' ['Orphic' myths] ধারা। পেলাসজীয় ও অরফীয় ধারায় মানুষের জগৎসৃষ্টিসমীক্ষা এবং স্বর্গ-মর্ত্য-নরকের যে ধারণাগুলি আছে সেগুলি কাছাকাছি ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও প্রভেদ আছে। ঠিক তেমনি অলিম্পীয় পুরাণে সেই কাহিনীগুলি একটু অন্যভাবে দেখা দিচ্ছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গল্পটা একরকম হলেও ঘটনাক্রম, নির্দিষ্ট কোন একটি ঘটনা বা পাত্র-পাত্রীর নাম স্থানে স্থানে আলাদা। তথাপি 'পেলাসজীয়' ধারাটিই মূল এবং এটির গুরুত্ব অসীম, কারণ এই পুরাণ শুধু প্রাক্-হেলেনীয় গ্রীসেই নয়, ভূমধ্যসাগরের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বহু জ্ঞাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সাধারণ সংস্কার হিসেবে বিরাজমান ছিল বহুদিন যাবৎ। প্রাচীন গ্রীক, ফিনিশীয়, ফ্রিজীয়, কানানাইট, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, প্যালেস্তিনীয়, এমনকী হ্যামিটিক জাতিগোষ্ঠীর কোন কোন শাখা যেমন ইহুদীরা—এই জ্যোতিষ-নির্ভর পৌরাণিক 'স্বর্গ-মর্ত্য-পৃথিবী'-র আখ্যানে বিশ্বাসী ছিলেন। পেলাসজীয় মিথ্ থেকে অলিম্পীয় মিথে বিবর্তন সভ্যতার মাতৃতান্ত্রিক ধারা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় অভিষেকের ইতিহাস, কিন্তু সে কথা এখানে থাক।

কেমন করে সৃষ্টি হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল [পাতাল সবসময় এখানে নরক নয়, আবার নরকও সর্বদা পাতাল নয়]? পেলাসজীয় মিথ্ বলছে সুন্দরী ইউরিনোমি আবির্ভূত হলেন জগৎ-জোড়া মহাসিন্ধু-সদৃশ 'কেঅস' [Chaos] থেকে। সিন্ধু-মন্থনে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। ইউরিনোমি নামের মানেও খুব কাছাকাছি—'দূর চঞ্চলা'। যাই হোক, জীবনদায়ী উত্তরবায়ু তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে মহাসর্প অফিয়ন-এর রূপ ধরে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে পাক দিয়ে জড়িয়ে সম্ভোগ করলেন—ইউরিনোমি পারাবতের রূপ ধরে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করলেন। ডিম ফেটে একে একে বেরিয়ে এল সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-তারকা, পৃথিবী—তার সঙ্গে নদী, পাহাড়, গাছপালা ও প্রাণীকুল।

অরফীয় মিথ ও অলিম্পীয় মিথে কখনো কখনো একটু ব্যত্যয় দেখা দিচ্ছে। সৃষ্টির পুরাণে কখনো ইউরিনোমি থিতিস্ [ভারতীয় পুরাণের দিতি-র সঙ্গে মিল লক্ষণীয়] হয়ে দেখা দিচ্ছেন, অথবা 'মাতা পৃথিবী' নাম নিচ্ছেন। অফিয়নের নাম হয়ে যাচ্ছে ওশ্যানুস [সেই অর্ণব বা সমুদ্র—কারণার্ণব এবং শেষশায়ী সর্পযুক্ত নারায়ণ-এর কথা ভাবুন]। অবশ্য মাতা-পৃথিবীর সঙ্গে অলিম্পীয় আখ্যানে লিঙ্গিত হচ্ছেন পর্বতের স্বত্বাধিকারী ইউরানুস [ইউরেনাস]। তিনি নিজে সেই মাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টিধারার মাধ্যমে পৃথিবীর গোপন-অঙ্গে জীবনের বীজ সেচন করছেন। ইউরেনাস মিথ-কল্প হিসেবে ভারতীয় বরুণ-এর সগোত্র।

নরকের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ইউরেনাসের বিদ্বিষ্ট কর্মকাণ্ডে। ইউরেনাসের প্রথমদিকের সন্তানবৃন্দ সাইক্লোপ-রা, তাদের তিনি মাটির বহু নিচে সুদূর পাতালে তারতারুস্ নামক আলোহীন বিষাদময় এক জগতে বন্দী করে রাখছেন নিজের কর্তৃত্ব হারাবার ভয়ে, হেসিয়দ্ তাঁর 'থিয়জনি' গ্রন্থে ও আপোল্লোদোরুস তাঁর 'এপিতোমি'-তে এই উপাখ্যান স্মরণ করেছেন।

এবং এরই সঙ্গে জড়িত গ্রীক পুরাণের অন্যতম 'নিয়তি'—তিন 'এরিনিয়েস'-ভগ্নী বা 'ফিউরি'-ভগ্নী যাঁরা অদৃষ্ট/ নিয়তি ভগ্নীত্রয় [The Fates or Fates Sisters] বলেও পরিচিত। গ্রীক ট্রাজিডিগুলির সুবাদে এই Fates বা Destinies আমাদের কাছে অনেক চেনা ধারণা। এঁরা কিভাবে আবির্ভূত হলেন? ইউরেনাস সাইক্লোপ-দের তারতারুসে ফেলে দিলেন, যে তারতারুস এতই নিচে যে পৃথিবী থেকে একটা নেহাই ফেলে দিলে তার পড়তে পড়তে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে নদিন পুরো সময় লেগে যাবে [লক্ষণীয়, ক্লাসিকাল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মিল্টন-এর 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর প্রথম সর্গে সেয়্টান স্বর্গ থেকে ন'-দিন ধরে ক্রমাগত পড়ে পৃথিবীর তলার্ধেরও নিচে অবস্থিত 'কেঅস'-এর মধ্যে 'হেল'-এ পৌঁছে যাচ্ছে!]। পৃথিবী-মাতা তাঁর সন্তানদের এই অধোগতিতে বিষাদখিন্ন। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক স্বামী এতৎসত্ত্বেও জোর করে আরো সন্তান উৎপন্ন করলেন—তাঁরা তাইতান [Titans]। মা তাঁর দ্বিতীয়বারের সন্তানদের গোপনে প্ররোচিত করলেন পিতাকে আক্রমণ করতে। কনিষ্ঠ তাইতান ক্রনস্ [পূর্বে ক্রোনুস্], অর্থাৎ কাল বা সময়, সাতভাই তাইতান্দের নেতৃত্ব দিয়ে একটি কাস্তে দিয়ে পিতার লিঙ্গচ্ছেদন করলেন, যখন পিতা নিদ্রিত। তাঁর দেহ-নিঃসৃত রক্ত পৃথিবীর দেহে পড়লে পৃথিবী পুনরায় সন্তান প্রসব করলেন—এরিন্যুস ভগিনীত্রয়, যাঁরা রণচণ্ডীমূর্তি—ফিউরিজ্। এঁরা পিতৃহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাসাক্ষ্যের ভয়ঙ্কর প্রতিবিধান করেন। এঁদের নাম যথাক্রমে আলেক্তো, তিসিফনি ও মেগেয়্রা। তাইতানরা এর পরে সাইক্লোপদের তারতারুস থেকে মুক্ত করে পৃথিবী-র বুকে ফিরিয়ে আনেন।

ক্রনস্ তাঁর ভগিনী রীয়াকে বিয়ে করে জগতের অধিপতি হলেন। কিন্তু দুর্মতি-বশত সাইক্লোপদের আবার তারতারুসে বন্দী করলেন। মাতা-পৃথিবী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এবং মরণোন্মুখ পিতা ইউরেনাস্ও অভিশাপ দিলেন যে, কালক্রমে তিনি নিজের পুত্রের হাতেই সিংহাসন-চ্যুত হবেন। সুতরাং ক্রনস্ সচল ও সচেষ্ট হলেন; রীয়া এক এক করে সন্তান প্রসব করেন এবং ক্রনস তাকে গিলে নিয়ে পেটে বন্দী করে রেখে দেন। এভাবে হেস্তিয়া, দিমিতার, হেরা, হেদিস্ এবং পসীদন পিতার পেটে চলে গেলেন।

নবজাতক শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আড়াল করার মতোই মাতা রীয়া পরের সন্তান 'জিয়ুস'-র জন্ম-মাত্র তাকে অন্ধকারের গভীরে শাশুড়ি পৃথিবীর হাতে অর্পণ করেন। ক্রনস্কে কাপড়ে বাঁধা প্রস্তরখণ্ড খাইয়ে দেন সন্তান বলে।

গোপনে বড় হয়ে জিয়ুস মায়ের সাহায্যে ক্রনসের পান-সরবরাহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন। মধু-মিশ্রিত পানে মিশিয়ে দেন এক বিশেষ আরক যাতে ক্রনস্ ক্রমাগত বমি করতে থাকেন। একে একে বেরিয়ে পড়তে থাকেন পেটের মধ্যে আটকে থাকা বড ভাই ও বোনেরা। যুদ্ধ শুরু হয়, চলে দশ বছর। ইতোমধ্যে তাইতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 'অলিম্পীয়' সন্তানেরা জ্যেষ্ঠতাত সাইক্লোপদের পুনরায় তারতারুস থেকে মুক্ত করে এনে নিজেদের পক্ষে যুদ্ধে সামিল করেন। তাইতানরা পরাজিত হন এবং 'অলিম্পীয়' দেবতারা জয়ী হন।

জিয়ুস সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, তাই তিনি আকাশ [এবং পৃথিবীর মাটির অংশেরও] কর্তৃত্ব পান। পসীদন সব দিক দিয়েই জিয়ুসর সমকক্ষ, কিন্তু শক্তিতে সামগ্রিকভাবে একটু ন্যূন, তাই বাধ্য হয়েই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে সমুদ্রের অধিপতি হতে হয়। মাঝে মাঝেই তাঁর অসন্তোষ ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে স্থলভাগ-এর কিছু অংশ গ্রাস করে নেয়।

বাকি থেকে যায় পাতাল। পুরাণের আদি অংশে নিছকই ভূ-নিম্ন জগৎ, যা 'নরক'-ব্যঞ্জনাবিহীন। ক্রমে এই ব্যঞ্জনা লোককল্পনায় স্থান করে নেবে। হেদিস্, যাঁর গাত্রবর্ণ ম্লান, মন ও মুখের ভাব বিষণ্ণ, সুন্দব হলেও ভয়-প্রদায়ী—তিনি হলেন পাতালের অধীশ্বর। আবার ঐ মৃত্যুলোকও এই একই নামে ['হেদিস্'] পরিচিত যে, দান্তের রচনা তার প্রমাণ দেয়।

মৃত্যুর পর ব্যক্তির ছায়া-শরীর অর্থাৎ আত্মা তারতারুসের অভিমুখে নেমে যেতে থাকে। নামার পথ হচ্ছে সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি নির্দিষ্ট স্থান যেখানে পপ্‌লার-বীথিকা-র মধ্যে প্রবেশদ্বার লুকোনো থাকে। মৃতের আত্মীয়রা মৃতদেহের জিভের নিচে একটি মুদ্রা দিয়ে দেন পারানির কড়ি হিসেবে, যেটা না পেলে কৃপণ ও লোভী মাঝি চ্যারন নদী পার করে দেবে না। এই গ্রীক বৈতরণী নদীর নাম স্টিক্স্ [স্টিক্স্, অর্থাৎ ঘৃণা], এবং এর মাঝি ও নৌকা দুই-ই খামখেয়ালি। এই ভয়ঙ্কর, ঘৃণাপূর্ণ স্টিক্স্ তারতারুসের পশ্চিমদিক বেড় দিয়ে রেখেছে। এর পাঁচটি উপনদী রয়েছে, যথাক্রমে এ্যাকেরন, ফ্লেজেথন, কসিতুস, এয়রনিস এবং লিথি। পয়সা-বিহীন আত্মারা চিরকালই নদী পেরোতে না পেরে তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে, যদি না তারা কোন ফিকিরে হার্মিস-এর নজর এড়াতে পারে এবং পিছনের সুড়ঙ্গপথে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়তে পারে। এ-রকম অন্তত দুটি সুড়ঙ্গ আছে, একটা লাকোনীয় তিনারুসে, অন্যটা থ্রেসপোটীয় এযর নামে। একটি তিনমাথাওয়ালা [মতান্তরে পঞ্চাশ মাথা] কুকুর—নাম সেরবেরুস্—স্টিক্স্ নদীর অপর পাড়টি পাহারা দিয়ে চলেছে নিরন্তর, কোন জীবিত ব্যক্তি বা পলাতক আত্মা অনধিকার প্রবেশ করতে গেলেই তৎক্ষণাৎ তার খাদ্যে পরিণত হবে।

তারতারুস হল হেলেনীয় পুবাণের মৃত্যু-পরবর্তী পাতাল জগৎ। এর অধিপতির নাম হেদিস্, সে কারণে অনেক সময়ই এই জগৎকে হেদিস্ বলেও ডাকা হয়। রাজা হেদিসের নাম নিতে লোকের সংস্কার বা ভয় কাজ করত বলে তাঁকে তাঁর গুণাত্মক অভিধা দিয়ে ডাকাটাই দস্তুর। তাই তাঁর বিখ্যাত বিশেষণ প্লুতো[ন]/প্লুতো হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর অপর নাম। অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি।

তারতারুস বা হেদিস্ গ্রীক পুরাণে সর্বসম্মত পাতাল। কিন্তু নরক হিসেবে এর সামান্য স্বীকৃতি অলিম্পীয় মিথের, অর্থাৎ শেষের দিকের অবদান। আরো প্রাচীন কালের মিথ-গুলিতে, যেমন অরফীয় ধারায় বা পেলাসজীয় ধারায় মৃত্যু-পরবর্তী জগৎ সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী ধারণা ও ছবি অনেকসময়ই আমাদের কাজটা কঠিন করে দেয়। তারতারুসের প্রসঙ্গে ফেরার আগে একটু সেই ছবিগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে নেওয়া যাক।

খুব প্রাচীন একটা বিশ্বাসের প্রচলন ছিল একসময় যে, বিদেহী আত্মা কবরের মধ্যেই বাস করতে থাকে, বা মাটির নিচের গর্তে। সেখানে তারা নানা আকার নিয়ে থেকে যায়, যেমন সরীসৃপ, ইঁদুর, বাদুড়-চামচিকে ইত্যাদি। আর একটা বিশ্বাস বলে যে পূত, বা মহান রাজাদের আত্মা তাঁদের সমাধিস্থলে একটা নির্দিষ্ট দ্বীপের মত গণ্ডীবদ্ধ স্থানের মধ্যে চলে ফিরে বেড়াতে থাকেন এবং তা চাক্ষুষও করা যায়। তৃতীয় আরেকটি ধারার বিশ্বাস ছিল যে, মৃত আত্মা আবার পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে, যদি তা বাদাম, বীন, মাছ প্রভৃতির মধ্যে ঢুকে থাকে এবং সেভাবে খাদ্য হয়ে ভাবী মায়ের গর্ভে প্রবেশ করতে পারে। আর এগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অরফীয় মতবাদ যে, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে প্রবেশ করতে পারে—মেটেম্প্ সাইকোসিস বা ট্রান্সমাইগ্রেশন অব্ সোল্‌জ। পিথাগরাস ছিলেন এই মতের বিশিষ্ট প্রবক্তা।

হেদিস্-এর উত্থান ক্রমশ এই ছড়ানোছিটোনো ধারণাগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হোমার-এর অবদান এখানে অনেকখানি। হেদিস্ দেবতা হিসেবে এবং দ্বিতীয় অর্থে নরক হিসেবে মৃত্যুর ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত ও অমোঘ করে তোলে।

তারতারুসে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় তার সম্মুখবর্তী প্রথম অঙ্গন—এ্যাসফোদেল প্রান্তররাজি, নিরানন্দ। এখানে বহু বীরের মৃত আত্মা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সে এক বিশাল জনতার ভিড়ে। এই জনতা অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতনামা মানুষের আত্মাদের দিয়ে গঠিত। এইসব আত্মারা ক্রমাগত বাদুড়ের ডাক ডেকে চলেছে, আর এরই মধ্যে একমাত্র অরিয়ন বীরের আত্মা মাঝে মধ্যে প্রেত-হরিণ শিকার করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা দেখাচ্ছেন। এইসব বীরদের তারতারুস জয় করার আর কোন ইচ্ছেই অবশিষ্ট নেই, তাঁরা বরং একজন ভূমিহীন চাষীর দাস হয়ে থাকতেও রাজি আছেন, এই আনন্দহীন, ভয়ঙ্কর তারতারুসে থাকার পরিবর্তে। তাঁদের উদ্দেশে পৃথিবীতে নিবেদিত রক্ত-অঞ্জলিই তাঁদের একমাত্র পানাহার।

তারতারুস তেপান্তরের ওপাশে আছে এরিবুস, একটি ঢাকা কুঠুরির মত স্থান। আর তার পাশেই রাজা হেদিস্ ও রানি পারসিফনি-র প্রাসাদ। প্রাসাদের বাঁ-দিকে এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে লিথিকুণ্ড [লিথি উপনদীর থেকে তৈরি] যার মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছে শ্বেত সাইপ্রেস বৃক্ষ। সাধারণ আত্মারা দলে দলে এখানে জল খেতে আসে, খায় আর তাদের সমস্ত স্মৃতি সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। শিক্ষিত আত্মারা তাই এই কুণ্ড পরিহার করে চলেন, তাঁরা শ্বেত-পপলার

গাছের ছায়াবেষ্টিত স্মৃতিকুণ্ড থেকে জল পান করেন। শ্বেত-পপলার পারসিফনির প্রিয়। পারসিফনি শ্রী ও পুনর্শুদ্ধি-র [regeneration] দেবী। এক মতে তিনি জিয়ুসের পালিতা কন্যা, যদিও আর একটি গল্পে জিয়ুসের সৌজন্যে তিনি জ্যাগ্রিয়ুসের কুমারী-জননী। পারসিফনিকে জিয়ুস বা মতান্তরে অন্য লুব্ধ দেবতার হাত থেকে বাঁচাতে হেদিস্ [নামান্তরে দিস্, বা প্লুতো] নিয়ে চলে যান পাতালপুরে এবং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন একরকম জোর করেই। পারসিফনি সেই থেকে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত, কিন্তু খুব অনুরক্ত নন। স্বামী মৃত্যুদেব বা যম হলেও, তিনি মৃত্যুদেবী হতে নিমরাজি। তাই হেকেত নামে আর এক প্রাক্-হেলেনীয় দেবীকে অলিম্পীয় আখ্যানে এই স্থানে বসানো হয়। লিবীয় মিথের পরম্পরাতেই হেকেত-কে নেফথিস নামে ত্রি-মস্তকধারিণী স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের একেশ্বরী ভাবা হয়েছিল। হেকেতের তিন-মাথাই পরে সেরবেরুস-এর ঘাড়ে চেপে যায় খুব সম্ভবত। 'ম্যাকবেথ'-এ হেকেত ভাগ্যদেবীর ভূমিকাতেই দেখা দিচ্ছেন, কাজেই শেক্স্পীয়ার ব্যাপারটিকে খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন ও উপভোগ করেছিলেন।

হেদিস্-এর প্রাসাদ ও কুণ্ডগুলির কাছেই তিনটি রাস্তা এসে মিলেছে এক জায়গায়। সেই মিলনস্থলে প্রতিদিন যেসব মৃত আত্মারা এসে পৌঁছচ্ছে তাদের বিচারসভা বসে। বিচারক তিনজন: ইয়াকুস বিচার করেন ইউরোপীয়দের; হ্রাদামানথিস এশীয়দের; এবং মিনোস সামলান সেই সব দুরূহ বিচার যেগুলি অন্য দুজন না পেরে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। বিচার সমাপ্ত হলে প্রেতেরা ঐ তিন রাস্তার কোন না কোন রাস্তায় প্রেরিত হয়। যারা পুণ্যবানও নয় দোষীও নয় তারা একটি রাস্তা ধরে ফিরে আসে এ্যাসফোদেল প্রান্তরগুলিতে, যারা দুষ্ট তাদের রাস্তা নিয়ে যায় তারতারুসের শাস্তি-প্রান্তরে; আর যারা পুণ্যবান তাদের রাস্তা এলিসিয়ামের কুঞ্জবীথিতে পৌঁছে দেয়। এলিসিয়াম স্বর্গ, এটি হেদিসের নিকটবর্তী হলেও তাঁর রাজ্যাধীন নয়।

আছেন যম, হেদিস্—কালান্তক, তাঁর নিজ অধিকার রক্ষায় নির্মম। ক্বচিৎ পৃথিবীতে উঠে আসেন। খুব জোরালো কাজ পড়লে তবেই—যার মধ্যে হঠাৎ যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তিও একটা বড় কাজ—নচেৎ নয়। একবার তো নিম্ফ্ মিন্থি-কে তাঁর চার কৃষ্ণ-ঘোটকবাহিত স্বর্ণরথের বিভায় আচ্ছন্ন করে নিজ বাসনা চরিতার্থ প্রায় করেই ফেলছিলেন আর কি, যদি না উপযুক্ত সময়ে অকুস্থলে পারসিফনি দৈবাৎ এসে না পড়তেন। পারসিফনি মিন্থিকে mint-এ অর্থাৎ পুদিনা-শাকে রূপান্তরিত করে দিয়ে স্বামীর গ্রাস থেকে বাঁচালেন। এইভাবেই নিম্ফ্ লিউসিকে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল স্মৃতিকুণ্ডের শ্বেত-পপ্লার-এ। এই যম অধীনস্থ কাউকেই পালাতে দেন না; এবং এমন কেউ প্রায় নেই যে তারতারুসে গেছে এবং ফিরে এসে তার বৃত্তান্ত বলতে পেরেছে,—দেবতাদের মধ্যে এতই ঘৃণ্য এই কালান্তক।

অবশ্য একেবারেই কেউ তারতারুস থেকে ফিরে আসেনি তা নয়। 'অরফীয়' উপাখ্যানের অর্ফিউস্ এতই বাঁশি-বাদনে দক্ষ ছিলেন যে মৃতা স্ত্রীর সন্ধানে হেদিসে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। তাঁর বাঁশি সব কিছুকে সম্মোহিত করে দিতে পারত। হেদিসও খুশি হয়ে তাঁকে মৃতা স্ত্রীকে নিয়ে মর্ত্যে ফিরতে অনুমতি দিলেন। শুধু শর্ত রইল, আলোর সীমানায় না পৌঁছে অর্ফিউস্ পিছন ফিরে স্ত্রীকে দেখতে পারবেন না। শর্তের পরিহাস-মূলক ফাঁকির ফাঁকে পড়ে শেষ মুহূর্তে ভাল-মানুষ, শিল্পী ও ভোলামন অর্ফিউস্ তাঁর স্ত্রীকে হারালেন—এ

গল্প আমরা অনেকেই জানি। সুরের সঙ্গে অসুরের দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজয় মানুষের নিয়তি। এ-তার অপূর্ব রূপক।

নিয়তিদেবীরাও আছেন গোপন গহ্বরে। হেদিসের অন্তর্গত গুপ্ত জায়গা এরিবুস-এ। এরিবুস একই সঙ্গে স্থান-বাচকও, দেবতার নাম-বাচকও বটে। দেবতা এরিবুসের সঙ্গে দেবী নিশার মিলনে উৎপন্ন হলেন তিন নিয়তি ভগিনী—The Fates Sisters। এঁরা শ্বেতাম্বরা, এবং কাহিনী-বিচারে এরিনিয়েস্-ভগিনীত্রয়ের থেকে পৃথক। এরিনিয়েস্‌রা কল্প-অন্তরে হেকেতের সঙ্গিনী এবং বিবেক-যাতনা-র মূর্তি। অপমান, অবাধ্যতা ও মাতৃ-লাঞ্ছনার পাপকে এঁরা নিয়তি হিসেবে প্রতিকার করেন। এরিবুস্ ও নিশা বা রাত্রির কন্যারা একটু আলাদা। তাঁরা হলেন: ক্লোথো, ল্যাচেসিস্ এবং আত্রোপস্। এঁদের মধ্যে ছোটটি আকারে সব থেকে ছোট, কিন্তু স্বভাবে সব থেকে ভয়ঙ্করী। দেবরাজ জিয়ুস এঁদের অধিপতি, সেই অর্থে মানুষের জীবনের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তিনিই। তাই তাঁর নিয়তিরূপও তাহলে স্বীকার করে নিতে হয়। অবশ্য আয়েস্‌খুলুস্ [Aeschylus], হেরোদোতুস [Herodotus] ও প্লাতো [Plato] জিয়ুসের 'তিন-ভগিনী'র ওপর আধিপত্য বা পিতৃত্বের দাবিকে তেমন পাত্তা দেননি। জিয়ুসের এক কন্যা, এতি, গ্রীক নাটকে নিয়তি হিসেবে সঞ্চালিকা শক্তি—এটা স্বীকৃত।

গ্রীক নরকে বীরেরা কখনো কখনো গেছেন। হেরাক্লেস [Heracles, রোমক Hercules] নরকে তুমুল শক্তি ও বীর্য প্রদর্শন করে এসেছিলেন। থিসিয়ুস হেদিসে নেমে চার বছরের জন্য স্মৃতিবিলুপ্ত অবস্থায় অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন—সাপেদের ফোঁসফোঁসানি, সেরবেরুসের দাঁতের কামড়, ফিউরিদের চাবুক, এই এত সব। হেরাক্লেস এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। আপোল্লোদোরুস তাঁর 'এপিতোসি' পুরাণে এ-গল্প বলেছেন। প্লুতার্কের 'থিসিউস', ইউরিপিদেস-এর 'ম্যাডনেস অব হেরাক্লেস', দিওদোরুস্ সেকুলুস্-এর আখ্যানকাহিনী এবং রোমক নাট্যকার সেনেকার 'হিপোলিতুস' নাটক এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। ভার্জিল তাঁর 'ঈনীদ' মহাকাব্যেও এ-কাহিনীর প্রসঙ্গোল্লেখ করেছেন। অন্য রোমক লেখক এইলিয়ানের 'ভারিয়া হিস্তরিয়া'-তেও থিসিউসের পাতাল-কাহিনীর উল্লেখ আছে।

আরিস্তোফানেসের 'ফ্রগ্‌জ' [The Frogs] নাটকে সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পকলার দেবতা দিয়নিসুস-কে তিনি নরকের বিচারকের ভূমিকায় দেখিয়েছেন। মজার ছলে সেখানে সেরা কাব্যকারের শিরোপার জন্যে তর্ক-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন প্রয়াত আয়েস্‌খুলুস্ এবং সদ্য-প্রয়াত ইউরিপিদেস্। লোককল্পনার নরককে প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যের আঙিনায় এনে তার ধারণার আঙ্গিককে আমূল বদলে দিল আরিস্তোফানেসের 'কমেডিক' বুদ্ধিশীলতা।

নরক সম্পর্কে রোমক মিথগুলি গ্রীক মিথের কাছাকাছি। থিসিউস বা হেরাক্লিস যেমন নরক-গমন করেছিলেন, তেমনই মহাকবি ভার্জিল-এর 'ঈনীদ' মহাকাব্যের নামচরিত্র ঈনীয়ুসও পাতাল গমন করেছিলেন। তাঁর হেদিস্ যাবার পথটি ছিল আভের্‌নুস্ দিয়ে। 'আভের্‌নুস্' আগে পাওয়া গ্রীক শব্দ 'এয়র্‌নুস্'-এর যমজ—পক্ষীহীন [স্থান]। ইতালির নাপোলি শহরের দশ মাইল পশ্চিমে আভের্‌নো নামে একদা আগ্নেয়গিরি-গহ্বর ছিল এমন একটি জলাশয় আছে। পুরাকালে বিশ্বাস করা হত যে এটি নরকের প্রবেশদ্বার। ইনীয়ুস এই গহ্বর দিয়েই সম্ভবত প্রবেশ করে থাকবেন।

বৃত্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। ছোট করি। খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস ও লোকবিশ্বাসে স্বর্গ নরক ও নিয়তি অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক। যদিও মধ্যযুগের শেষ পাদে রচিত দান্তের 'দিভিনা কোম্মিদিয়া'-র 'ইন্‌ফের্‌নো-পুরগাতোরিও-পারাদিসো' ধারণার ওপর প্রাচীন গ্রীক 'তারতারুস-এ্যাসফোদেল-এলিসিয়াম'-এর ছায়া স্পষ্ট, তবুও 'এতি'-র মতো অন্ধ নিয়তিতে খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস করে না। সেখানে ঈশ্বর সর্বরকমে আদর্শ, মঙ্গলময়, করুণাময় পিতা। ওল্ড টেস্টামেন্টের শাস্তা জিহোভা থেকে নিউ টেস্টামেন্টে তিনি অসীম করুণাময় পালনকর্তায় উন্নীত। তাই নিয়তির চলনটা খ্রিস্টধর্মে অনেক দুর্বল, যদিও মন্দ লোকের কপালে নিয়তি বরাদ্দ থাকেই।

হিব্রু 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর জেনেসিস্‌-এর তৃতীয় অধ্যায়ে ঈশ্বর 'সার্পেন্ট'কে শাপ দিলেন যে ঈভ্‌কে প্রলোভিত ও পাতিত করার জন্যে সে ভূমিতে বুক দিয়ে হাঁটবে। তার পতন হল সেই থেকে। অন্যদিকে ওল্ড টেস্টামেন্টের সেয়্‌টান্ ঈশ্বরের সহযোগীও বটে ; সমালোচক প্রতিপক্ষও বটে;— এ-রকম অদ্ভুত দুই সম্পর্কের টানাপোড়েন বজায় রেখে চলেছে। জোবকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে সে ঈশ্বরের সম্মতি পায়, জোবের কষ্টের জন্যে সেয়্‌টানের কোন শাস্তি হয়েছে বলে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই।

তা-হলে সেয়্‌টান কবে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে নরকে আবদ্ধ হল? বাইব্‌ল্‌-এর নিউ টেস্টামেন্ট অংশে সে আখ্যান আমার কাছে অন্তত, খুব স্পষ্ট নয়। গস্‌পেলগুলি, লূক, রেভেলেশন ইত্যাদি একত্রে পড়ে বিচার করলে বোঝা যায় যে খ্রিস্টীয় চিন্তায় সে নিপতিত 'সার্পেন্ট'এর সঙ্গে এক এবং এ্যাডাম-ঈভের জন্ম এবং প্যারাডাইস লাভের সংবাদে এবং প্রভু যিশুর ঈশ্বরপুত্র হিসেবে তৃরীয়-শক্তির প্রকাশ ও সম্মানলাভে বিদ্বিষ্ট। খ্রিস্টধর্ম ব্যাখ্যাতাগণের সামগ্রিক সংস্কারে ক্রমে ক্রমে সেয়্‌টানের স্বর্গচ্যুতি-র আখ্যানটি পুষ্টি ও স্থিতি লাভ করে। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট', 'দ্য খ্রিস্‌চান ডক্‌ট্রিন', 'আরিওপাগিতিকা' প্রভৃতি পড়লে বিষয়ের প্রেক্ষিত ভালভাবেই পরিষ্কার হয়। মাইকেল, গেব্রিয়েল, রাফায়েল এবং লুসিফার—ঈশ্বরের চার ঘনিষ্ঠতম ও প্রিয়তম এয়্‌ন্‌জেল, যাঁদের ঈশ্বর তাঁর অব্যবহিত নিচেই স্থান দিয়েছেন এবং কর্তৃত্ব দিয়েছেন সারা কস্‌মস্‌-এর ওপর। কস্‌মস্ অর্থাৎ বিশ্ব।

লুসিফারের অহংকার ও লোভ তাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নিয়ে গেল। তার চতুর বাগ্মিতায় ভুলে এয়্‌ন্‌জেল্‌দের এক তৃতীয়াংশ তার সহযোগী হয়ে স্বর্গের রাজা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ঈশ্বর বজ্র হানলেন, শয়তান [ইংরেজি উচ্চারণে সেয়্‌টার্ন] তার সাঙ্গোপাঙ্গ শুদ্ধ পপাত নরকতলে। নরক কোথায়? না, পৃথিবীর উপরি-অংশের বিশ্ব কস্‌মস্‌, আর পৃথিবীর নিচের দিকে বিশ্ব 'কেয়স'—সেখানে সবকিছু বিশৃঙ্খল, গভীর অমানিশা, অতলান্ত গহ্বর। নরক সেখানেই। মিলটনের বর্ণনানুযায়ী স্বর্গের প্রাচীরগাত্র থেকে শয়তানকে যে ছুঁড়ে ফেলা হল তারপর সে ক্রমাগত নয় দিন ধরে উল্কার বেগে পড়তেই লাগল। এসে টিপ করে পড়ল 'কেয়স'-এর গভীরে 'হেল' নামক এক ভয়ঙ্কর স্থানে। সেখানে পায়ের তলায় বিটুমেন, সালফার প্রভৃতির জ্বলন্ত, গলন্ত সমুদ্র। স্পষ্টতই, গ্রীক স্টীজীয় নদীর হ্রদ এবং দান্তের ইনফেরনো-র ভয়ঙ্কর আবহকে মিলটন মাথায় রেখেছেন। 'হেল'-এ আলো ততটুকুই আছে যাতে কোনমতে হাতড়ে হাতড়ে এগোনো যায়, এবং আলোর একমাত্র কাজ সেখানে অন্ধকারকে আরো ভয়ানক করে তোলা। যাই হোক শয়তানের অদম্য দম্ভ তাকে মানসিক শক্তিতে বলীয়ান করে তোলে এবং সে সহযোগীদের সাহায্যে 'হেল'-এ গড়ে তোলে

'প্যানডিমনিয়াম'—সর্ব-দানব-প্রাসাদ। বিয়েলজিবুব, বেলিয়ল্, মলখ্ প্রমুখ তার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সহযোগী।

কিন্তু এ তো গেল 'হেল'-এর একটি নির্দিষ্ট জায়গা বা ভৌগোলিক ক্ষেত্র হিসেবে পরিচয়। মধ্যযুগে শয়তানকে কাব্যে-নাটকে বা লোকগাথায় খুব নোংরা, ভয়ংকর এবং অসুন্দর করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টোফার মার্লো প্রথম 'হেল'-কে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ধারণা থেকে বাড়িয়ে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রতিফলন বলে দেখালেন। 'ডক্টর ফাউস্টাস' নাটকে লুসিফার বা সেয়্টানের প্রতিনিধি মেফিমটোফিলিস্ 'হেল'-কে সর্বত্রগামী বলে দেখাচ্ছেন এবং পাপী-আত্মার শাস্তি হিসেবে 'হেল' একটা গুণগত অবস্থা হয়ে তাকে সর্বদা ঘিরে থাকে, তা সে যেখানেই যাক না কেন।

মিলটন মার্লোর এই 'রেনেসাঁস'-মাত্রাটি সাদরে বরণ করে দেখালেন যে, 'হেল' বস্তুত মনের বা আত্মার মধ্যেকার অবস্থাও বটে। এঁদের হাতে মধ্যযুগীয় হেল হয়ে উঠল সময়োপযোগী ও আধুনিক। মিলটনের হাতে সেয়টান্ও অত্যন্ত আকর্ষক চেহারার অধিকারী, বাগ্মী ও শিষ্টভাষী হয়ে উঠল। নোংরা, ভয়ঙ্কর অসুন্দর, ছাগলের দাড়ি ও খুরসম্পন্ন 'পপুলার' ধারার শয়তান হয়ে উঠল আরো অনেক বিপুল ও গভীর ক্ষতি করতে সমর্থ মন্দ লোক। আরো মন্দ, কারণ বাইরে থেকে দেখলে, শুনলে এত ভালো। খ্রিস্টীয় মানুষকে আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের পথে নিয়ে যেতে সে অনায়াসেই গোটা বাইব্ল মুখস্থ বলতে পারে, তার সকল যুক্তি অকাট্য আপাতভাবে। তার অভিনয়ক্ষমতায় সে নিজেকে ঈশ্বরের মতই, এমনকি ঈশ্বরের থেকেও বেশি সৎ ও মহৎ বলে দেখাতে পারে।

এ্যাডাম ও ঈভের আপাত নিয়তি হিসেবে সেয়্টান্ সফল হলেও শেষ পর্যন্ত তা চূড়ান্ত হয়নি। ফলভক্ষণ ও প্যারাডাইস্ থেকে বিতাড়িত হয়ে মৃত্যুর আজ্ঞাধীন হওয়াটা আদি জনক-জননীর কাছে নরকযন্ত্রণা। তাঁরা এই পৃথিবীতে পতিত হয়ে ক্রমাগত অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তমূলক কৃচ্ছ্রসাধন করে পুনরায় ঈশ্বর-সান্নিধ্যে উত্তীর্ণ হন। তবে তাঁদের সন্ততিরা সেই আদি পাপের শরিক হয়ে পড়ে, এটাই মানবজাতির নিয়তি।

খ্রিস্টানদের মতে মানুষের জন্ম-কর্ম-মৃত্যু ও স্বর্গ বা নরক লাভ সবই ঈশ্বরেচ্ছাধীন। এই তত্ত্বের নাম 'ডিভাইন প্রি-অরডিনশন' বা 'প্রি-ডেসটিনেশন'। ঈশ্বর সবই জানেন যে, কোন্ মানুষের আত্মা মুক্তি পাবে, আর কে পাবে না। কিন্তু তাঁর ঈশ্বর হিসেবে এই সর্বজ্ঞতা তাঁর মানুষের মুক্তি বা নরক-গমনের সম্পাদক নয়। ক্যাথলিক্দের মধ্যে মুক্তির ব্যাপারে ঈশ্বরের করুণা-প্রদানের ব্যাপারটা 'ইক্নেক্টিক', অর্থাৎ গহন রহস্যে আবৃত। কিন্তু তা বলে ঈশ্বর অযৌক্তিক নন। ক্যাথলিক্ বা প্রোটেস্টান্ট যাই হোক না কেন, সকলেই বিশ্বাস করেন যে যেহেতু মানুষকে ঈশ্বর নিজের সন্তান হিসেবে নিজের আদলে গড়েছেন, তাই তার মনুষ্যত্বকে সম্মান জানিয়ে তাকে দিয়েছেন ইচ্ছা প্রকাশের স্বাধীনতা। অর্থাৎ ভালো বা মন্দ জীবন-কর্ম বেছে নেবার স্বাধীনতা। ঈশ্বর ভালোবাসেন বলেই জোর করে অত্যাচারী শাসকের বা একরাটের মত মানুষকে নিজের মত বা ইচ্ছা মানতে বাধ্য করেন না। বাইব্ল এবং সন্তদের সদ্‌গ্রন্থ উপদেশের মাধ্যমে পিতৃ-প্রতিম স্নেহে সন্তানকে শিখিয়ে দিয়েছে কোন্টা ভালো পথ—স্বর্গে নিয়ে যায় এবং কোন্টা খারাপ—নরকগামী। এবার তুমি নিজে বেছে নাও তুমি কোন্টা ধরবে। খারাপ কাজ করে যেতে থাকলেও অনেক দূর অবধি ঈশ্বর ক্ষমাশীলতা বজায় রাখেন।

অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে আবার ফেরত আসা যায় তাঁর করুণার চৌহদ্দির ভেতরে। কিন্তু সবেরই শেষ আছে। সাতটি মৃত্যু-তুল্য অপরাধ [Seven Deadly Sins] আধ্যাত্মিক মৃত্যু সূচিত করে। যে পথে গেলে damnation বা perdition অবধারিত। অর্থাৎ ঈশ্বর তখন তাকে চিরকালের মত ত্যাগ করবেন এবং 'হেল' হবে তার চিরসঙ্গী। মধ্যযুগের ইংরাজি 'মর্‍্যালিটি' নাটকগুলি বারংবার মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে ওপথে পা বাড়ানোর বিরুদ্ধে। মার্লো সাহস করে দেখেছিলেন, 'ড. ফাউসটাস্' নাটকে—যে সীমানা অতিক্রম করলে কি হয়, 'হেল'-এ যেতে কেমন লাগে।

সেয়্টান্ যম বটে, কিন্তু চূড়ান্ত যম নয়। সে দুষ্ট পাপী 'ড্যাম্‌ড্' আত্মার পক্ষে যম বা নিয়তি। কিন্তু আসল নিয়তি যিনি, নিয়ত নিয়মের অনুষ্ঠানে জীবন ও বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছেন—তাঁর নাম সেই ঈশ্বর। ইহুদীদের মৃত আত্মা 'শিঅল' নামক স্থানে অপেক্ষা করে। খ্রিস্টীয় আত্মাও মৃত্যুর পরে সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে বা নরকে যায় না। এবারে একটু বিতর্কের অবতারণা হয়েছে কোনো কোনো সময়, কারণ প্রভু যীশু বলেছিলেন যে, লেজারাস জীবনে দারিদ্র্য ও কুষ্ঠরোগে কষ্ট পেলেও মৃত্যুর পরেই স্বর্গে স্থান পেয়েছিল। খ্রিস্টধর্মে কোন কোন অংশে এবিশ্বাসও কাজ করে যে কুমারী ও পবিত্র মনের মেয়েরা মৃত্যুর পরে ঈশ্বরপুত্রের কনে হিসেবে স্বর্গে স্থান পায় এবং মাতা মেরীর সেবায় নিযুক্ত হয়। তথাপি বেশিরভাগ সময়ই খ্রিস্ট-ধর্মের বিশ্বাসে এই ধারণাটা বদ্ধমূল যে, মৃত্যুর পরে যুগ যুগ ধরে মৃত আত্মা limbo-র মতো কোনো এক অবস্থায় অপেক্ষা করে 'শেষ বিচার' ও শেষ দিনের জন্য [Doomsday, The Last or Final Judgment]। ঈশ্বর সেখানে সৃষ্টির শুরুর দিন থেকে শেষ দিন অবধি সৃষ্ট সকল আত্মার শুভাশুভ কর্মের বিচারে তাদের স্বর্গ বা নরকবাস নির্ধারিত করেন। সেইজন্যেই খ্রিস্টীয় মানসকে temptation [শয়তানের দ্বারা], fall এবং redemption-এর ব্যাপারে এত সতর্ক থাকতে হয়।

আধুনিক সাহিত্য 'হেল'-কে নিয়ে মজাও করা হয়েছে। বায়রনের দন ইউয়ান 'হেল'-এ যান বৈপ্লবিক কর্মোন্মাদনা নিয়ে। আর বার্নার্ড শ তো 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকে 'হেল'-কে পরিণত করেন এক সুরম্য 'ট্যুরিস্ট স্পটে'—যেখানে সর্বপ্রকার পান-আহারাদি ও আয়েসের বাড়াবাড়ি। নেই শুধু নিজেকে ক্রমাগত পিটিয়ে আরো পরিণত আরো উন্নত করবার আকাঙ্ক্ষা। সেই অর্থে আমরা অনেকেই হেলেদুলে 'হেল'-এই থাকতে ভালোবাসি, কারণ শ-এর স্বর্গ বড় কষ্টদায়ী। গ্রীক কাহিনীর সিসিফাসের নরকে ড্রাম ঠেলে তোলার পৌনঃপুনিক কাহিনী বা ট্যান্টালাসের আকণ্ঠ তৃষ্ণার কাহিনীর মতই অধরা আদর্শের পিছু ধাওয়ার নামই শ-এর কাছে স্বর্গ।

❒

যমের বাড়ি

পল্লব সেনগুপ্ত

প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ার পুরাণবৃত্তের নানা জায়গায় মৃত্যুলোক এবং তার শাসক হিশেবে নার্গাল ও তাঁর স্ত্রী আল্লাতু [বা, এরেশকিগাল] উল্লেখিত হয়েছেন। ইস্তার-তাম্মুজের মিথকথায় ভয়ঙ্করী এক মৃত্যুদেবীর রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন আল্লাতু। অন্যত্রও তাঁর ভয়ালতা বড় কম নয়। ইস্তার-তাম্মুজ কাহিনী দিয়েই এই দেবিকা এবং তাঁর রাজত্বের বিববণ শুরু করতে পারি; অন্যান্য বর্ণনা পরে, এবং তাদের সূত্রেই নার্গালের প্রসঙ্গে আসব'খন।

ইস্তার দেবীর বহু প্রেমিকের মধ্যে তাম্মুজই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে পছন্দসই। তাঁর জন্যেই বেশির ভাগ সময়ে তিনি সজ্জাবিন্যাস করে অপেক্ষা করতেন সংকেতকুঞ্জে। কোনও এক সন্ধ্যায় সেখানে যাবার পথে বুনো শুওরের আক্রমণে নিহত হলেন তাম্মুজ। আল্লাতুর অনুচরেরা তাঁর মৃতদেহটা নিয়ে চলে গেল পাতালপুরীর আঁধারলোকে। ইস্তারের রূপ-যৌবন-বৈভব এবং প্রেমিকভাগ্যের জন্যে ঈর্ষিতা আল্লাতু পরমানন্দে তাঁর প্রেমিকের প্রাণকে আর দেহকে বন্দী করে রাখলেন নিজের মাৎসর্য চরিতার্থ করতে। এবং অচিরেই ভ্রষ্টলগ্না ইস্তার প্রেমিকের মৃত্যুসংবাদে উন্মত্ত হয়ে ছুটে গেলেন পাতালে মৃত্যুলোকে। [এখানে অবশ্য পুরাণবৃত্তে একটা গল্পান্তর আছে: অন্য এক কাহিনীতে আছে যে, সংকেতকুঞ্জে সঙ্গমান্তে আকস্মিকভাবে ইস্তারই স্বয়ং হত্যা করেন তাঁর নর্মসহচর তাম্মুজকে। তারপরে হঠাৎ আবার মৃত প্রেমিকের বিহনে হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাকে খুঁজতে যান আল্লাতুর রাজ্যে, মৃতপুরীতে।] আল্লাতুর দরবারে পৌঁছতে ইস্তারকে পেরোতে হয় সাতটি মহল্লা এবং প্রতিটি দফাতেই সীমানা পেরোনোর মাশুল হিশেবে তাঁকে কিছু না-কিছু ছেড়ে যেতে হয় : মাথার স্বর্ণমুকুট দিয়ে এর শুরু ; এবং শেষ হয় অঙ্গবস্ত্রগুলিও পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। আল্লাতুর নির্দেশেই ইস্তারের এই অবমাননা ঘটায় মৃত্যুপুরীর প্রহরীরা। মৃত্যুদেবী আল্লাতুর সম্মুখীন হয়ে অতঃপর রূপ-যৌবন-প্রেমের অধিদেবী ইস্তার ফিরে চান তাঁর প্রেমিক এবং প্রেমিকের প্রাণকে। [মৃত্যুর অধিদেবতার কাছে এভাবে প্রণয়াস্পদ মানুষটির প্রাণ প্রত্যর্পণ চাওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় ধ্রুবপদী পুরাণকথার দময়ন্তী এবং সাবিত্রী, আর বাংলার লোকপৌরাণিক কাহিনীর বেহুলার সঙ্গে ইস্তার কিন্তু অবশ্যই তুলনীয়া। গ্রিক পুরাণে অবশ্য এর ঠিক বিপ্রতীপ একটি কাহিনী মেলে, যেখানে স্বামী আদেমতুসের যাতে মৃত্যু না-ঘটে, সেজন্য আল্‌কেসতিস নিজেই মৃত্যুবরণ করেন, এবং তারপর হারক্যুলেস তাঁকে ফিরিয়ে আনেন মৃত্যুলোক হেদিস থেকে। মৃত্যুদেবতা প্লুতো তাঁকে মুক্তি দেন বিনা শর্তেই।]

মর্ত্যলোকে ইস্তারের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি সমস্ত বিশ্বেই নূতন প্রাণের সৃষ্টি রুদ্ধ করে দিলে, দেবকুল এর পরিত্রাণ করার বাসনায় আল্লাতুর সঙ্গে একটি রফায় পৌঁছতে চাইলেন।

জলদেবী ঈ [বা, এংকি] তাঁর এক দূতকে মৃত্যুলোকে আল্লাতুর দরবারে পাঠালে, আলোচনান্তে রফা হল এই যে, বছরের আট মাস তাম্মুজ জীবিত থাকবেন এবং মর্ত্যপৃথিবীতে ইস্তারের সঙ্গে মিলে একত্রে প্রাণের [এবং ফল-ফুল-শষ্প-শস্যের] সৃষ্টি করবেন। এই আট মাস হল— বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত। আর বাকি চার মাস তাঁর 'মৃত' সত্তা-ও-দেহ থাকবে পাতালে আল্লাতুর হেফাজতে; ওপরের পৃথিবীতে তখন শীত ঋতু, প্রাণের কোনও স্পন্দন থাকবে না। ঈ দেবীর পাঠানো মন্ত্রপূত জলের স্পর্শ মৃত তাম্মুজকে বাঁচিয়ে তুলল অতঃপর। ইস্তারের হাত ধরে তিনি মর্ত্যলোকে উঠে এলেন।

এই মিথকথার মধ্যে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মৃত্যুলোক এবং মৃত্যুদেবীব সম্পর্কে যেমন একটি ভাবনার হদিশ মেলে, তেমনই আবার উর্বরতাতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার—অর্থাৎ, ফার্টিলিটি কাল্টেরও—একটা নিশ্চিত সংকেত পাওয়া যায়। ফসল ফলানোর জন্য স্ত্রী-পুরুষের মিলন, মাটির তলায় শস্যবীজের 'বিলুপ্তি' এবং কিছুকাল পবে শস্যগুচ্ছ হিশেবে তাদের জন্মানো— এই সবকিছুরই রূপক নিয়ে ঐ মিথ গড়ে উঠেছিল। এখানে গভীর একটি দার্শনিক প্রতীতিও রয়েছে আত্মগোপন করে। প্রাণের অবসান এবং তার নূতন করে উজ্জীবন যে একই অলাতচক্রে অবিরত সঞ্চরণ, এই কথাটা অনেকগুলি প্রাচীন ধর্মভাবনাতেই কমবেশি ব্যক্ত হয়েছে। ঠিক সেই তাত্ত্বিক অভিব্যঞ্জনাই এখানেও সমাহৃত হয়ে আছে।

অর্থাৎ, মৃত্যুলোকই যে পুনর্জীবনেব উৎসভূমি এবং মৃত্যুর অধিদেবীরও সেই পুনরুজ্জীবনের অন্তরালে কিছু সক্রিয় ভূমিকা আছে, সেই তত্ত্বই এই মিথকথায় বিন্যস্ত রয়েছে। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, বেহুলা-লখিন্দর, আল্‌কেসতিস-আদেমতুস—প্রমুখের যে-মিথপ্রসঙ্গ ওপরে উল্লেখ করেছি, তাদের আড়ালেও এই ভাবনাই ফল্গুসঞ্চারী, বিশেযত ভারতীয় কৃষ্টিবলয়ের কাহিনীগুলিতে। কিন্তু সেই আলোচনা এখানে আর করছি না সহজবোধ্য কাবণেই।

আল্লাতুর সূত্রেই নার্গাল এবং হেদিসের কথা অবধারিত ভাবে এসে যায় এবাবে। হেদিস নামে যা গ্রিক পুরাণবলয়ে পরিচিত, তারই পূর্বপ্রতীতি হল ব্যাবিলনীয় আরালু। যদিচ, সেখান থেকেই [একমাত্র] 'মৃত'-তাম্মুজ ফিরে এসেছিলেন, তবু ঐ পুরাণকথায় যা সর্বত্রই চিত্রিত হয়েছে এমনই এক দেশ বলে, যা নিরালোক, ধূলিধূসরিত, রুদ্ধদ্বার—সেখান থেকে কেউ ফিরতে পারে না। সেখানকার প্রেতকুল ধুলো-কাদায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে আর তাদের দেহগুলি পাখির মতো পালকে থাকে আবৃত। এই চিরতমসার দেশের একচ্ছত্র কর্ত্রী ছিলেন আল্লাতু— নার্গাল এসে সেখানে অধিষ্ঠিত হবার আগে অবধি।

এই নার্গাল আদিতে ছিলেন সূর্য-অংশজাত মধ্যদ্বিপ্রহরের অধিদেবতা; বিধ্বংসনই ছিল তাঁর একমাত্র আরব্ধ কাজ। দেবকুলের আয়োজিত একটি ভোজসভায় তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আল্লাতু অপমানের প্রতিশোধার্থে নার্গালের মৃত্যু হোক এমন এক দাবী তুলে বসলেন। আসলে নার্গাল মানসিকভাবে ছিলেন অপরিণত, তাই তাঁর আচবণ অভব্য বলে মনে হয়েছিল আল্লাতুর কাছে; কিন্তু আল্লাতুর ক্রোধের প্রতিক্রিয়ায় নার্গাল হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ ক্ষিপ্ত। আধি-ব্যাধিরূপী হিংস্র-দানবদের বাহিনীসহ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আরালুর রানি আল্লাতুর হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে। মৃত্যুলোকেব সিংহাসন থেকে তিনি হিঁচড়ে টেনে নামিয়ে আল্লাতুকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, প্রাণভয়ে ভীত মৃত্যুপুরীর অধিদেবী নিজের দেহ এবং অর্ধেক রাজত্বের ওপর নার্গালের অধিকার মেনে নিয়ে কোনও মতে রেহাই পান। অতঃপর

মৃত্যুলোক আরালু যৌথভাবে নার্গাল-আল্লাতুর সাম্রাজ্যরূপে গণ্য হতে শুরু করল।

আল্লাতু-ইস্তার-তাম্মুজ মিথের যেমন উর্বরতাতান্ত্রিক একটি অলক্ষ্য তাৎপর্য রয়েছে, ঠিক তেমনই আবার নার্গাল-আল্লাতুর কাহিনীতে রূপকের আড়ালে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তেরই একটি প্রতীকী সংকেত পাওয়া যায়। 'সূর্য'-অংশে জাত নার্গালের অন্ধকার আরালুতে বিলীন হওয়া হল রাত্রির প্রতীক—আর পরবর্তী সকাল হল অন্ধকারের [এক্ষেত্রে বুঝতে হবে, আল্লাতুর] গর্ভ থেকে আবির্ভূত নূতন সূর্যের [অর্থাৎ, নার্গালের পুত্রের] আবির্ভাব। এখানেও, মৃত্যু-ও-জীবন এভাবে রাত্রি-ও-দিবার প্রতীকে ব্যঞ্জিত হবার মধ্যে একটি দার্শনিক উপলব্ধিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে সন্দেহ নেই।

২.

এই মৃত্যুলোক আরালুর একটি লিখিত বিবরণী মেলে প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ার বিখ্যাত 'গিলগামেশ' মহাকাব্যে। সম্রাট আসুরবানিপালের রাজধানী নিনেভ নগরীতে অবস্থিত, ক্যুনিফর্ম লিপিতে খোদিত অজস্র মৃৎফলকের গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে এটিও ছিল। হিট্টাইট, সুমেরীয় এবং আক্কাদীয়—এই তিনভাষায় লেখা এই বইয়ের বয়স অন্তত চার হাজার বছর। কিছু মিথ, কিছু ইতিহাস, কিছু লোককাহিনীর সমাহারে রচিত এই অজ্ঞাতস্রষ্টা-গ্রন্থটিতে পরলোক-চিত্রণের সুদক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়। এরেক নগরীর শাসক অর্ধদেবতা-অর্ধমানব গিলগামেশ এবং তার অনুচর অর্ধপশু-অর্ধমানব এংকিডু-ওরফে-ঈবনির বিচিত্র সব অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে মৃত্যুলোক-পরিভ্রমণের বিবরণীও রয়েছে।

এইখানেও মৃত্যুলোক-ভাবনার মধ্যে দর্শনচিন্তার প্রতিভাস প্রগাঢ়। পশু-মানব এংকিডুর মরণের অব্যবহিত পরেই গিলগামেশ ভাবতে শুরু করে জীবন এবং মৃত্যুর রহস্য নিয়ে। আর সমাধান খুঁজতে সে যায় আরালুর গহিন অন্ধকারে তার পিতৃপুরুষ উৎনাপিস্তিমের কাছে। জমাট অন্ধকারের বিশাল এক পর্বত পেরিয়ে, মণিমুক্তোয় ভরা গাছ-গাছালির অরণ্য অতিক্রম করে, 'মৃত্যুর নদী' [গ্রিক পুরাণের স্তাইক্স বা আমাদের বৈতরণীর সঙ্গে যা তুলনীয়] পার হয়ে সে খুঁজে পায় তার "প্রগাঢ়-পিতামহ"-কে। তাঁর কাছ থেকে সে পায় অমৃতলতা, চিরসঞ্জীবনী সেই ওষধি আবার হারিয়েও ফেলে সে। অবশেষে মৃত্যুলোকের বাসিন্দা এংকিডুর সঙ্গে তার দেখা হয় এবং তার কাছ থেকে সে শোনে সেখানকার বিস্তৃত বর্ণনা।

জীবন থেকে মৃত্যুর গভীরে বিলীন হওয়ার পর—পাতালপুরী পরিশুদ্ধিলোক এবং স্বর্গধাম—এই বিস্তীর্ণ ভূগোলের যে-বর্ণনা 'গিলগামেশ' মহাকাব্যে আছে তার সঙ্গে দান্তে অলিঘিয়েরির 'দিভিনা কোম্মেদিয়া'-র 'ইনফের্নো-পার্গেতোরিও-প্যারাদিসো'-র প্রসঙ্গগুলির ভাবগত সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। দান্তের সময়ে [খ্রি. ১৪শ শতকের শেষার্ধ] গিলগামেশ-মৃৎফলকগুলি ছিল অনাবিষ্কৃত। তবু এই 'ভাবগত প্রত্নপ্রতিমা' [বলা কি যাবে? কী জানি!] হিশেবে গিলগামেশের কথা 'দিভিনা কোম্মেদিয়া' প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে কিন্তু। ভার্জিলের 'ঈনীদ' মহাকাব্যে যেমন মহাবীর ঈনীয়ুস তাঁর মৃত পিতার সন্ধানে মৃত্যুলোকে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনটাই এখানেও দেখি পূর্বপুরুষ উৎনাপিস্তিমের সঙ্গে গিলগামেশের দেখা করতে যাওয়ার ব্যাপারটি। 'ঈনীদ' কাব্যের আদলেই, মধুসূদনও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-তে মৃত্যুলোকে দশরথের খোঁজ করতে রামচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। তবে ভার্জিল কিংবা মধুসূদন—কারুর

পক্ষেই কিন্তু 'গিলগামেশ' কাহিনীর হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবনসত্যের এবং মৃত্যুরহস্যের সন্ধানে যমলোকে যাবার কাহিনীর মধ্যে একটি বিশ্বজনীন মোটিফ রয়েছে। যম ও নচিকেতার উপনিষদ্-কাহিনীই এই ক্ষেত্রে যে একমাত্র নয়, তারই প্রমাণ মেলে ইস্তার-তাম্মুজ মিথে, গিলগামেশ মহাকাব্যে, 'ঈনীদ'-এ, 'দিভিনা কোম্মেদিয়া'-য়। বেহুলা-মিথেও শঙ্কর গাড়রীর 'মহাজ্ঞান'-তত্ত্বও সেই অনির্দেশ্য সত্যকেই অন্বিষ্ট করেছে হয়ত বা লৌকিক-সৃষ্টির স্বভাবজ এক অজটিল চেহারাতেই।

সরাসরি মৃত্যুদেবতাকে নচিকেতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর কাহিনীতে উপস্থাপিত করা হলেও, 'গিলগামেশ'-এ অবশ্য তিনি নেই; রয়েছে শুধু মৃত্যুলোক। তবে আল্লাতু-ইস্তাব-তাম্মুজ কাহিনীতে এবং নার্গাল-আল্লাতুর দ্বন্দ্ব-মিলনের মিথে তিনি আছেন, মৃত্যুলোকসহ। ভার্জিল-দান্তে-মিল্টন-মধুসূদনও মৃত্যুলোকের চিত্রায়ণ করেছেন যম-তথা-মৃত্যুদেবতাকে অন্তরালে রেখেই। পক্ষান্তরে দান্তে তো ফ্লোরেন্স নগর-রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকজনদেরও তাঁর 'ইনফোর্নো'-র বাসিন্দারূপে দেখিয়েছেন!

ইস্তার-সাবিত্রী-দময়ন্তী-বেহুলা যেমন তাঁদের প্রেমিক-বা-স্বামীকে খুঁজে পাবার জন্য [বা, তাঁর প্রাণ ফিরে পাবার জন্য।] মৃত্যুলোকে গিয়েছিলেন, তার বিপরীতটা অবশ্য ঘটেছে দান্তের ক্ষেত্রে। নিজেকেই নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করে প্রয়াতা-মানসী বিয়াত্রিচের জন্য তাঁর নরক থেকে যাত্রা শুরু করে, শুদ্ধিলোক পেরিয়ে স্বর্গ অবধি তোলপাড় করার কাহিনীর মধ্যে মৃত্যুত্তীর্ণ এক চির-অন্বিষ্ট সত্যের অভিজ্ঞানকে প্রমূর্ত করা হয়েছে। ঠিক একই ব্যাপারটা ঘটেছে নারীর দিক থেকে সাবিত্রী-দময়ন্তী-বেহুলা-ইস্তারের ক্ষেত্রে। উল্লেখনীয়, এই চারটি ক্ষেত্রেই মৃত্যুদেবতা [বা, দেবী] আবির্ভূত হয়েছেন, যা দেখিনা ভার্জিল বা দান্তের লেখায়। গিলগামেশেব সামনেও উপস্থিত হন নি মৃত্যুলোকের অধীশ্বর। কেন? তিনি কি নারীর সম্মুখে ছাড়া উদ্ভাসিত হন না? কিন্তু, নচিকেতার মিথ-কথায় তো তিনি প্রত্যক্ষ রয়েছেন। না-কি, নচিকেতা শুধু জীবনমৃত্যুব নিগূঢ় রহস্যই জানতে উৎসুক ছিলেন বলে, তাঁর বেলা যম আবির্ভূত হয়েছিলেন পরম এক শিক্ষকের রূপেই? নারীর প্রেমার্তি তাঁকে ব্যথিত করেছে; পুরুষের জ্ঞানান্বেষণ করেছে তাঁকে মন্ত্রজ্ঞের পদাভিষিক্ত। অথবা, মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবনের উদ্বর্তনের ভাবনার সঙ্গে ধীরে-ধীরে উর্বরতাতান্ত্রিক ধ্যানধারণার এক অচ্ছেদ্য, অলক্ষ্য সম্বন্ধবন্ধন ঘটেছে বলেই কি মৃত্যুর দেবতা শুধু নারীর কাছেই উদ্‌ভাসিত হন তার প্রেম ব্যাকুলতার সমমর্মী হয়ে? কিন্তু পুরুষের প্রেম-ব্যাকুলতার ক্ষেত্রে তিনি থেকেছেন নিস্পৃহ—তাই দান্তেকে তিনি দেখা দেন নি! অথবা, দান্তে নিজেই কি তাঁর দর্শন পেতে চান নি?

মিথকথায়, মৃত্যুলোকে প্রবিষ্ট অভীপ্সাদীর্ণ জীবন্ত মানব-মানবীর সামনে যম তথা মৃত্যুদেবতা উপস্থিত হন [ব্যতিক্রম শুধু গ্রিক মিথের আল্‌কেসতিস-কাহিনী]। কিন্তু শীলিত সৃষ্টির প্রেক্ষিতে তিনি অলক্ষিত [পূর্ণাঙ্গ মিথকথার তুলনায় আংশিক-মিথ গিলগামেশ-কাহিনীও শীলিত বৈ-কি!]—তাই ভার্জিল, দান্তে, মিল্টনের কলমের আঁচড়ে তিনি মূর্তিমন্ত হন নি!

৩.

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা : পুরাণকাহিনীতে অবশ্য কখনও-কখনও মৃত্যুলোক এবং মৃত্যুদেবতা সমনাম্নিক। যেমন, গ্রিক মিথের হেদিস ; কিংবা, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পুরাণবৃত্তের হেল্। হেদিস ও

তাঁর স্ত্রী পার্সিফোন [বা, প্রসার্পিনা] হলেন পাতালপুরীর রাজদম্পতি।

মৃত্যুপুরীর বিস্তৃত বিবরণ—যা গ্রিক মিথভাবনায় গড়ে উঠেছে—তা মেলে মহাকাব্যে এবং অন্যত্রও। 'ওদিসী'-তে আছে, ইউলিসিস হেদিসে গিয়েছিলেন তাইরেসিয়াসের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন ট্রয় যুদ্ধে নিহত বীর সৈনিকদের, দেখেছিলেন তাঁদের স্ত্রী-কন্যাদেরও। নিজের মা আন্তিক্লিয়ার সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল সেখানে। 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যেও হেদিসের উল্লেখ মেলে, তার ভৌগোলিক-অবস্থানের নির্দেশসহ! সুদূর পশ্চিম দিগন্তের প্রান্তবর্তী ওশ্যেনুস নদীর ওপারে সেই মৃত্যুলোক রয়েছে—হোমর সেকথাই লিখেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালের ভাবনায়, হেদিসের অবস্থান পাতালে। সেখানে বাস করে প্রেতের দল : সেখান থেকে এগোলে ইলিসিয়াম—যারা নিষ্পাপ, তারা থাকে সেই মহল্লায়। আর পাপীরা ঠাঁই পায় এবং শাস্তি ভোগ করে তার্তারুস নামে নরকে।

হেদিসের সঙ্গে জীবলোকের সীমানা-বিভাজন করেছে স্তাইক্স নদী [বৈতরণী আবারও স্মরণযোগ্য!]। মৃত্যুর পরে যথাবিহিতভাবে সমাধিস্থ হয় যারা তাদের আত্মাকে ফেরিনৌকোয় চাপিয়ে মরলোক থেকে মৃত্যুলোকে নিয়ে যায় চ্যারোন নামে এক অলৌকিক সত্তা—মাঝির রূপ ধরে। হেদিসের প্রবেশপথে পাহারা দেয় সেরবেরুস বলে উল্লেখিত একটি ভয়াল কুকুর [ভারতীয় পুরাণের যমবাহন বা যমের প্রহরীর রূপেও দেখা যায় একটি কুকুরকেই; মহাভারতে তো স্বয়ং ধর্মরাজ তথা যমই কুকুরের রূপ ধরে যুধিষ্ঠিরদের সহচর হয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে]—যে পাহারা দেয় হেদিসের সমস্ত প্রেতযোনিপ্রাপ্তদের, যাতে তারা না-পালাতে পারে সেখান থেকে। স্তাইক্স ছাড়া আরও ক-টি নদী মৃত্যুভূমি হেদিসের বুকে বহমান : একেরন, ফ্লেজেথন [বা, পাইরি ফ্লেজেথন]—যার বুকে দপ্‌দপ্ করে জ্বলে নরকাগ্নির শিখা, কোকিতুস এবং লেদি। 'প্যারাডাইজ লস্ট' মহাকাব্যে মিল্টন এগুলির বিস্তৃত চিত্রয়ণ করেছেন "নারকী নদীরা" ["ইনফের্নাল রিভারস"] নামে সম্বোধন করে! এদের জলের স্রোতে খেলা করে 'ঘৃণা', 'দুঃখ', 'ভয়ালতা', 'ক্রোধ' এবং 'বিস্মৃতি'—এমনই কল্পনা করেছেন তিনি। গ্রিক মিথকথার হেদিসও ঠিকএই সব অনুভূতি এবং অবস্থা-অনবস্থায় পরিপূর্ণ কি-না, তার বিচার করা অবশ্য একান্তই কঠিন!

একটু আগেই বলেছি যে, এই হেদিসের রাজার নামও হেদিস। বস্তুতপক্ষে, রাজ্যের নামেই রাজার নাম হওয়া সম্ভব। তিনি ক্রোনুস এবং ঋয়ার পুত্র—দেবরাজ জিউস এবং সমুদ্রদেবতা পোসাঈদনের ভাই। ধরিত্রীদেবী দিমিত্যরের কন্যা পার্সিফোনকে তিনি হরণ করে নিয়ে যান পাতালপুরীতে; তাঁর রানি হন তিনি। গম্ভীর, বিষণ্ণ এবং ভয়াল—এই হল তাঁর রূপ। প্লুতো নামেও পরিচিত এই মৃত্যুরাজ; দিস-দিভ্‌স-অর্কুস তাঁর অন্য ক-টি নাম। রোমানরা এই প্লুতো এবং পার্সিফোন [লাতিনে প্রসার্পিনা]-কে নিজেদের মিথকথায় ঠাঁই দিয়েছেন। সেখানে তাঁরা মৃত্যুর অধিষ্ঠাতা-অধিষ্ঠাত্রী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু, উর্বরতা-কাল্‌টের প্রতিভূস্বরূপা—সম্ভবত পার্সিফোন ধরিত্রীমাতা দিমিত্যরের মেয়ে হবার সূত্রেই এই ব্যাপারটা ঘটেছে। মৃত্যু এবং জন্ম, দুয়েরই উৎস একত্রে, এই দর্শনপ্রতীতি তাহলে শুধু ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনারই একান্ত নয় যে, সেটাই তো দেখা যাচ্ছে তাহলে।

এই হেদিস দেবতার পূজাবিধিও ছিল বিচিত্র এক প্রথার অনুসারী। কালো রঙের ভেড়া বলি দেওয়া হতো তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য হিশেবে। যিনি সেই অর্ঘ্য দিতেন, তিনি দাঁড়াতেন মৃত্যুলোকের রাজদম্পতির দিকে পিছন ফিরে! মর্ত্যলোকের সমস্ত ছায়াকে হেদিসরাজ টেনে

নিয়ে যেতে পারতেন পাতালপুরিতে তাঁর হাতের শাসনদণ্ডের সংকেতে। বিচিত্র এক শিরোস্ত্রাণ ছিল তাঁর, যেটি মাথায় পরা মাত্র তিনি অলক্ষ্যে চলে যেতে পারতেন সকলের। এই শিরোস্ত্রাণটি তিনি দেব-মানব নির্বিশেষে ধার দিতেন, যদিও তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি মানুষের ঘৃণা ও বিরূপতার [কারণটা সহজবোধ্যই!] পরিমাণ আদৌ কমত না! প্রতিশোধের অধিদেবী ফিউরি-ভগিনীরা তাঁর ও পার্সিফোনেরই জাতিকা বলে কথিত আছে। মাটির তলায় লুকিয়ে-থাকা ধাতুপিণ্ডগুলি

তরোয়াল হাতে আধুনিক যম। পাশে বাহন মহিষ।
[কটকের এক দুর্গামন্দিরের ছাদে দক্ষিণ দিকের প্রহরী।]

ছবি বিচক্রপাণি

তাঁর সৃষ্টি। প্লুতো নামের আরেকটি অর্থ যে বিত্তশালী কেন, এই ব্যাপারটি থেকেই তা বেশ বোঝা যায়।

৪.

এত ব্যাপকভাবে পরিচিত না-হলেও, বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতিবলয়েও কিন্তু বিচিত্র মূর্তিতে এই যমদেবতাকে দেখা যায়—যা বাস্তবিকই অল্পসল্প উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। উত্তর ইউরোপের পুরাণকথায় হেল্ দেবীর কথা কিছু আগে উল্লেখ করেছি। তাঁরও রাজত্বের নাম ঐ হেল্-ই [Hel]; মনে করা যেতে পারে যে, নরক অর্থে 'হেল' [Hell] শব্দের উৎসও এই টিউটোনীয় 'হেল্'-ই। আদিতে এই এই হেল্ দেবী ছিলেন হেদিস-পত্নী পার্সিফোনেরই রূপান্তর।

হেল্-রাজ্য প্রথমে ছিল কিন্তু নরক নয়, স্বর্গেরই প্রতিকল্প। বীর যোদ্ধা বল্ডের [টিউটোনীয় মিথকথায় এঁর অজস্র কাহিনী মেলে] মৃত্যুর পরে হেল্‌রাজ্যে উপস্থিত হলে তাঁকে সেখানে এলজাড্‌নির নামে এক ঝাঁ-চক্‌চক্ সভাগৃহে সাদরে আহ্বান করেছিলেন রানি স্বয়ং। পরবর্তীকালে বাপারটা গেলে বদ্‌লে : বীর যোদ্ধারা মৃত্যুর পর যেতেন ওড্‌হিন দেবতার রাজত্ব বল্‌হাল্লায়; আর হেল্ ছিল অন্যভাবে তারা মারা গেছে তাদের যাবার জায়গা।

মৃত্যু কী ভাবে ঘটেছে, তার ওপরই নির্ভর করত তাহলে কোন্ আত্মা [বা, প্রেত] কোথায় বসতি করবে, সেটা। এমন ব্যাপারটা মধ্য আমেরিকার প্রাচীন সংস্কৃতিবলয়গুলিরও কোনও-কোনওটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে। সে-কথায় পরে আসছি। জীবিত অবস্থায় কৃতকর্মের পরিণামে মৃত্যুর পরে কে কোথায় যাবে, সেটা উত্তরকালে খ্রিস্টীয় ভাবধারার অনুষঙ্গে নির্দিষ্ট হয়েছে, এমনও মনে করেছেন কোনও-কোনও মিথতাত্ত্বিক।

হেল্ পরবর্তীকালে প্রতীত হয়েছে ক্ষুধা, নিরন্নতা, শ্লথতা ও জাড্যে পরিপূর্ণ এক বিমর্ষ বেদনার দেশ বলে, যা কুয়াশা এবং অন্ধকারে ভরা। এদের সবকিছুর সমাহারে যে- ভাবরূপ তৈরি হয়েছে, মৃত্যুর দেবী হেল্ হলেন তারই বিমূর্ত এক প্রতীক। নরকরাজ্য হেল্ যখন এভাবে ভয়ালতায় বিলীন হয়ে গেছে, তখন তার নাম হয়েছিল নিফ্‌ল্‌হেইম। হেল্-দেবিকার জন্মের পর তাঁর বাবা লোকি এবং অন্যান্য সব দেবতারা তাঁকে ন-টি বিশ্বের মালকিন রূপে স্বীকৃতি দেন—যা কালক্রমে তিনি বিলিয়ে দেন আবার সমস্ত মৃত মানুষদের জীবনোত্তর আবাসরূপে। নিফ্‌ল্‌হেইম হল তাদেরই অন্যতম। হেল্ থেকে তার ভৌগোলিক অবস্থান তখন পৃথক হয়ে গেছে।

নিফ্‌ল্‌হেইমের মধ্যস্থলে ছিল হেবর্জেলমির নামে এক ঝর্ণা। তার জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে এলিভাগার নামে এক গুচ্ছ নদী—যারা সমস্ত মৃত্যুলোককে নানা খণ্ডে বিভক্ত করেছে আবার। এই সব নদী-নালা-উপত্যকা পেরিয়ে যেতে হয় সমস্ত মৃত মানুষদের; উর্ধ্ব-নামে এক ঝর্ণার ধারে পৌঁছুলে দেবতারা তাদের বিচার করেন এবং যার প্রাপ্য যা, সে সেই অঞ্চলে চলে যায় মরণোত্তর বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করতে।

কেল্‌টীয় সংস্কৃতিতেও মৃত্যুলোক এবং মৃত্যুদেবতা নিয়ে অভিনব কিছু-কিছু ভাবনার উদ্‌ভাস ঘটতে দেখা গেছে। সেখানে যমদেব হলেন বেলি এবং যমলোক হল অ্যান্‌য্যফ্‌ন। বেলি-র পরিবর্তে পয়্যঈল-কেও ঐ মিথবৃত্তে বহু সময়ে মৃত্যুর অধিদেবতা বলা হয়। বেলি-র সঙ্গে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ফীনিশিয়ার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে কেল্‌টীয় মিথে।

ভূমধ্যসাগরীয় এই সংস্রব, এই দেবতাকে কেল্টীয় মিথে বহিরাগত বলেও প্রতীত করেছে। এমন কথাও মনে করেছেন মিথপণ্ডিতরা কেউ-কেউ। ফীনিশীয় বণিকদের মারফতে এই দেবতা আইরিশ-পুরাণবৃত্তে এসেছেন, এমনটা হওয়া খুব অসম্ভাব্য নয় অবশ্য। স্কটল্যাণ্ডে আবার এই দেবতাকে কেন্দ্র করে বেল্টান্যে নামে প্রতি শীতে এক অগ্নি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শীতলতা, মৃত্যু এবং তমসার আচ্ছন্নতাকে প্রতিহত করতে। বেলি-র মতো পয়্যন্ঈলও আঁধারের বাসিন্দা—তাঁর পত্নী ঋয়ানন্। সমুদ্রদেবতা ল্যীরের বংশধরদের সঙ্গে এই মৃত্যুদম্পতির মৈত্রী, আর চিরবৈরিতা দোনের সন্ততিদের সঙ্গে—অর্থাৎ আলোর উত্তরপুরুষদের সঙ্গে তাঁদের অশেষ বিবাদ চলে আসছে, এমনই কথিত আছে।

৫.

প্রাচীন মিশরের মৃত্যুদেবতা ছিলেন সেকের। তাঁর নামের অর্থ, 'দিবসান্তকারী'—তাঁর মন্দির ছিল [এখনও আছে] সুপ্রাচীন মেম্‌ফিস নগরীতে। 'মৃতের পুঁথি' বলে পরিচিত পুরানো মিশরীয় ধর্মপুস্তকে তাঁর সাম্রাজ্যকে বলা হয়েছে যে, সে হল 'আশাহীন আঁধারপুরী'। মৃতেরা সেই রাজ্যে অনন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অপদেবতারা এবং ভয়ংকর সব সরীসৃপের দল সেখানে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ায়। সেই চির-আঁধারের দেশে কখনও-কখনও সূর্যদেব বা তাঁর রশ্মিকণা হয়ত ফেলেন; শুধু সেই সময়টুকুব জন্যেই নিঃসঙ্গ, নিরাশ, মৃত মানুষেরা একটুখানি আলো-আর-উত্তাপের ছোঁয়া পায় তাদের ঘুমের-মতো-অনন্ত-আছন্নতার মাঝেই। প্তাহ্ এবং ওসিরিস দেবতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলা হয় সব সময়েই। বাজপাখির মাথা এবং মানুষের শরীরে গড়া তাঁর ভাবমূর্তি। কখনও বা ম্যমির চেহারাতেও দেখানো হয়েছে এই মৃত্যুদেবতাকে।

মিশরীয় পুরাণে এই দেবতার আঁধারবিলীন সাম্রাজ্য উল্লেখিত হয়েছে টুয়াট্ [বা ডুয়াট্] নামে। বারোটি প্রদেশে বিভক্ত এই মিশরীয় মৃত্যুলোক, রাত্রির বারোটি ঘন্টার অনুষঙ্গে অনুকল্পিত হয়েছে। বিশাল-বিরাট বারোটি সিংহদ্বার প্রতি অঞ্চলের প্রবেশমুখে—সেগুলির প্রহরী প্রকাণ্ড সব বিষধর সাপেরা। 'বা', ওরফে মানুষের আত্মারা মৃত্যুর পরে তাদেরকে এড়িয়ে সেকেরভূমির বারোটি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে। মাঝে-মাঝে শুধু 'রা'-দেবতার আলোকছটায় তারা অনুভব করে একে অপরের অস্তিত্ব। ... মিশরী পুরাণে অবশ্য বহু সময়ে শৃগালমুখ আনুবিস দেবকেও মৃত্যুরাজ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, পরিশেষে একথাটুকুও অবশ্য বলতে হবে।

৬.

প্রাচীন মধ্য-আমেরিকার বিভিন্ন সংস্কৃতির মৃত্যুলোক এবং তার অধিষ্ঠাতৃদের কথা কিছু আগে একবার প্রসঙ্গসূত্রে উল্লেখ করেছি। আলোচনা সাঙ্গ করার আগে, সেই নিয়েও কিছু কথা বলা যেতে পারে অবশ্যই। মেক্সিকোর আজ্‌টেক, মেক্সিকো-গুয়াতেমালার মায়া এবং পেরুর ইন্‌কা সভ্যতা সুদীর্ঘকাল বহির্জগতের অগোচরে থাকলেও, এখন তাদের প্রত্ননিদর্শের সঙ্গে-সঙ্গে পুরাণবৃত্ত, দেবতাতত্ত্ব এবং ধর্ম, সংস্কৃতি-ইত্যাদির সম্পর্কে অজস্র তথ্যই আয়ত্তগত হয়েছে। সে-সবের প্রেক্ষিতেই তাদের মৃত্যুপুরী এবং মরণাধিপতিদের কথা বলা যাবে স্বচ্ছন্দে।

মায়া সভ্যতার দেবতাদের সঠিক নাম এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বটে, তবে ড্রেসডেন-

কোডেক্সে 'A-B-C-D'-ইত্যাদি সব সংকেতের মাধ্যমে তাঁরা চিহ্নিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে 'A' হলেন মৃত্যুরাজ; 'M'-কেও তাঁর সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই একাকার হয়ে যেতে দেখি। আজটেক-দেবতা ক্‌জাইপও এঁর সঙ্গে ব্যাপক সাদৃশ্যযুক্ত। কংকালবৎ চেহারা, স্ফীত-উদর, কালো-কালো ছোপে সজ্জিত [!] দেহ, এবং শক্ত একটি গলবন্ধনীতে ভূষিত এই দেবতা মৃত্যুর প্রতিমূর্তি হয়ে কল্পিত হয়েছিলেন। হাতে পায়ে মাথায় ছোট-ছোট ঘণ্টা বাঁধা; তিনি হলেন পশ্চিম দিকের অধিপতি—অর্থাৎ সূর্যাস্তের প্রান্তের। এই সমস্ত কিছুই তাঁকে মৃত্যুস্বরূপ বলে চিহ্নিত করেছে। তাঁকে পাশে রেখে যে-লেখচিত্র [হায়ারোগ্লিফিক] দেখা যায়, সেখানে বোঁজা-চোখ মরা-মানুষের মুখ এবং পাথরের ছোরার একত্র সমাবেশ এই দেবতাকে মৃত্যুপ্রতীক রূপেই নির্দিষ্ট করে। 'ট্র' দেবতার ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায় মায়া সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শনে। এর থেকে নিঃসন্দেহে একটা সিদ্ধান্তই করা যায় যে, মায়া সংস্কৃতিতে এঁর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এঁর বাহন হিশেবে কালপেঁচাকে প্রায়শই দেখা যায় ; এটাও তাঁর সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্কদ্যোতক। কখনও বা তাঁর শরীরের উপর পেঁচার মাথা বসানো আছে, এমনটাও দেখতে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এক বিষণ্ন হতাশার সূচক রূপেই তিনি পরিগণ্য।

মায়াদের অন্য আর এক দেবতা হলেন 'F'—যাঁকেও মৃত্যুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। বস্তুতপক্ষে 'A'-র চেয়ে বরং তাঁর সঙ্গে আজটেকদের নরবলির দেবতা 'ক্‌জাইপ'-এর ভাবে-রূপে সাদৃশ্য অনেক বেশি। নৃশংস হত্যার দেবতা বলে কথিত এই ক্‌জাইপ দেবতার মতো এঁদের মুখে কালো/নীল ডোরা টানা, গায়েও সেই রকম অনেকগুলো দাগ—যাতে আবার তাঁর সঙ্গে আজটেকদের হুইট্‌জিলোপক্ত লি নামে যে-যুদ্ধদেবতা আছেন, তাঁকে মেলানো যায়। গায়ের ঐ ডোরাগুলোকে ধরা হয় 'মৃত্যুর দাগ' আর ফুট্কিগুলো হল রক্ত জমে যাবার প্রতীকচিহ্ন।

আজটেকদের পুরাণে সরাসরি মৃত্যুদেবতা বলে যাঁকে গণ্য করা হয়, তাঁর নাম মিক্‌ট্‌ল্যান। ব্যাদিত-বদন এক দানবের মূর্তিতে তাঁকে কল্পনা করা হয়ে থাকে, আর হাঁ-করে তিনি গোগ্রাসে গিলতে থাকেন মৃত সব মানুষের আত্মাকে! ট্‌জিট্‌জাইম নামে একদল দানব তাঁকে ঘিরে থাকে সর্বদা; তারা উৎপীড়ন করে মৃত সেই মানুষগুলিকে।

মিক্‌ট্‌ল্যানের রাজত্ব ওরফে নরক বস্তুতপক্ষে জীবনকালে যারা ছিল হতদরিদ্র এবং উপেক্ষিত—সেই অভাগা মানুষদের আশ্রয়স্থল। আর ট্‌লালক দেবতার রাজত্ব হল মুসলিম পুরাণের বেহেস্ত কিংবা হিন্দু পুরাণের স্বর্গের সঙ্গে তুলনাযোগ্য। সেই অনন্ত সুখের সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র ধনী এবং বিশিষ্টদেরই থাকবার অধিকার মেলে; গরিব-গুর্বোরা যে সেখানে ঢুকতে পায় না এমন নয়, তবে তা শুধু ঐ ভাগ্যবান প্রেতাত্মাদের খিদ্‌মৎ খাটার জন্যেই! প্রেতলোকের কল্পনাতেও এমন শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীশোষণের ব্যাপারটা অবশ্যই সমাজ-মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি তথ্য বলে গণ্য হবে!

ট্‌লালক শব্দের আসল অর্থ হল মেঘ। তাঁর গগনবিহারী অস্তিত্ব শূন্যে গড়ে রেখেছে ট্‌লালক নামে স্বর্গসাম্রাজ্য। আর মাটির তলার যে-প্রেতলোক তার নাম ক্‌জিবাল্‌বা। মিক্‌ট্‌ল্যান দেবতার নামেও সেই প্রদেশকে উল্লেখ করার হদিশ মেলে।

গুয়াতেমালার কিচে আদিবাসীদের পুরাণগ্রন্থ 'পোপোল ভুঃ'-তে মধ্য-আমেরিকার এই সব যমলোক এবং যমদেবতাদের বিষয়ে বহু কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। এই গ্রন্থে, হুন-হুন-আহপু

এবং ভ্বাকুব-চাকি্কস নামে দুই বীর-দেবতার সঙ্গে মৃত্যুলোক ক্জিবাল্বার শাসকদের একটি দ্বন্দ্বের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে; সেখানে প্রথমে তাঁদেরকে প্রতারণার সাহায্যে সেই পাতাললোকে বন্দী করে ফেলা হলেও, পরে হুন-আহ্পু এবং ক্জাবালানক্যো—যাঁরা ছিলেন হুন-হুন-আহ্পু দেবতার দুই ছেলে— তাঁদের উদ্ধার করেন ক্জিবাল্বার শাসনকর্তাদেরকে এক আচার-নৃত্যের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েই! কিচেদের বিশ্বাস যে, মুক্তির পর ঐ দুই দেবতাই পাতালপুরীর আঁধারের গর্ভ চিরে যথাক্রমে সূর্য এবং চন্দ্র রূপে আকাশের বুকে প্রতিভাত হয়েছেন।

'পোপোল ভুঃ'-ব এই কাহিনীর মধ্যে মিথ-বিশেষজ্ঞরা মানুষের মনের গভীরে মৃত্যুবিজয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষারই সংকেত খুঁজে পাওয়া যায় বলে মনে করে থাকেন। সেই কথাটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করা দরকার বিশেষভাবে।

মধ্য-ও-দক্ষিণ আমেরিকার আরেকটি প্রাচীন সভ্যতা ছিল পেরুতে, ইন্কাদের। তাঁদের প্রেতলোকের অধিষ্ঠাতার নাম হল, সুপেঈ। সেখানে প্রগাঢ় ছায়ান্ধকারের মধ্যে বাস করে প্রেতেরা। এই প্রেতপ্রদেশের অবস্থান হল মাটির তলায়। সুপেঈ দেবতাও কৃষির সঙ্গে যুক্ত, যে-তথ্য একটু আগেই উল্লেখিত ঐ মিক্ট্ল্যানের ক্ষেত্রেও মেলে। ট্লালকও যেহেতু মেঘবৃষ্টির দেবতা, তাই তাঁর সঙ্গেও চাষবাসের একটা অলক্ষ্য যোগ আছে, এমন কথা ভেবে নেওয়া বোধহয় ভুল হবে না।

৭.

যম এবং যমালয়ের কল্পনা কীভাবে দেশে-দেশে গড়ে উঠেছে, এই নিবন্ধে তার সামান্য একটু আভাসই মাত্র দেওয়া গেল। বলা যেতে পারে যে, এ হল যম-যমপুরী নিয়ে একটা নমুনা-সমীক্ষা ওরফে স্যাম্পল সার্ভে। মধ্য-প্রাচ্য, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, মধ্যে এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অংশের কথাই এখানে মূলত বলা হল। প্রাসঙ্গিকভাবে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীরও কিছু-কিছু অংশ এখানে উল্লেখিত হয়েছে। আফ্রিকা, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার অজস্র আদিবাসীদের ভাবজীবনে মৃত্যু, মৃত্যুদেবতা এবং মৃত্যুলোকের প্রতিভাস কী ও কতটা, তা এখানে অনালোচিত। ভারতের, চীনের, অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য আদিবাসী জনজাতিদের কথাও এখানে নেই।

তবুও, এই নমুনা-নিরীক্ষা থেকেও কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বের পথনির্দেশ মেলে। **এক** : মৃত্যুলোক প্রায় সর্বত্রই মাটির নিচে কল্পিত; মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সূত্রেই বোধহয় এমন ভাবনাটা গড়ে উঠেছিল আদিমকাল থেকেই [নিয়ানডার্টালরাও যে মৃতদেহ সমাধিস্থ করত ৬০,০০০ বছর আগেও, তার প্রত্ননির্দশ রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে]। **দুই** : মৃত্যুদেবতার সঙ্গেই পুনর্জীবন দান এবং শস্য-শষ্প সঞ্জীবনের একটা সম্পর্ক হামেশাই দেখা যায়। **তিন** : প্রেতলোকের যে-ভূগোল বিভিন্ন কৃষ্টিবলয়ে অনুভাবিত হয়েছে, তাদের মধ্যে একটা রূপগত সাদৃশ্য রয়েছে। **চার** : মৃত্যুর সূত্রেই মৃত্যুবিজয় এবং জীবনের শাশ্বত কিছু সত্য ['মহাজ্ঞান'] অন্বেষণের প্রয়াস বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে। **পাঁচ** : প্রেতলোকও কল্পিত হয়েছে অনেকটা মনুষ্যলোকেরই আদলে; এমন কি শ্রেণীবিভাজন, শ্রেণীশোষণও সেখানে অপ্রাপ্য নয়। **ছয়** : বহু সময়ে মৃত্যুলোকে মানুষ গেছে প্রয়াত কোনও প্রিয়জনের সন্ধানেই।

এই ছ-টি উপকরণ [এবং অবশ্যই আরও অনেক কিছু] অবশ্য মিলতে পারে সমস্ত বিশ্বের

প্রাচীন সব জাতি-অধিজাতি-জনজাতিদের মৃত্যু-সংক্রান্ত মিথকথার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। মানুষের আধ্যাত্মিক এবং বস্তুবাদী—দ্বিবিধ দর্শনভাবনার ক্ষেত্রেই সেটা যে দরকার, তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জি :

1. 'A Dictonary of Non-Classical Mythology' ❐ [Compiled by] Marian Edwardes & Lewis Spence; London, 1910.
2. 'The Oxford Companion to Classical Literature' ❐ [Compiled & Edited by] Sir Paul Harvey; Oxford, 1962
3. 'A Smaller Classical Dictionary' ❐ William Smith; London, 1910.
4. 'The Reader's Companion to World Literature' ❐ [Edited by] L. H. Hornstein & others; Penguin Books, New York; 1997
5. 'The Epic of Gilgamesh' ❐ N. K. Sandars; Penguin Books, London, 1976.
6. 'The Ancient Egyptians' [Vol. IV] ❐ Sir Gardener Wilkinson, London, 1847.
7. 'Archaic Egypt' ❐ W. B. Eemery ; Penguin Books, Harmondsworth: 1974.
8. 'The Maya' ❐ M. D. Coe ; Penguin Books, Harmondsworth ; 1975.
9. 'The Aztecs of Mexico' ❐ G. C. Vaillant ; Penguin Books, Harmondsworth ; 1950.
10. 'Ancient Civilizations of Peru' ❐ J. Alden Mason ; Penguin Books, Harmondsworth ; 1978.

❐ •

যম : সূর্য ওঠার দেশে

পূরবী গঙ্গোপাধ্যায়

‘জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?’—কবির এই গান অমোঘ। মৃত্যুকে কে এড়াতে পারে। কিন্তু এই পরিণতিই মানুষের মনে মৃত্যুভয়ের উদ্বোধক। মৃত্যুর পরে মানুষের কী হয়? কোথায় যায়? আত্মার বাস কোথায়?—এইসব তথ্য নিয়ে মানুষের মনে আদিকাল থেকে নানা প্রশ্ন জেগেছে। কিন্তু তার কোন সঠিক উত্তর মেলেনি। ফলে মৃত্যুর পরের পরিণতি নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ তৈরি হলেও সর্বত্র,—প্রায় সব ধর্মেই, সব সভ্যতা-সংস্কৃতিতেই স্বর্গ-নরক বা Heaven and Hell-এর কল্পনা জন্ম নিয়েছে।

ভারতে হিন্দু ধারণায় স্বর্গের অধিকর্তারূপে ইন্দ্র এবং নরকের অধীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন যম।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল আক্রমণের মুখে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম যখন বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর আড়ালে আত্মগোপন করছেন বা সমীভূত হচ্ছেন, তখন ধর্মরাজ যমেরও বৌদ্ধ ধর্মান্তর ঘটতে থাকে।

বৃহৎ ধর্মসংহিতার বর্ণনা অনুযায়ী যমরাজ বৃষে আরোহণ করে আছেন এবং হাতে রয়েছে একটি মুগুর। অন্য পক্ষে বৌদ্ধ সাধনমালা বিভিন্নরূপে যমরাজকে বর্ণনা করেছে। সাধারণভাবে যমরাজের দুই হাত, গাত্রবর্ণ নীল। আয়ুধ হিসাবে তাঁর হাতে আছে মৃত্যুদণ্ড এবং শূল। তিনি বৃষারূঢ়। ভারতীয় হিন্দুধর্মে এবং বৌদ্ধধর্মে যমরাজকে শান্ত-সমাহিত এবং ভয়াল-ভয়ঙ্কর দুই রূপেই দেখতে পাওয়া যায়। যদিও ধর্মানুযায়ী যমরাজ সম্মানিত দেবতা, কিন্তু কখনও কখনও তিনি যমান্তক প্রমুখ দেবতাদের পার্শ্বদেবতা হিসাবেও চিহ্নিত হয়ে থাকেন।

আমাদের জানা আছে যে, বহুকাল আগে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে চৈনিক পরিব্রাজক-গণের মাধ্যমে চীন এবং পরবর্তীকালে জাপানে গিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অপরাপর বৌদ্ধ দেব-দেবীদের সঙ্গে যমরাজও ভারত থেকে চীন হয়ে জাপানে গিয়ে পৌছেছে।

চীন এবং জাপানে যমরাজকে শান্ত-সমাহিত এবং ভীষণ-ভয়ঙ্কর এই দুই রূপেই দেখতে পাই। চীনে যমরাজ ইয়েল-লে, ইয়েল-লো এবং জামা-রাজা প্রমুখ নামে পরিচিত। চীনে ইয়েল-লো হচ্ছেন মৃত্যুর জগতের অধিপতি। ইনি সাধারণভাবে নয়জন মৃত্যু অধিপতির মধ্যে প্রধান হিসাবে পরিচিতি এবং তদ্‌রূপ সম্মান পান।

চীনের ‘সিক্স ডাইনাস্টিজ্ যুগে’ [২৬৯-৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ] উদ্ভুত হয় ‘দশরাজা’ সম্পর্কিত ধারণা। ‘দশরাজারা’ মৃতদের জগতে বসবাস করতেন এবং মৃত আত্মারা সেই রাজ্যে প্রবেশ করলেই এই দশজন রাজা একের পর এক এই আত্মাদের বিচার করে যেতেন। চীনে জুও-

দেন নামে অভিহিত বিশেষ ধরনের দেউলে এই 'দশ রাজা' অধিষ্ঠিত থাকেন। জাপানেও এই ধারণা-সৃষ্ট দেউল আছে,—যা 'এম্মাদো' নামে পরিচিত।

জাপানে যমরাজের বিভিন্ন রূপে পরিচিতি। তান্ত্রিক-বৌদ্ধ মতবাদ অনুযায়ী জাপানের যমরাজ এ-দেশের বৌদ্ধধর্মের রক্ষাকর্তা 'দ্বাদশ দেবতাগোষ্ঠী'র অন্যতম হিসাবেও পরিচিত। এই 'দ্বাদশ দেবতা'রা জাপানী ভাষায় 'জুনি তেন' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। 'জুনি তেন' বা দ্বাদশ দেবতাগোষ্ঠীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেবী হলেন 'ঝেতেন্' বা 'বেনজাই-তেন'। প্রকৃত-প্রস্তাবে ইনি ভারতীয় দেবী সরস্বতী,—যিনি জাপানে এসে ঐ নাম ধরেছেন। যমরাজ এই পর্বে 'এম্মা-তেন' [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ৬**] নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এঁর মূর্তিটি দ্বাদশ শতাব্দীর তৈরি। এবং সেটি জিংগোড়ি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে।

'যম-মণ্ডল' অথবা 'এম্মাতেন-মাণ্ডারা' জাপানে সমধিক জনপ্রিয়। এই মণ্ডলের মধ্যমণি হিসাবে আছেন 'এম্মা'। তাঁর চতুর্দিকে আছেন 'জ্জোজু' নামক এক সাধক, 'শামোণ্ডো' [ভারতীয় চামুণ্ডার জাপানী সংস্করণ] ডাকিনী, যমরাজের রানী এবং 'তাইজান-ফুকুন' [অর্থাৎ ভারতীয় চিত্রগুপ্ত] ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'তাইজান-ফুকুন' জাপানে 'এম্মার' পার্শ্বদেবতা হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকেন, 'গর্ভধাতু মণ্ডল'-এ [জাপানী ভাষায় 'তাইজো-কাই মাণ্ডারা']। তাইজান ফুকুন বা চিত্রগুপ্তের ধারণা চীনের মধ্যে দিয়েই জাপানে জায়গা করে নিয়েছে এবং চীনের তাং যুগেই [৬১৮-৯০৭ খ্রিস্টাব্দ] চিত্রগুপ্ত এখানে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

অন্যদিকে জাপানে হেইয়ান যুগে [অর্থাৎ ৭৯৪-১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ] 'তাইজান ফুকুন মাৎসুরি' বা চিত্রগুপ্তকে নিয়ে এক জমকালো উৎসব অনুষ্ঠিত হতো বলে জানা যায়। সুতরাং এর থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে জাপানে যমরাজ এবং তাঁর পার্শ্বদেবতা 'চিত্রগুপ্ত' দুজনেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

ল্যাফ্কাডিও হার্ন তাঁর 'গ্লিম্পসেস্ অফ আনফেমিলিয়ার জাপান' [Glimpses of Unfamiliar Japan] গ্রন্থে বলেছেন যে : 'তান্ত্রিক শিংগোন সম্প্রদায়ের রিন্কো-জি মন্দিরের ভয়ঙ্কররূপী যমরাজের মূর্তিটি হলো অশরীরী আত্মাদের প্রভু বা শাসক ; আত্মাদের বিচারক এবং মৃতদের নৃপতি স্থানীয়'। রিন্কোজি মন্দিরে [এই সেই বিখ্যাত মন্দির যেখানে নেতাজীর তথাকথিত দেহভস্ম (?) রাখা আছে বলে দাবি করা হয়] যমের যে মূর্তিটি রয়েছে তার রং সিঁদুরে লাল। চোখের ভয়ঙ্কর চাহনি এবং বিশাল মুখব্যাদান মানুষের মনে ভীতি-সঞ্চার করে। তাঁর বামহাতে যমদণ্ড যার জাপানী নাম 'শাকু' এবং ডান হাতে ধরে আছেন 'জিজো'—অর্থাৎ ক্ষিতিগর্ভের সাদা রঙের মূর্তি। জিজো জাপানে শিশুদের দেবতা বলে খ্যাত।

ল্যাফকাডিও হার্ন এ-বিষয়ে নানা উপাখ্যানের বর্ণনা করেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে। কামাকুরার এন্নোজি মন্দিরের 'এম্মাও'-র [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ৫**] মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত ভাস্কর 'উন্কেই'। এ-সম্পর্কে একটি বিচিত্র কিংবদন্তী এইরকম : উন্কেই মৃত্যুর পরে যমপুরীতে গেলে যমরাজ তাঁকে আবার পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন মর্ত্যে তাঁর [যমরাজের] একটি মূর্তি তৈরি করার জন্য। উন্কেই পৃথিবীতে ফিরে এসে তাঁর দেখা যমের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে একটি মূর্তি বানান,—যে মূর্তিটি অতীব ভয়ঙ্কর,—তিনি মর্ত্যের মানুষদের ভয় দেখাচ্ছেন।

জাপানের 'দাইনিচি ক্যিও'—অর্থাৎ 'মহাবৈরোচন সূত্র' গ্রন্থে মহিষকে [জাপানী ভাষায়

উশি—যার প্রকৃত অর্থ গো-জাতীয় প্রাণী] এন্মার বাহন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী যমের দেহের রং হবে বজ্রঘন মেঘের মত। যমের পার্শ্বদেবতা হিসাবে থাকবেন কৃষ্ণবর্ণের রাত্রি অর্থাৎ মৃত্যুর রানী। বৃষারূঢ় যমের হাতে থাকবে 'দান্‌জো-ইন' অর্থাৎ যমদণ্ড, যার উপরিভাগে থাকবে একটি মনুষ্য-মস্তক।

যমরাজ,—যিনি ভারতবর্ষে মৃতদের দেবতা অথবা মৃত আত্মাদের রক্ষা বা বিচার-কর্তা হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে চীনে এবং জাপানে, এমনকি কোরিয়াতেও পূজিত হন। তবে জাপানেই এই দেবতা বেশি জনপ্রিয়। জাপানে যদিও তিনি একাধারে প্রশান্ত এবং ভীতিপ্রদ দেবতা রূপে পরিচিত, বর্তমানে কিন্তু তাঁর ভীতিপ্রদরূপই সমধিক জনপ্রিয়। জাপানে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে : 'কারিরু তোকিজিজো গাও, কায়েসু তোকি এন্মা গাও'—অর্থাৎ 'ধার নেবার সময় জিজোর ভালো মতো মানুষ গো-বেচারির মুখ, আর যখন ধার শোধ করাব সময় হবে তখন এন্মার মতো ভয়ঙ্কর মুখ করবে'।

আগেই বলেছি 'জিজো' জাপানে শিশুদের রক্ষাকর্তা দেবতা। তাই তাঁর রূপ অতীব প্রশান্ত—প্রসন্নাস্য এই দেবতা তাই সহজেই শিশুদের অভয়স্থান হয়ে উঠেছেন।

আমাদের মত যমের দুয়ারে কাঁটা দেবার প্রথা জাপানে প্রচলিত না থাকলেও, এন্মাকে নিজের ঘরের লোক করে নেওয়ার রীতি জাপানী সমাজে নেই।

❐

যম : কোথায় আছেন!

এদেশে-বিদেশে

সিপ্রা চক্রবর্তী

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীতে যম কেবল মৃত্যুর দেবতা বা নরকের প্রভু নন—প্রথম মানুষও। এক-কথায় মানবজাতির আদর্শ। প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যদের কাছে যম ছিলেন প্রথম মানুষ যিনি নিজেকে বহুলোকের হিতার্থে উৎসর্গ করার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। যম কেন বিষণ্ণ মৃত্যুর দেবতা হয়েছিলেন তার কারণগুলির মধ্যে একটি হলো *concept of karma*—কর্মের ফল, যা বিশেষভাবে ভারতীয়দের ধারণার একাঙ্গীভূত। মানুষের কর্মের গুরুত্ব বুঝে পরবর্তী জীবনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, যাতে সে অশেষ সুকর্ম করতে আকৃষ্ট হয় এবং জন্মান্তরের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে। এই ধারণা উপনিষদেও আছে। তার আগে ঋগ্বেদে যমের প্রশংসা করে বলা হয়েছে : 'যিনি কি পুণ্যবান কি পাপী সকলেরই গন্তব্য মার্গের পরম সহায়, যিনি বিবস্বানের প্রশংসনীয়পুত্র। যিনি পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে কর্মফলানুসারে জীবগণকে এ-লোক হইতে লোকান্তরে যাইবার উপযুক্ত শরীর দান করিয়া থাকেন, যিনি প্রাণধারী জীবমাত্রেরই রাজা বলিয়া বিখ্যাত সেই যম নামক দেবতাকে হবিঃ প্রদান দ্বারা পূজা কর।' [১০ম মণ্ডলের একাধিক সূক্ত দ্রষ্টব্য]।

মহাভারত ও পুরাণে মৃত্যুর দেবতা যম কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবসন পরিহিত ও মহিষারূঢ়রূপে বর্ণিত। হিন্দুর ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী যম শুভ দেবতা নন; কারণ মৃতজনকে তিনি স্বর্গে আহ্বান করেন না। পিতৃলোকের আনন্দপূর্ণ বাসস্থানে যম বিরাজ করেন না। তাঁর কর্মস্থল হল নরক, যেখানে পাপীদের শাস্তি দেওয়া হয়। যম যেমন মৃত্যুর দেবতা, তেমনি তিনি মৃত্যুর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়াবহ দক্ষিণ দিকেরও দিকপাল। জীবন সম্পর্কে এমন বামাস্য ছাড়া যমপূজার একটি শুভদিক পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলের কুমারীরা যমপুকুর ব্রত পালনের মাধ্যমে করে থাকে। এখানেও ভাইফোঁটার মত ভাইকে নিয়েই ব্রত। এই ব্রতে ভাই এক কাহন কড়ি পেয়ে থাকে। উঠোনে পুকুর কেটে আলপনার ওপর দক্ষিণ ঘাটে যমরাজা ও যমমাতার মাটির মূর্তি, উত্তর ঘাটে মেছোমেছোনী, পুবঘাটে ধোপা ও ধোপানী আর পশ্চিমঘাটে পশুপাখি, কাক-চিল, হাঙর, কুমির প্রভৃতির মূর্তি স্থাপন করা হয়। পুকুরের পাড়ে থাকে হলুদ, কচুর গাছ আর ভিতরে থাকে শুষনি, কলমি ও হিঞ্চে লতা। কুমারীরা ছড়া বলে পুজো করে। পুকুরে জল ঢালে, লতাগুল্ম বসায় ও পিতৃগৃহের সুখ-সমৃদ্ধি ও ধনজনের জন্য প্রার্থনা করে। এখানে যম ধন-সম্পদের দেবতা [এই সঙ্কলনের অন্য একটি প্রবন্ধে এ-বিষয়টি আলোচিত হয়েছে]।

ভাইফোঁটায় যমদুয়ারে কাঁটা দিয়ে বোন ভাইকে ফোঁটা দিয়ে বলছে :

চিত্র নং ১

শক্তিসহ যমান্তক, যুগনদ্ধ ভঙ্গিতে
তিব্বত, সপ্তদশ শতাব্দী

চিত্র নং ২

ছুটন্ত গাধাব পিঠে দেবী লা-মো,
অষ্ট ধর্মপালেব একজন, তংখা
তিব্বত, অষ্টদশ শতাব্দী

চিত্র নং ৩

সিংহাসনে উপবিষ্ট মৃত্যুব দেবতা
An Puch বা Yum cımıl সঙ্গে পাত্র
হাতে শস্যেব দেবতা [বাঁদিকে]
তিব্বত, অষ্টদশ শতাব্দী

চিত্র নং ৪

অ্যানুবিস—মৃত্যুর দেবতা, মৃতদেহ সুরক্ষা ও
মমি থেকে পুনর্জীবনলাভে সহায়তা করেন
মিশর খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ

'স্বর্গেতে হুলুস্থুলু মর্ত্যেতে জোকার।
না যাইও ভাই যমদুয়ার ॥
যমদুয়ারে দিয়ে কাঁটা, বোন দেয় ভাইকে ফোঁটা ॥'

এখানে যমরাজ কিন্তু মৃত্যুব দেবতা। জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে তাঁর কারবার। দীর্ঘায়ু দান করাব বিষয়েও তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের জীবনের সদসৎ কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি স্থির করেন বলে এই দেবতার নাম যম। এছাড়াও পিতৃপতি, কৃতান্ত, যমুনাভ্রাতা, কাল, শমন, অন্তক, ধর্ম, মহিষধ্বজ, কীনাশ, মহিষবাহন, দণ্ডধার ইত্যাদি যমের বহুতর নাম আছে। ধর্মরাজ হিসেবে যম মানুষের বিচার কবেন বলে তিনি হলেন ধর্ম ও পুণ্যের রাজা। তিনি হলেন পিতৃপুরুষ ও পূর্বপুরুষদের প্রভু, সমভূতি বা নিরপেক্ষ বিচারক, কৃতান্ত বা অন্তক যিনি জীবনের সমাপ্তি নিয়ে আসেন।

ঋগ্বেদে উলূক বা প্যাঁচা এবং কপোত বা পায়রা যমের দূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে যমের যথার্থ দূত হল দুটি ভীষণদর্শন সারমেয়, সরমার পুত্র শবল [বিচিত্রবর্ণ] এবং উদুম্বল [শ্যামবর্ণ] যারা যমের পথ রক্ষা করে।

যম এবং তার ভগিনী যমী পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী এবং সমগ্র মানবজাতির আদি পিতামাতা। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে যম ও যমীর একটি সুন্দর কথোপকথন রয়েছে [১০/১০]। [এ-বিষয়ে একটি পৃথক প্রবন্ধ এই সঙ্কলনে আছে।]।

পালি সাহিত্যে মৃত্যুর দেবতা যমের বারংবার উল্লেখ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যম মৃত ব্যক্তির কর্ম পরীক্ষা করে তার দুষ্কার্যের জন্য শাস্তি প্রদান করতেন। 'মহাসময়সুত্তন্ত'-এ দু-জন যমের উল্লেখ আছে। সুমঙ্গল-বিলাসিনী একে ব্যাখ্যা করেছেন দ্বি-যমক দেবতা হিসাবে।

যমের বর্ণনায় বলা হয়েছে তাঁর বর্ণ শ্যাম। রক্তচক্ষু [লোহিতাক্ষ], ভয়ঙ্কর চেহাবা—ঘোর রূপ এবং রাজোচিত আচরণ। যমের মত যমদূতদেরও বিকটদর্শন কালো পোশাক, চক্ষু রক্তবর্ণ। খাড়াখাড়া চুল আর কাকের মত পা, চোখ ও নাক, যমের দু-হাতের আয়ুধ হল বিচারের দণ্ড ও পাশ। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যম পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। পুণ্যশীল লোকের কাছে তিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালা বিভূষিত, গরুড়বাহন নারায়ণ, আর পাপীদের কাছে বীভৎসরূপে প্রতিভাত। যম ও মৃত্যুর নানা কাহিনী ও বর্ণনা রয়েছে বেদে-পুরাণে-মহাকাব্যে, পালি গ্রন্থে ও প্রাচীন সাহিত্যের নানা অধ্যায়ে।

এই ভীষণদর্শন যমকে এড়াতে বা তাঁর কার্যক্রমকে ব্যর্থ করার বহু পদ্ধতি আছে। সবচেয়ে ফলপ্রদ হলো ত্রিমূর্তির একজনকে প্রসন্ন করা। বারবার দেবতার নাম উচ্চারণ করে দেবতাদের প্রসন্ন করা যায় বলে অনেক পাপীও তাঁকে এভাবে ঠকাতো। এরকম একটি সুন্দর কাহিনী হলো অজামিলের কাহিনী। এ-ছাড়াও সাবিত্রী-সত্যবান, শিবভক্ত মার্কণ্ডেয়ের কাহিনীও উল্লেখ করা যায়।

ভারতের নানা জায়গায় যমের মূর্তি রয়েছে, তার মধ্যে সর্বচেয়ে প্রাচীন মনে হয় মধ্যপ্রদেশের ভূমারা থেকে পাওয়া পাথরের তৈরি যমের মূর্তি [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ৮**]। এই মূর্তিটি ষষ্ঠ শতাব্দীর। সিংহাসনে যম ভদ্রাসনে বসে, দুই ধারে দুই চামরধারিণী। নানা অলঙ্কারে ভূষিত দ্বিভুজ যমের বাম হাতে রয়েছে বিচারের দণ্ড, ডান হাতে সম্ভবত রত্ন। এখানে যমের চেহারা রাজোচিত।

আবার কাশ্মীর থেকে দশম শতাব্দীর ধাতুর তৈরি ত্রিমস্তক, ত্রিনয়ন এবং ছয় হাত

বিশিষ্ট যমের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে [দ্রষ্টব্য চিত্র নং ৭]। যম এখানে প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিমায় ডান-পা ষাঁড়ের [?—না মহিষ] ও বাঁ-পা মানুষের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। ওপর হাতে রয়েছে তরবারি, দণ্ড বা মুগুর, আর নিচের ডান ও বাম হাত বুকের ওপর, সম্ভবত বজ্রহুঙ্কার মুদ্রায় রাখা। নানা অলঙ্কারে ভূষিত। মাথায় করোটিশোভিত মুকুট ও গলায় করোটির মালা।

ভারতে যমের প্রাচীন মূর্তিগুলি বেশির ভাগই পাথরে তৈরি এবং শান্ত রাজোচিত চেহারার। ইন্দোরে শিবের মন্দিরে ৮ম শতাব্দীর দণ্ডায়মান যম দ্বিভুজ। ডান হাতে বিচারের দণ্ড, বাম হাত উরুতে স্থাপিত। তাঞ্জোরের দ্বিভুজ যম মহারাজলীলায় সিংহাসনে বসে। ডানহাতে যমদণ্ড, বাঁহাতে সম্ভবত মণি-—এটি দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্তি। অষ্টম শতাব্দীর অন্ধ্র প্রদেশের বিষ্ণু-ব্রহ্মা মন্দিরে যম মহিষের পিঠে বসে আছেন, হাতে দণ্ড। ১০ম শতাব্দীর মৈলারলিঙ্গ মন্দিরে ছুটন্ত মহিষের পিঠে যম। রাজস্থানে যম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। হাতে করোটি-শোভিত দণ্ড। নানা অলঙ্কার ও যজ্ঞোপবীতে ভূষিত। উড়িষ্যার যম আবার মহিষের পিঠে মহারাজলীলায় বসে আছেন। বাম হাতে পাশ, ডান হাতটি ভেঙে গেছে। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মূর্তি [দ্রষ্টব্য চিত্র নং ২৩]। দশম শতাব্দীর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের চতুর্ভুজ দিকপাল যম। হাতে রয়েছে করোটিশোভিত দণ্ড, অঙ্কুশ, বরদমুদ্রা এবং কমণ্ডলু। কোন কোন মূর্তিতে যমের সঙ্গে দিকপাল নির্ঋতিও আছে।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ভারতে যম-যমীর কোনো যুগ্ম মূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায় না। যমের সর্বই একক মূর্তি। এই যম-যমীর সঙ্গে পারস্যের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র আবেস্তার যিম [Yima] এবং যিমে বা যিমক [Yimah, Yimaka]-এর বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সেখানে তারা এক ও অভিন্ন। ভারতীয় যমের অবিকল প্রতিরূপ রয়েছে পারসিক আবেস্তায় যিম [Yima]-এ। এবং মিশরের বিখ্যাত দেবতা ওসিরিস এবং গ্রীক দেবতা প্লুটো বা প্লুটাস-এর মধ্যে। এরা হল আদিম যমজ। ঋগ্বেদের বিবস্বত [Vivasvat] বা বিবস্বন্তের [Vivasvant] এবং আবেস্তার বিভবন্তের [Vivahant] সন্তান। চীনে যমদেবতা ইয়েন-লো-ওয়াং [Yen-lo-wang] নামে পরিচিত। জাপানে বলা হয় এম্মা-তেন [Emma-ten] বা এম্মা-ও [Emma-O]। মঙ্গোলিয়াতে যম হলেন কলয়-বাটি [Kalaya vati] ও এর্‌লিক কোয়ান [Erlic qan] আর তিব্বতে যম শিন-জি [Gshin-rje] বা চোগিয়াল [Chos-rgyal] নামেই বেশি পরিচিত। গ্রীক দেবতা হেডিস [Hades] যিনি প্লুটন বা প্লুটো নামেই পরিচিত। ইনি হলেন আবার সম্পদের দেবতা, নরকে তাঁর বসবাস। তাঁর কাজ ছিল মৃত্যুর পর পাপীদের বিচার ও শাস্তির তত্ত্বাবধান করা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যমের কুকুরের অবিকল প্রতিরূপ রয়েছে আবেস্তা, গ্রীক এবং মিশরীয় পৌরাণিক কাহিনীতে। ভয়ঙ্কর কুকুর কার্বেরস—হেডিস বা প্লুটোর রাজ্যের ফটকে পাহারা দেয় এবং প্লুটো যে কেবল মৃতের আত্মার শাসক তা নয়, মৃত্যুর পর মানুষের কাজের বিচারকও। এই হিসেবে সে যমেরও সমকক্ষ।

জাপানের পৌরাণিক কাহিনীতে যমের প্রতিরূপ হল এম্মা-ও। তার কাজ হল মানুষের পাপকাজ লিপিবদ্ধ করা। পূর্বে তিব্বতের পৌরাণিক কাহিনীতে শিন-জি [Gshin-rje] মৃত্যুর দেবতা, আর চোগিয়াল [Chos-rgyal] হল বিচারের রাজা। ভারতে যমের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই দেবতা ইন্দো-ইরানিয়ান মালভূমিতে সৃষ্ট হয়েছিলেন, তারপর বেদ, হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম পেরিয়ে শেষকালে তিব্বতে এলেন এবং তিব্বতের বিখ্যাত সংস্কারক সঙ খা-পা যমকে গে লুগ-পা বা হলুদ টুপি-পরিহিত সন্ন্যাসীদের মঠের Tutetary

deity বা রক্ষক দেবতা নিযুক্ত করলেন।

নেপালেও যমের মূর্তি রয়েছে, তবে নেপালের তুলনায় তিব্বতের যমের মূর্তি অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। নেপালের যমের মূর্তিগুলি ভারতীয় শিল্পরীতির ধারাকেই প্রকাশ করছে অষ্টম শতাব্দীর নেপালের চাঙ্গুনারায়ণ মন্দিরে বিশ্বরূপ বিষ্ণুর মূর্তিতে দণ্ডধারী ও অঞ্জলি মুদ্রায় যমের মূর্তি ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুধর্ম পুঁথির পাটায় যমের একটি শান্ত আসন মূর্তি রয়েছে [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ৯**]। যম ব্যতীত এই পাটায় রয়েছে বিষ্ণু ও তিন দিকপাল ইন্দ্র, বরুণ ও কুবের। এখানে যম পদ্মাসনে বসে আছেন, এক হাতে মনুষ্যমুখশোভিত যমদণ্ড আর হাতে অভয়মুদ্রা। কাঠমাণ্ডুর বীর লাইব্রেরীতে এই পুঁথির পাটাটি সংরক্ষিত আছে।

হিন্দুধর্মের যম অপেক্ষা তিব্বতের লামাধর্মের যম অনেক বেশি বীভৎস এবং বিচিত্ররূপী। তিব্বতের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে যমের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং তাঁর মূর্তিকলাও ভিন্নতর। এই যম একদিকে যেমন মৃত্যুর দেবতা অপরদিকে আবার ধর্মরাজও বটেন;—অধিকন্তু যম তিব্বতের অষ্ট ধর্মপালের একজন। সেইজন্যই তাঁর আকৃতি এমন ভয়ঙ্কর ও ভীতিজনক। হিন্দুধর্মে যম মহিষের ওপর বসে আছেন এবং প্রসন্নরূপী ও রাজোচিত, কিন্তু তিব্বতের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে যম মহিষের মস্তক-মাত্র এবং নীল ষাঁড় হল তাঁর বাহন। এই যম সবসময়ই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত। এই ভয়ঙ্করতার ব্যাখ্যায় বলা হয় ধর্মপালেরা, মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির কারণে অশুভ শক্তিকে ভয় পাওয়াবার জন্য এমন ক্রুদ্ধ চেহারা প্রদর্শন করে থাকেন;—যাতে মানুষ বিপথে চালিত না হয়ে বৌদ্ধধর্মের পথ অনুসরণ করে নির্বাণ লাভ করতে পারে।

তিব্বতের এক যমের মূর্তিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিষমস্তকযুক্ত, দুই হাত-বিশিষ্ট যম মহিষ বা ষাঁড়ের উপর প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিতে বসে আছেন;—আর যমের মত তার বাহন মহিষ ও হাড়ের অলঙ্কারে ষণ্মুদ্রাতে সজ্জিত এবং এক রমণীর সঙ্গে সঙ্গমরত। নিরাবরণ যমও হাড়ের অলঙ্কার, করোটি মুকুটে ও নরমুণ্ডমালায় সুসজ্জিত। চুল আগুনের হলকার মত খাড়া হয়ে আছে, ডানহাতে যমদন্ড, বাঁ হাতে পাশ। এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটি সপ্তদশ শতাব্দীর। যমের নানা ধরনের মূর্তি তিব্বতী তংখা বা পটে এবং ব্রোঞ্জের মূর্তিতে দেখা যায়। মহিষারূঢ় যম কখনো করণমুদ্রায় [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১৬**], কখনো বা যমদূতরা পাপীদের শাস্তি দিচ্ছে [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১৭**], আবার কখনো দণ্ড ও পাশ নিয়ে ধ্যান-রত [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১৪**]; তংখায় যম নরকেশ্বর। এখানে যমকে শুধু রেখায় অঙ্কিত করা হয়েছে। যম ও ৎসামুণ্ডিকে কখনও যুগনদ্ধ বা আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখা যায়[**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১৫**]। যমীর এক হাতে ত্রিশূল আর এক হাতে রক্তপূর্ণ করোটি পাত্র যমকে পান করাতে উদ্যত। ভারতীয় জাদুঘরে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুটি যম তংখা রয়েছে। একটি বিশাল তংখা তাতে শুধু যম আর একটিতে যম ও যমী রয়েছে, যমের হাতে দণ্ড ও পাশ, যমীর হাতে রক্তপূর্ণ করোটি পাত্র যমের মুখের সামনে ধরা। যম কৃষ্ণবর্ণ, চুল এবং ভুরু আগুনের হলকার মতো। ত্রিনয়ন, ষণ্মুদ্রা বা হাড়ের অলঙ্কারে ভূষিত। গে-লুগ-পা সম্প্রদায়ের রক্ষকের চিহ্ন হিসাবে তাঁর বুকে রয়েছে চক্র। বিংশ শতাব্দীর একটি তংখাতে চতুর্ভুজ যমের মূর্তি রয়েছে [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১৯**]।

এই প্রসঙ্গে লা-মো [Lha-mo] [**দ্রষ্টব্য রঙিন চিত্র নং ২**] নামে একজন ভয়ঙ্কর দেবীর কথা মনে পড়ে যায়;—যিনি অষ্ট ধর্মপালের একজন ছিলেন। এই দেবীর কাহিনী থেকে

জানা যায়, তিনি ছিলেন যমের স্ত্রী। ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে, লা-মোর স্বামী ও পুত্র বৌদ্ধধর্মের শত্রু হবে। তখন লা-মো পুত্রকে হত্যা করে। তার চামড়া ছিঁড়ে, হৃৎপিণ্ড গিলে ফেলে অদৃশ্য হয়ে যায়। যম এতে প্রচণ্ড রেগে জাদুমন্ত্রপূত বাণ তাঁর উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। এই বাণ তাঁর বাহন খচ্চরের পিঠে আঘাত করে। লা-মো তখন জাদুমন্ত্র পুত্রধারণী উচ্চারণ করে আঘাতটিকে চোখে পরিবর্তিত করেন এবং যমের প্রতিশোধের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নিরাপদে পৌছে যান। তারপর থেকে লা-মো গে-লুগ-পা সম্প্রদায় এবং তিব্বতের রাজধানী লাসার রক্ষাকর্তায় রূপান্তরিত হন। ভীষণ ভয়ঙ্করদর্শনা দেবী খচ্চরের পিঠে করে রক্তসমুদ্র পার হচ্ছেন। ডান হাতে বজ্রদণ্ড, বাম হাতে ছেলের করোটি। মুখ ব্যাদান করা, ত্রিনয়না, আগুনের হলকার মত লাল চুল।

তিব্বতে যমকে ধ্বংস করার জন্য আবার একজন নূতন দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল যার নাম যমান্তক বা বজ্রভৈরব [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১২ ও ১৩**]। যমান্তক [**দ্রষ্টব্য রঙিন চিত্র নং ১**] সাধারণত [yab-yum] অর্থাৎ শক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে বা একক পূজিত হন। এই দেবতার উদ্ভব নিয়ে তিব্বতে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে : এক সাধুপুরুষ গুহার ভেতরে পঞ্চাশ বছর ধরে গভীর ধ্যানে রত ছিলেন। নির্বাণলাভের একটু আগে দুই ডাকাত একটি চুবি করা ষাঁড়কে ঐ গুহার মধ্যে হত্যা করে। কিন্তু যখন জানলো সেই গুহায় ধ্যানরত এক যোগীপুরুষ সব টের পেয়েছেন, তখন ডাকাতেরা তাদের অপরাধের সাক্ষীর শিরশ্ছেদন করে। ঐ যোগী সঙ্গে সঙ্গে যমের হিংস্ররূপ ধারণ করে ষাঁড়ের মস্তকটি নিজের কাঁধে স্থাপন করেন এবং ঐ ডাকাতদের হত্যা করে তাদেরই করোটি পাত্রে তাদের রক্ত পান করেন। এইভাবে যমের সৃষ্টি হয়।

যম তারপর ভয় দেখালেন যে তিনি সমস্ত তিব্বত জনশূন্য করে দেবেন। তিব্বতের জনসাধারণ তখন তাদের রক্ষক দেবতা মঞ্জুশ্রীর শরণাপন্ন হল এবং মঞ্জুশ্রী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে যমকে পরাজিত করলেন। যমান্তক ও বজ্রভৈরব মূলত একই। এই দেবতার নটি মস্তক, চৌত্রিশটি হাত এবং ষোলোটি পা রয়েছে। প্রধান মস্তকটি মহিষের আর সর্বোচ্চে রয়েছে মঞ্জুশ্রীর মস্তক [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১০ ও ১১**]। চৌত্রিশটি হাতে রয়েছে নানা আয়ুধ। গায়ের রঙ কালো এবং যুগনদ্ধ যমান্তক তার শক্তিকে আলিঙ্গনরত। যমান্তক তার ষোলোটি পায়ের তলায় পদদলিত করছেন পশু-পাখি, মানুষ এবং হিন্দু দেবতাদের ;—যাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা এবং শিবও রয়েছে। বিঘ্নান্তক মূর্তির মত এখানেও হিন্দু দেবতা যমকে ধ্বংস করে ও যমান্তক মূর্তি সৃষ্টি করে বৌদ্ধরা একদিকে হিন্দুধর্মকে হেয় এবং অবজ্ঞা করল, আর অন্যপক্ষে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলো।

পূর্ব জাভাতে যমকে সকল বাধা বিপত্তি সৃষ্টিকারী বা lord of obstacles আখ্যা দেওয়া হয়েছে ; যা কখনও কখনও গণেশের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে।

চীনে যমের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চীনা ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিং-এর বিবরণীতে অন্যান্য বৌদ্ধ দেবতাদের সঙ্গে যমের নামও রয়েছে। চীনদেশের বৌদ্ধধর্মে তিব্বতী লামাদের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শাক্য পণ্ডিত এবং ফাগপা এই দুই বৌদ্ধ পণ্ডিত মোগল সম্রাটদের বিশেষ করে কুবলাই খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চীনে বজ্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; ফলে তিব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীর অনেকেই চীনের ভাস্কর্যে ও চিত্রে স্থান পেয়েছে। যম তাদেরই অন্যতম। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে কুবলাই খান

যখন চীনের সম্রাট হলেন তখন বহু তিব্বতী সন্ন্যাসী ও লামা মোগল পৃষ্ঠপোষকদের কাজ করতে লাগলেন। তবে চীনের এই বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিকলায় নেপালী ও তিব্ব• শিল্পী ও কারিগরদের বিশেষ অবদান রয়েছে। নেপালী কারিগর অ-নি-কর তত্ত্বাবধানে ˊবিশজন নেপালী এবং তিব্বতী কারিগর একসঙ্গে চীনে চৈনিক-তিব্বতী-লামা শিল্পকলার বা Chinese Lamaist art tradition-এর সূত্রপাত করেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ শিল্পকলা আরো উন্নতি লাভ করল, যখন লামারা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে কুবলাই খান-এর রাজধর্ম বলে ঘোষণা করলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফুসিং রাজত্বকালে তৈরি যমের মুখ-ব্যাদান-করা ভয়ঙ্কর একটি মহিষারূঢ় মূর্তি দেখা যায় [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ২২**]। তার দুই হাতে করণমুদ্রা, চুল আগুনের হলকার মত উত্থিত, গলায় নরমুণ্ডমালা, সর্পালঙ্কার, মাথায় করোটির মুকুট এবং ষণ্মুদ্রা বা হাড়ের অলঙ্কারে ভূষিত। বক্ষে চক্র, আর হলুদ টুপি। বাহন মহিষ, এক শায়িত নারীর উপরে উপবিষ্ট।

তবে যমের থেকেও যমান্তক বা বজ্রভৈরবের প্রাধান্য এদেশে বেশি বলে মনে হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যম, যমান্তক, রক্তযমারির [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১৮**] মূর্তিগুলিকে পেয়ে থাকি। বহু মস্তক, বহু হাত ও বহু পা-সহ শক্তির সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ এই মূর্তিগুলি সত্যই দেখতে ভয়ঙ্কর। মিং রাজত্বকালের [১৫শ শতাব্দীর]। শক্তিসহ বজ্রভৈরব [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ২০**] এবং কুলিং রাজত্বকালের অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিসহ বজ্রভৈরব নানাবিধ আয়ুধ হাতে পশু, পাখি ও মানুষকে পদদলিত করে প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে [**দ্রষ্টব্য চিত্র নং ২১**]।

জাপানে যম,—এম্মা-তেন্ নামে পরিচিত। যমের শান্ত ও ভয়ঙ্কর দুই রূপই জাপানে দেখা যায়। দয়ালু রূপে তিনি হলেন এম্মা-তেন্, আর বিচারক হিসেবে তাঁর ভয়ঙ্কর রূপকে বলা হয় এম্মা-ও। এম্মা-ও ছিলেন নরকের রাজা। যম যখন এম্মা-তেন্ তখন তিনি দুঃখ দুর্দশা দূর করেন, দীর্ঘ আয়ু এবং সুখ শান্তি প্রদান করেন। চীন ও জাপানে দশজন রাজার উল্লেখ আছে, যারা মৃতদের জগতে বসবাস করতো এবং বিচারের সময় এদের শাস্তি দান করত। এই দশজন রাজার বিশেষ দেউলকে জাপানে এম্মা দো বা যমরাজার কক্ষ বলা হয়। যম এই দশজন রাজার অন্যতম ছিলেন। যম দেবতা বা এম্মা-ও। এম্মা-তেনের হাতে রয়েছে যমদণ্ড—বিচারের জন্য, আর তার বাহন হল উশি অর্থাৎ গোরু বা গোজাতীয় কোনো প্রাণী। তবে মহা বৈরোচনসূত্রে এম্মা-তেনের বাহনকে মহিষ রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এম্মা-তেনের মূর্তি ও চিত্র অঙ্কন নবম শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে। জাপানের বিভিন্ন মন্দিরে যেমন রিনকোজির ও জেন-ও-জি মন্দির, নারার ব্যিয়াকুগোজি মন্দিরে যমের মূর্তি এবং কিয়োতোর দাইগো-জিতে এবং জিংগো-জিতে এম্মা-তেনের বিরাট চিত্র রয়েছে।

মৃত্যুকে মহাসমারোহে নূতন করে বাঁচিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় মিশর দেশের জুড়ি পাওয়া ভার। তাদের সেই অক্লান্ত চেষ্টার ফসল ও নিদর্শন হল পিরামিডের ভেতরে মমি, যা সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করে রেখেছে। আর এই মৃত্যুদেবতার নাম হল অসিরিস;—যিনি একাধারে fertility cult বা উর্বরতার প্রতীক, গাছপালার অধিষ্ঠাতা দেবতা আবার মৃত্যুরও দেবতা এবং মৃতদের বিচারক [Judge of the Dead]। আর সেই হিসেবে ধর্মরাজ যমের সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। যম-যমীর মত দেবী আইসিস ছিল অসিরিসের ভগ্নী ও পত্নী।

অসিরিস ছিল নরকের প্রধান দেবতা। অসিরিসের মূর্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার মাথার দীর্ঘ মুকুট যাতে দুটি পালক গোঁজা রয়েছে, আর হাতের রাজদণ্ড।

মিশরের আর একজন মৃত্যুর বা সমাধিক্ষেত্রের দেবতা হলেন অ্যানুবিস [**দ্রষ্টব্য রঙিন চিত্র নং ৪**]—যাকে god of embalmment বলা হয় ; অর্থাৎ তিনি সুগন্ধি বস্তু দিয়ে মৃতদেহ সংরক্ষণ করতেন এবং এইভাবেই মমি থেকে পুনর্জীবন লাভের ভিত্তি তৈরি করতেন। মৃতের আত্মার বিচারের সময় অ্যানুবিস মৃত ব্যক্তিকে অসিরিসের বিচারালয়ে পরিচালিত করতেন। সেখানে মৃতের হৃৎপিণ্ড পালকের সঙ্গে ওজন করা হয় এবং বিয়াল্লিশ জন কর্মচারি নানা কাজের ওপর প্রশ্ন করে এবং হৃৎপিণ্ড ওজনের পর থত [Thoth] তার বিচার ঘোষণা করেন। থত ভারতীয় চিত্রগুপ্তের মত ধর্মরাজ অসিরিসের জন্য মৃতদের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখে। অ্যানুবিসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার শেয়ালমুখ আর রঙ-চঙে পোশাক।

মৃত্যুর দেবতা প্রায় সকল দেশেই রয়েছে ; তবে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মায়া সভ্যতার মৃত্যুদেবতা আপুছ [Ah Puch] বা যুম সিমিল [Yum Cimil][**দ্রষ্টব্য রঙিন চিত্র নং ৩**], যার সঙ্গে ভারতের যমরাজের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। আন পুছ বা যুম সিমিল সকল জীবন বা প্রাণের ধ্বংসকারী এবং নরকের প্রভু হিসেবে পরিচিত। যুম সিমিল নামটি ভারতের যমের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধারণত তিনি কঙ্কাল বা মৃতের মস্তকসহ রূপায়িত হন;—আর প্রায়ই তিনি যুদ্ধ ও মনুষ্য বলিদানের দেবতা হিসাবে পরিচিত তাদের সঙ্গে উপস্থিত হন। মায়া সভ্যতার দেবতাদের মধ্যে আপুছ বা যুম সিমিল হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দেবতা। শুধু যে মানুষের অপেক্ষায় থাকেন বা গাছের বৃদ্ধিতে বাধা দান করেন তা নয়, তিনি সক্রিয়ভাবে উর্বরতার দেবতাদের প্রতিরোধ করেন।

তিনটি অশুভ লক্ষণযুক্ত প্রাণী মায়া সভ্যতার পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে ;—যারা হল সারমেয় বা কুকুর, উলূক বা পেচা, আর হল moan bird বা বিলাপ করার পাখি ; যে কখনো কখনো আধা শকুনি আধা মানুষের রূপ ধারণ করে। এই তিনজনই মৃত্যুর দেবতার সঙ্গে থাকে। এখানেও ভারতীয় যমের কুকুর, পেঁচা ও কপোতের সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে।

মৃত্যুর দেবতার চিত্রে দেখা যায় নগ্ন দেবতা সিংহাসনে উপবিষ্ট। সামনে রয়েছে শস্যের দেবতা। হাতে রয়েছে শস্যে পূর্ণ পাত্র। উভয়ের মুখই যোদ্ধাদের মত নানা রঙে রঞ্জিত এবং উভয়েরই হাত, পা এবং গলা সবুজ জেড পাথরের পুঁতির মালায় সজ্জিত ; এগুলি দেবতাদের মধ্যে ধ্বংস ও সৃষ্টিশক্তির প্রতীক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর দেবতা ও মৃতের বিচারক হিসেবে যমদেবতা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই, তবে তাদের চেহারাতে ও কাজে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে ভীতিজনক ও ভয়ঙ্কর চেহারা হল তিব্বতের যমদেবতার।

তথ্যসূত্র :

1 Ferdinand Anton - Art of the Maya

2 Wolfhert Westendorf - Painting, Sculpture and Architecture of Ancient Egypt

3. F Sierksma - Tibet's Terrifying Deities
4. Kusum P Merh - Yama- The Glorious Lord of the other World
5. Benoytosh Bhattacharyya - An Introduction to Buddhist Esoterism
6. Pratapaditya Pal - The Arts of Nepal
7. ড দ্বিজেন্দ্রনাথ বকসি - হিন্দু দেবদেবী—জাপানের বৌদ্ধ ধর্মে।
8. Sipra Chakravarti - Tibetan Thankas in the Indian Museum

❐

যম : সংগ্রহশালায়

নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

যমে মানুষে টানা-টানি এ-কথা বহু শুনেছি। এমনকি চলচ্চিত্রে যমালয়ে জীবন্ত মানুষের যমকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানোও দেখেছি। কিন্তু সম্পাদক ঘাড়ে যম চাপিয়ে দিয়ে বললেন: 'যমকে আমার চাই। খোঁজো 'পটে'র কোথায় সে লুকিয়ে আছে।' তাই হন্যে হয়ে খুঁজছি।

প্রথমেই স্মরণ নিলাম দেবাদিদেব মহাদেবের থান ওরফে আশুতোষ সংগ্রহশালায়। 'বিশ্বের বিদ্যালয়ে', হোঁচট খেলাম। ভাবিনি যমের খোঁজে গিয়ে পাব নরকযন্ত্রণা।

মানুষ-জন কম। সবাই বললেন কর্ণধার কেউ নেই। যিনি ছিলেন অবসর নিয়েছেন। খুঁজতে গিয়ে দেখি ঐ অবসরপ্রাপ্তই বিরাজমান। বললেন যমের খবর তাঁর জানা নেই। নথি-পত্র [এ্যাকসেসান রেজিস্টার, ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ] পাওয়া যাবে না। দেবার কেউ নেই। এখানে পটে যম নিয়ে আগে কারো মাথাব্যথা হয়নি, তাই সে নথিও নেই। পরামর্শ দিলেন বীথিকায় [gallery] কিছু আছে, দেখতে হবে সেখানে। বীথিকায় মাত্র ১৯টি পট বহুদিন ধরেই আছে। প্রায় বিবর্ণ, দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত, মলিন কাঁচের মধ্যে ঝোলান আছে। তাদের নাম-ধাম সব জায়গায় নেই। তার মধ্যেই দেখলাম দুটি চৈত্য পটের শেষের দিকে আগে জগন্নাথ পরে চিত্রগুপ্তসহ যম এবং শেষে নরকের কিছুটা অংশ দেখতে পেলাম। বেশি দুরে যাওয়া সময় এবং খরচসাপেক্ষ। তাই ঘরের কাছে বেহালার সরকারি লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালায় উঁকি দিলাম। বেহাল অবস্থা। বহুদিন ধরে সংরক্ষক নেই। নথি দেখানোর লোক নেই। গ্রন্থাগারের দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি খুবই অসুস্থ, ছুটিতে। তাই যমের খবর পেলাম না। ওখানকার এক বন্ধু ঘটনা শুনে বললেন: 'তুমি যমের অরুচি, তাই যম তোমায় দেখা দেননি।'

অগত্যা এলাম গুরুগৃহে। যেখানে গুরু সবসময় সবার প্রতি সদয়। তাঁর ভাণ্ডারে আছে বিবিধ রতন। যেন হীরের খনি। ঘা মারলেই চিক্ চিক্।

কথায় বলে, সব সংগ্রহশালা একবার 'গুরুসদয় সংগ্রহশালা' বারবার। এখানে যমপট দেখার আগে পট-পটুয়া-যম সম্পর্কে তথ্য আহরণ প্রয়োজন। সংস্কৃত 'পট্ট' বা পট বলতে মূলত বোঝায় কাপড়। প্রাচীন ভারতে কাপড়ের উপর চিত্র লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল। পট বলতে অতীতে সেই কাপড়কে বোঝাত, বর্তমানে পট বা চিত্র বোঝায়। বর্তমানে কাপড়ের চাইতে কাগজেই বেশি পট আঁকা / লেখা হয়। পট সাধারণত দুই প্রকার, জড়ানো পট এবং চৌকোপট। এর মধ্যে চক্ষুদান পটও আছে।

যারা এই পটের চিত্র তৈরি করে, তাদের পটুয়া বা চিত্রকর বলে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী,
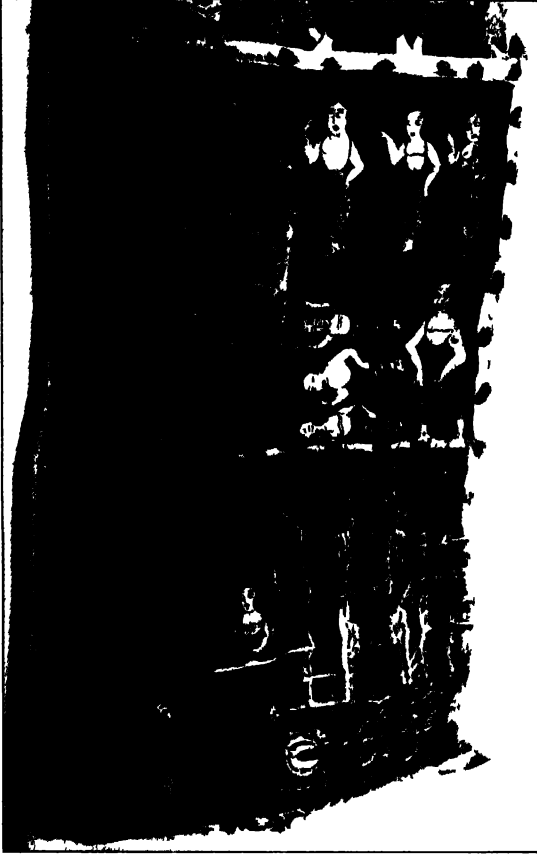
চিত্র নং ৫

মেদিনীপুবেব জগন্নাথ পটেব যম
গুরুসদয সংগ্রহশালাব সৌজন্যে

চিত্র নং ৬

কলকাতাব যম

ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জাত নয় পুত্রের অন্যতম পুত্র 'চিত্রকর' বর্তমান পটুয়া জাতির আদিপুরুষ। এই চিত্রকরেরা আদিতে ছিলেন সূর্যের উপাসক। বৌদ্ধ প্রভাবে সম্ভবত এঁরা সূর্যের উপাসনা ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। অথচ বর্তমানে আমরা দেখি চিত্রকর বা পটুয়ারা অর্ধেক হিন্দু এবং অর্ধেক মুসলমানের আচার-আচরণ অনুসরণ করে। কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের তথ্য অনুযায়ী, অশাস্ত্রীয় চিত্র বা ছবি আঁকার জন্য চিত্রকরেরা কুপিত ব্রাহ্মণদের শাপে সমাজে পতিত হয়েছেন। যে ধর্মই তারা ধরুক বা ছাড়ুক বা বর্তমানে পালন করুক না কেন, এরা তাদের কলাবিদ্যার মধ্যে বহিরাগত কোন ধারার অনুপ্রবেশ ঘটতে দেয়নি এটাই লক্ষণীয়। আজও তারা গণশিক্ষার আদি মাধ্যমটির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে। শত দারিদ্র্যেও তাদের হারিয়ে যেতে দেয়নি।

প্রাচীনকাল থেকেই এই পটুয়ারা পৌরাণিক ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে পট লেখে বা আঁকে। এমনকি ইসলাম ধর্মের বড় বড় পীর এবং গাজীদের অলৌকিক বর্ণনার কথাও পটে এঁকে প্রচার করত। প্রচারের প্রাচীন পদ্ধতিটি সমাজ-সচেতনতার, জনশিক্ষার প্রয়োজনে বজায় রেখেছে।

আজও পৌরাণিক এবং আধুনিক কাহিনী নিয়ে পট আঁকার শেষে যম, যমের বিচার, কর্মফল অনুযায়ী নরকযন্ত্রণা বা স্বর্গসুখ ভোগের দৃশ্য দেখায়। জড়ানো পটের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় তাকে পটুয়া সঙ্গীত বলে।

ভরণী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যম ভরণী নক্ষত্রের। যমো। দেবতা অধিষ্ঠাত্রী মস্যাঃ। ভরণী নক্ষত্র।—[বিশ্বকোষ] মার্কণ্ডেয় পুরাণে আমরা যমের জন্ম বৃত্তান্ত পাই—বিশ্বকর্মার সংজ্ঞা নামে এক কন্যা ছিল। রবির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সংজ্ঞা রবিকে দেখেই তার চোখ বন্ধ করে ফেলে। এই জন্য রবি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এই অভিশাপ দেয় যে,—তুমি আমায় দেখে যেমন চক্ষুসংযম করলে, তোমার গর্ভে যে পুত্র হবে সেই পুত্রের নাম হবে যম, অর্থাৎ প্রজাদের সংযমন করবে। সংজ্ঞা রবির এই নিদারুণ অভিশাপ শুনে পুনরায় তার প্রতি চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ফলে রবি পুনরায় তাকে বলে, তুমি আবার যখন আমাকে চঞ্চল দৃষ্টিতে দেখলে তখন তোমার যে কন্যা হবে সে চঞ্চলা নদীতে পরিণত হবে। কালক্রমে এঁর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। এই পুত্র প্রজাসংযম যম এবং কন্যা যমুনা নামে খ্যাত। এই রবিকন্যাই পরে যমুনা নদী নামে খ্যাত। মূল শ্লোকটি পরিচিত এবং বহুব্যবহৃত বলে এখানে আর উদ্ধৃত হলো না।

অন্যান্য পটের শেষে বা আলাদাভাবে পটুয়ারা যমকাহিনীর চিত্র রচনা করে তাই এদের পটকে যমপট এবং এদের যমপট্টিকার বলে। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত। সেখানে যমপটুয়ার কথা লেখা আছে :

"রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের পীড়ার কথা শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন শিকার হইতে ফিরিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন:

......দোকানের পথে অনেকগুলি কৌতূহলী বালকদ্বারা পরিবৃত একজন যমপট্টিক বা যমপট-ব্যবসায়ী পট দেখাইতেছে। লম্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে ধরিয়াছেন, ডান হাতে একটা শরকাঠি দিয়া চিত্র দেখাইতেছে। ভীষণ মহিষারূঢ় প্রেতনাথ প্রধান মূর্তি। আরো অনেক

মূর্তি আছে। যমপট্টিক গাহিতেছে:

মাতা পিতৃ সহস্রাণি পুত্রদ্বার শতাধিচ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্যতে কস্য বা ভবান্।।

বিশাখদত্ত-প্রণীত সুবিখ্যাত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত। সেখানেও যম-পটের উল্লেখ আছে: "নানাস্থান হইতে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রে ফিরিয়া চাণক্যের গৃহে প্রবেশ-মুখে :

চর-পণমহ জমস্স চলনে কিং কজ্জং দেবতএহিং অন্নেহিং।
এসোক্খু অন্নভত্তাণং হরই জীঅং চডপডন্তং।।
অপিচ প্যারিসসস্ জীবিদব্বং বিসমাদো হোই
ভক্তিগহিআদো।
মাবেই সব্বলোঅং জো তেন জমেন জীয়ামো।।
জাব এদং গেহং পবিসিঅ জমপভং দংসঅন্তা
পবিসিঅ গীআইং গাআমি।।"

একইভাবে যমপট আজও দেখান হয়। রামায়ণপট, কৃষ্ণলীলাপট, গৌরাঙ্গপট, মনসাপট, শক্তিপট, দশাবতারপট, গাজীপট, সাবিত্রীপট, সাঁওতালপট-এর শেষে যম, যমের বিচারে পাপীর দণ্ড, নরকযন্ত্রণা ভোগ, পুণ্যবান ব্যক্তির স্বর্গের সুখ, পতিতা হয়েও পুণ্য কাজ করায় বীরভূমের বেশ্যা হীরামণি স্বর্গে যায়—এসব দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। নরকদৃশ্য ভয়াবহভাবে রূপায়িত হয়। এই সমস্ত দৃশ্যের এবং কোন্ পাপে কোন্ দণ্ড হয় পটুয়া তা তার গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করে :

রবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে যম কারু দণ্ড নাহি করে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবারাত্র লেখে
যার যেমন কপালের লিখন বিধাতা লিখেছে।
ভাল লোক হলে দেখুন কৃষ্ণদূতে যায়
মন্দ লোক হলে যমদূত সদ্য যান।
কেউ ধরে চুলের মুষ্টি কেউ ধরে পায়
পাপী লোক হলে শীঘ্র করে যমালয় পাঠায়।
আপনার পতি ত্যাজ্য কোরে যে নারী পরপতি সেবা করে
তার মত পাপী দেখুন নাইকো সংসারে
খেজুর গাছে চড়ে নারীর যমদণ্ড করে।
ভাল জল থাকতে যে জন মন্দ জল দেয়
মৃত্যুকালে নরককুণ্ডের জল তাকে যমদূতে দেয়।
সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলি চার যুগে পড়িল
কলির রাজা স্ত্রীকে ঘাড়ে লয়ে, বুড়া মার মাথায়
চাল ডালের টোপলা[১] দিয়ে গঙ্গাস্থান চলিলেন।

টেঁকি পেতে যে জন ধান্য না ভানতে দেন
মৃত্যুকালে লোহার টেঁকি পেতে চিড়া কুটে খায়।
মিথ্যা কথা মিথ্যা প্রবঞ্চনা মিথ্যা সাক্ষী দেন
গুরু গোবিন্দ নাম যিনি না লেন
তপ্ত সাঁড়াশী ক'রে তার জিহ্বা টেনে লেয়।
হীরামুনি নাম বেশ্যা ছিল গহক[২] পাপের পাপী
অন্নদান বস্ত্রদান সাধু সঙ্গে হরিনাম করে
প্রাণ পরিত্যাগ করিল কৃষ্ণদূতে পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠে লয়ে গেল।
যা খাওয়াবেন যা বিলাবেন ঐ না রহিবে সার
কৃষ্ণ নামে দান কল্লে বৈকুণ্ঠে ধরা রয়।
বড় ঘর বড় দুয়ার বড় কর আশা
সকল দ্রব্য পড়ে রইবে গঙ্গাতীরে বাসা।
[আয়াস-নিবাসী গোপাল চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

এই গানটি গুরুসসদয় দত্ত সংগৃহীত একটি কৃষ্ণলীলা পটের শেষাংশে যমপ্রসঙ্গ : 'পটুয়া সঙ্গীত' থেকে নেওয়া।

এই যমপটে যমকে দেখাবার আগে এবং নরকযন্ত্রণা দেখাবার পরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা এই ত্রিমূর্তির চিত্র দেখান হয়। বিশেষ করে বীরভূমের যমপটে বিষয়টি লক্ষণীয়। অনেকে মনে করেন এই তিনটি মূর্তির সঙ্গে বুদ্ধ-ধর্ম-এবং সংঘ এই ত্রিমূর্তির বিশেষ মিল রয়েছে। এটা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব জাত, যা আজও বজায় রয়েছে। লক্ষণীয়, বিষ্ণুর দশ অবতারের এক অবতার বুদ্ধ বা জগন্নাথ।

বেশ কিছু আদিবাসী সমাজের চিত্রের/পটের মধ্যেও যমপট পাওয়া যায়। সেখানে মারাং বুরু এবং তাঁর শাস্তি দানের চিত্র ভয়াবহভাবে দেখানো হয়েছে।

অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকেই যমের সেই শেষ বিচারের আশায় দিন কাটাতে হবে। তথ্য আহরণ শেষে গুরুসদয় সংগ্রহশালার যমপট দেখতে দেখতে চিরকালীন সত্যদর্শনের অপেক্ষায় রইলাম।

পট-সম্পর্কিত তথ্য:

'গুরুসদয় সংগ্রহশালা'য় রক্ষিত জড়ানো [বিভিন্ন বিষয়ের] পট-এর সংখ্যা মোট ২৭০টি।

১. রামায়ণপট : ৫৬টি :

জেলাগতভাবে :

বীরভূমের—৪০টি পটের মধ্যে ২৩টিতে যম-জগন্নাথ আছে :

ক্র: স:	এ্যাক্সেসন নং	আগে	যম জগন্নাথ	নরক	স্বর্গ	জগন্নাথ	
১।	জি-এম ১৬১৬	-	-	১	১	-	- -
২।	জি-এম ১৬১৭	-	১	১	২	-	- -

৩।	,, ,, ১৬২১	-	-	১	৩	১	- -
৪।	,, ,, ১৬২২	-	-	১	২	-	- -
৫।	,, ,, ১৬২৩	-	-	১	১	-	- -
৬।	,, ,, ১৬২৯	-	১	১	-	-	- -
৭।	,, ,, ১৬৩২	-	-	১	৩	১	- -
৮।	,, ,, ১৬৩৫	-	-	১	২	১	- -
৯।	,, ,, ১৬৩৬	-	-	১	২	১	- -
১০।	,, ,, ১৬৩৮	-	-	১	১	১	- -
১১।	,, ,, ১৬৩৯	-	-	১	২	-	- -
১২।	,, ,, ১৬৪০	-	১	১	২	-	- -
১৩।	,, ,, ১৬৪২	-	-	১	১	-	- -
১৪।	,, ,, ১৬৪৪	-	-	১	-	-	- -
১৫।	,, ,, ১৬৪৫	-	১	১	১	-	- -
১৬।	,, ,, ১৬৪৮	-	-	১	১	-	- -
১৭।	,, ,, ১৬৪৯	-	১	১	১	-	১ -
১৮।	,, ,, ১৬৫০	-	-	১	২	-	- -
১৯।	,, ,, ১৬৫২	-	-	১	৩	১	- -
২০।	,, ,, ১৬৫৩	-	-	১	২	১	- -
২১।	,, ,, ১৬৬১	-	-	২	২	-	- -
২২।	,, ,, ১৬৬২	-	১	১	১	-	-
২৩।	,, ,, ১৬৬৫	-	-	১	১	১	- -
মোট : ২৩			৬	২৪	৩৬	৮	১

বর্ধমানের ৫টির মধ্যে ৪টিতে যম-জগন্নাথ আছে :

১।	জি-এম ১৬৫১	-	৩	১	-	-	-
২।	,, ,, ১৬৫৫	-	১	১	-	-	-
৩।	,, ,, ১৬৬৪	-	১	১	-	-	-
৪।	,, ,, ১৬৬৬	-	১	৩	-	-	-
মোট : ৪		-	৬	৬	-	-	-

মুর্শিদাবাদের ২টির মধ্যে ১টিতে

১।	জি-এম ১৬৬৩	-	১	২	১	-	-

মেদিনীপুর-এর ৯টি পটের মধ্যে একটিতেও নেই।

২। কৃষ্ণলীলা পট ৬৩টি

জেলাগতভাবে :

বীরভূমের ২৭টি পটের মধ্যে ১৬ টিতে যম-জগন্নাথ আছে :

১।	জি-এম ১৭৩২	১	১	১	-	-	-
২।	„ „ ১৭৩৩	১	-	-	-	-	-
৩।	„ „ ১৭৩৫	-	১	৩	-	-	-
৪।	„ „ ১৭৩৬	-	১	১	১	-	-
৫।	„ „ ১৭৩৮	-	১	২	-	-	-
৬।	„ „ ১৭৪৩	-	১	১	-	-	-
৭।	„ „ ১৭৪৫	-	১	-		-	-
৮।	„ „ ১৭৪৬	-	১	-	-	-	-
৯।	„ „ ১৭৫২	-	১	১	১	-	-
১০।	„ „ ১৭৫৩	-	১	-	১	-	-
১১।	„ „ ১৭৫৬	-	১	২	১	-	-
১২।	„ „ ১৭৫৭	-	১	১	-	-	-
১৩।	„ „ ১৭৬২	-	২	১	-	-	-
১৪।	„ „ ১৭৬৪	-	১	-	-	-	-
১৫।	„ „ ১৭৬৫	-	১	২	১	-	-
১৬।	„ „ ১৭৬৬	-	১	১	১	-	-
মোট : ১৬		২	১৬	১৬	৬	-	-

মেদিনীপুর-এর ৩৩টির মধ্যে ৩টিতে যম জগন্নাথ আছে :

১।	জি-এম ১৭২৯	-	১	৪	১	-	-
২।	„ „ ১৭৩০	-	১	-	-	-	-
৩।	„ „ ১৭৪৯	-	১	১	১	-	-
মোট · ৩		-	৩	৫	২	-	-

বাঁকুড়ার ১টি
বর্ধমানের ১টি
মুর্শিদাবাদের১টি

৩। গৌরাঙ্গলীলা পট ১১ টি

বীরভূমের ৫টি পটে ৫টিতে যম-জগন্নাথ আছে

১।	জি-এম ১৭১৩	-	১	২	১	-	-
২।	„ „ ১৭১৬	-	১	১	-	-	-
৩।	„ „ ১৭৮৭	-	১	১	-	-	-

৪।	,, ,, ১৭৮৮	-	১	১	-	-	-
*৫।	,, ,, ১৭৮৯ [অর্ধেক]	১	১	১	১	-	-
৬।	,, ,, ১৮৭২	-	১	৫	-	-	-
মোট : ৬		১	৬	১১	২	-	-

মেদিনীপুরের ৭৫টি পটের মধ্যে ৪টিতে যম-জগন্নাথ আছে

১।	জি-এম ১৭১৭	-	১	১	১	-	-
*২।	,, ,, ১৭৮৯ [অর্ধেক]	-	১	১	১		-
৩।	,, ,, ১৭৯০	-	-	-	১	-	-
৪।	,, ,, ১৭৯১	-	১	১	১		
৫।	,, ,, ১৭৯২	-	১	১	১	-	-
মোট : ৫			৪	৪	৫	-	-

বাঁকুড়ার ১টি পটে কিছু নেই।

৪। মনসা পট ২৮টি

বীরভূমের ১টিতে কিছু নেই

মেদিনীপুরের ২৩টিতে কিছু নেই

বাঁকুড়ার ৪টির মধ্যে ১টিতে আছে

১।	জি-এম ১৬৮৮	-	১	-	-	-	-

৫। শক্তি পট ৯টি

বীরভূমের ১টির মধ্যে ১টি তেই যম-জগন্নাথ আছে

১।	জি-এম ১৬৯৫	-	১	৩			১

বাঁকুড়ার ৮টির মধ্যে ১টিতে আছে

১।	জি-এম ১৬৮৯	-	-	১	-	-	-

৬। দশাবতার ২টি

বীরভূমের ২টি পটের মধ্যে ১টিতে যম-জগন্নাথ আছে

১।	জি-এম ১৬৬৭	১	১	৩			

৭। গাজী ৮টি

কুমিল্লার ৮টি পটের মধ্যে ২টিতে যম আছে (বাংলাদেশ)

১।	জি-এম ১৬৭২	-	-	১	-	-	-

২।	,, ,, ১৭০৪	-	-	১	-	-	-
মোট : ২				২			

৮। সাঁওতাল পট ১২টির মধ্যে ৩টিতে যম-জগন্নাথ আছে

সাঁওতাল পট ১২টি

১।	জি-এম ১৭২৩	১	১	১	-	-	-
২।	,, ,, ১৭২৪	-	১	১	-	-	-
৩।	,, ,, ১৭২৬	-	-	১	-	-	-
মোট : ৩		১	২	৩			

৯। সাবিত্রী পট ২টি

বীরভূমের ২টি পটেই যম তার অনুচরদের নিয়ে সাবিত্রী-সত্যবানের সামনে, শুধু সাবিত্রী যম এবং শেষে যম সত্যবানের প্রাণ ফেরৎ দিচ্ছেন এই চিত্র আছে। নরকের দৃশ্য নেই।

১০। যমপট ৫টি

বীরভূমের ৫টি পটেই যম-জগন্নাথ-নরক দৃশ্য আছে।

১।	জি এম ১৭০৫	১	১	২	-	-	-
২।	,, ,, ১৭০৬	-	১	২	১	-	-
৩।	,, ,, ১৭০৭		১	১	৩	১	২ চিত্রগুপ্ত এবং অন্যরা
৪।	,, ,, ১৮৫৪	২	১	১	-	-	-
৫।	,, ,, ১৮৫৫	-	১	১	১	-	-
মোট . ৫		৩	৫	৭	৫	১	২

১১।	শিবের চাষবাস	-	বীরভূমের	-	১টি	পট
১২।	চাষ-বাস	-	,,	-	১,,	,,
১৩।	চণ্ডীমঙ্গল	-	বাঁকুড়ার	-	১,,	,,
১৪।	নহুষ	-	মেদিনীপুর	-	১৯,,	,,
১৫।	সাহেব পট	-	,,	-	৫,,	,,
১৬।	বৈষ্ণব পট	-	,,	-	৩,,	,,
১৭।	মনোহর ফাঁসুড়ে	-	,,	-	৫,,	,,
১৮।	হরিশ্চন্দ্র	-	,,		২,,	,,
১৯।	দাতা কর্ণ	-	,,	-	২,,	,,
২০।	কীচক বধ	-	,,	-	১,,	,,

১১-২০ এই ১০টি বিষয়ের তিনটি জেলার ৩৭টি পটে যম-জগন্নাথ-নরক দৃশ্য কিছুই নেই

আমরা বীরভূমের এবং অন্যান্য জেলার পটের শেষে যমকে দেখতে পাই তিনি কর্মফল অনুযায়ী বিভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা করছেন তাঁর ক্ষমতাবলে। কিন্তু মেদিনীপুরের কিছু জগন্নাথ ও চৈতন্য পটে [গুরুসদয় সংগ্রহশালার রক্ষিত জি এম-১৭৯২, ১৭৯৭, ১৭৯৮, ১৭৯৯, ১৮০১, ১৮০২, ১৮০৩, ১৮০৪, ১৮০৫, ১৮০৬ ১৮০৭, ১৮০৮] দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছবির গল্প। এইসব পটে ৮ থেকে ১০টি চিত্র আছে। এখানে দেখা যায় প্রথমে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, কোন রাজবাড়ি-জোড়াসিংহ-রাজসভা, একটি পূজিত বৃক্ষ, অগ্নিকুণ্ডে কালো পাখীর পতন, রথে চড়ে সেই পাখীর গমন, শিব-পার্ব্বতী-ব্রহ্মা, নারদ, রাজসভা-বিশ্বকর্মা, বেশ কয়েকজন নারী, পুরুষ ভক্ত, চৈতন্যের-জন্ম-সন্ন্যাস-নগরকীর্তন, রান্নাঘরে চৈতন্য, এরপর নীল বা কালো মহিষের পিঠে সবুজ যম। যমদূতের হাতে সূতোয় বাঁধা মৃতদেহ। কিছু বৈষ্ণব ভক্তের যমদূতকে বাধাদান। তারপর কিছু ব্যক্তি রথ টানছে রথে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা চিত্রিত আছে। এই পটের গান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

পৃথ্বীরাজ সেন মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ রহস্য' বইটির বিভিন্ন অংশের বর্ণনা থেকে এই সব চিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যা মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী থেকে নেওয়া। এখানে বর্নীত আছে।

সেই কাহিনী নিশ্চয়ই পটুয়াদের বংশপরম্পরায় জানা ছিল। তাই তাদের জগন্নাথ এবং চৈতন্য পটে যে চিত্র এঁকেছেন, সেখানে কোন নরক দৃশ্য নেই। যমকে ফিরে যেতে হচ্ছে শূন্য হাতে। কারণ পুরী বা নীলাচলে ভগবানের দেহাস্থি রয়েছে। তাই সেখানে যমের বিচার চলে না। ফলে, বীরভূমের পটের ক্ষমতারূপ যমের ও নরকের দৃশ্য এবং মেদিনীপুরের পটের ক্ষমতাহীন শূন্য হাতে ফেরা যমের চিত্র লক্ষ্মীর কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

তথ্য প্রমাণ থেকে পাওয়া যায়, গুরুসদয় সংগ্রহশালার বিভিন্ন বিষয়ের মোট জড়ানো পটের ২৬৫ টির মধ্যে যম-জগন্নাথ-নরক-স্বর্গ ইত্যাদি দেখান আছে মোট ১০টি বিষয়ের ৭৩ টি পটে। এর মধ্যে

বীরভূমের—৫৪টি
মেদিনীপুরের—৭টি
বর্ধমানের—৪টি
সাঁওতাল পরগনার—৩টি
বাঁকুড়ার—২টি
কুমিল্লার [বাংলাদেশ]—২টি
মুর্শিদাবাদের—১টি পট রয়েছে।

অতএব আমরা এই সংগ্রহশালায় ৭টি জেলার মোট ৭৩ টি পটের মধ্যে যমকে পেলাম। এই কারণেই প্রমাণিত হয় বীরভূমেই যমপট বেশি।

যম : জেলেপাড়ার সঙে

পটুয়ার চলনচিত্রের যমের কথা বলতে বলতে সমাজের লুপ্তপ্রায় চলমান প্রতিবাদী সমাজ-চিত্র কলকাতার আদি সংস্কৃতি 'জেলেপাড়ার সঙ' এর কথা মনে পড়ে। এখানে পটের ছবি

নয়, পথ চলতে চলতে শুনতে এবং দেখতে পাওয়া যায় আর এক চিত্র পট। যার অন্যতম বিষয় সমাজের অবক্ষয় এবং সেখানে ভয়ঙ্কররূপে উপস্থিত যমরাজের বিচার। এখানে চিত্রগুপ্ত ঘুষ নেয়। ১৪০০ সনের সূচনায় জেলেপাড়ার সঙ পথে নামে যমরাজকে নিয়ে। চিত্রগুপ্তের খাতায় নথি ভুক্ত এক যুবকের অপকর্মের সংবাদ শ্রবণ করে ক্লান্ত যমরাজের বিচারের প্রহসন·

বর্তমান লেখক যমরাজ হিসাবে ঐ সঙ-এ অংশগ্রহণ করেন গানটি [প্রহসনটি] রচনা করে দেন জেলেপাড়ার সঙ-এর নব পর্যায়ের উদগাতা শ্রীশঙ্করপ্রসাদ দে।

জেলে পাড়ার সঙ : ১৪০০
যমরাজের বিচার
[তন্দ্রা থেকে জাগিয়া]

যমরাজ : চিত্রগুপ্ত, এটা কেডা কোত্থেকে আইল হেতা
ব্যাটা 'লাল' করলি গোটা 'গা'টা তবুও তোকে যম ধরে?

যুবক : মাথায় মেরেছে ও দলের দু'কড়ি, ছোরার আঘাতে ছট্‌ফট্ করি।
একপাত্র জল দাও দয়া করি, জল বিনা ছাতি, ফাটিযা যায়।।

যমরাজ : [হাসতে হাসতে] মাথা ভাঙ্গি তুই মইর‍্যা গেলি, পানি খাবি কেমনে;
নেই তোর খুলি
চিত্রগুপ্ত আইলে শুনবি সব বুলি, এহন, এট্টু ঘুমাইয়া লই।।
[চোখ বন্ধ—নাসিকা গর্জন]

চিত্রগুপ্ত : মহারাজ, আমি এসে গেছি এবে
শব্দ রোধ করো নয়তো ভুগিবে
শব্দ পল্যুসানে ধরে নিয়ে যাবে
ইন্দ্র ব্যাটা এক ফেঁদেছে কল।

যমরাজ : ক্যান্ ক্যান্ ইন্দ্র লিয়ে যাবে ধরে
পল্যুসান্-এ্যাক্টো ক্যাবল স্বর্গের তরে
এখন নরক বলিছে এডারে
তখন পল্যুসান্ হবে হেথায়।।

চিত্রগুপ্ত মহারাজ, এবে শুনো এর কথা, যে রক্তের দোষে মরেছে এ ব্যাটা
আছে সেন্টিমেন্টের সেই ছিটেফোঁটা, ক্ষুদিরাম কানই মরেছে যে রোগে
স্বাধীনতার পর ভেবেছিল এরা, কাজ পাবে আর খাবে থালাভরা
ভাঙ্গিল যখন স্বপ্ন বুকভরা, আবার ক্ষেপিল সেন্টিমেন্টের ঘায়ে।
মজুতদার আর জোতদারে বলেছে, 'ফিরিয়ে দিতে হবে যাদের লুটেছে সে'
মানে নাই তারা, তাদের বাঁচাতে পুলিশ সৈনিক এদের খতম করেছে ।
খণ্ড-বিখণ্ড হইল উহারা, ভুল চলার পথের মাশুল দিল তারা
স্রোত হারায়ে মরুপথে গিয়ে ক্রমে ক্রমে ওরা হারালো ধারা ।

বাকিদের ক'টি ডেকে নিয়ে যায় ইলেক্‌সান্‌ মেশিনে জুড়ে দিয়ে হায়
দূষিত রক্তের বীজ ফুঁড়ে দিয়ে লাগায় এদের নিজেদের কাজে।।
সামনে ঠেলে দিয়ে দাদারা বলে, ব্যাকে আমি আছি দাঁড়িয়ে
ভাই বন্ধু ছিল যারা দুদিন আগে, বোমা ছুরি মারে তাদেরো গায়।।
তবু ছুটে যায় এরা বন্যার স্রোতে, আর্ত মানুষ আর পশুকে বাঁচাতে
পাড়ার গরীব কন্যার বাপকে চাঁদা তুলে অশনি থেকে বাঁচায়
শ্মশানযাত্রী যদি নাহি জোটে, ছুটে যায় ওরা বৃষ্টির রাতে
গাড়ি না পেলে পাঁজাকোলা করে হাসপাতালে রোগী বয়ে নিয়ে যায়।
ব্যবসাদার আর জুয়াড়ী মাথারা, স্মাগলার তথা দেশচালকেরা
বেকারীর সুযোগ নিজ স্বার্থে ওরা নোংরা কাজে এদের নামিয়ে দেয়।।
এদের ভালোর জন্য ওনারা, এনেছেন নানা বিনোদন পশরা
বুঁদ করেছে মৌতাত দিয়ে, যেন কভু এদের কেউ শোধনা না করে।
এরাই সিনেমা টিকিট ব্ল্যাক করে, পুজোর চাঁদা তোলে—জোর করে
ইভটিজারের ঘৃণ্য খেলায় সে মা বোনেদের ঠোকর মারে।।
এরাই চুল্লুর ভাটি আগলায়, ড্রাগের প্যাকেট পাচার করে দেয়
ধরা পড়ে মার খেয়ে জেলে যায়, আসল লোক চলে মাথা উঁচু করে।
এদের পূর্বসূরী দাদু বাবা-কাকা যারা দেখেছিল আদর্শ নেতা
স্বামীজী নেতাজী-সূর্য যতীন বাঘা, এরা ধামাচাপা পড়েছে এবে।
ওদের মূর্তি সামনে সাজিয়ে আধুনিক নেতা বিগলিত হয়ে
লোকদেখানো আদর্শের বুলিতে উৎসবের নামে টাকা কামায়
এখন আদর্শ সেই নেতারা, যে আইনী সম্পদে যাদের ঘর ভরা
অস্ত্র কেনার কমিশন নেড়ে বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমায়।
শেয়ার কেলেঙ্কারীর সাথে যারা আছে, নামী দামী তারা সবাই এ জগতে
দেশের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রুপাতে, হিপোক্রিট হলেও বোঝা নাহি যায়।
ভোট নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, দলপতির তারা আদরের ছেলে
পথের কাঁটা সরাবার তরে, এদেরকে দিয়ে খুন করায়
দুষ্কৃতি চালায় ঐ শ্বেতশুভ্র দলে, দেখুন চোখ মেলে ঐ মর্তের কোলে
যে এদের মেরেছে তার দলপতি এর স্মৃতিবেদীতে মালা চড়ায়।

যমরাজ · এভাবে লইয়া কি করব তবে, কোন্‌ নরকেতে পাঠাইবে এরে
তোমার খাতায় কি লেখা আছে, জলদি বলো ঘুম আইছে চক্ষুতে।।

চিত্রগুপ্ত · কোন নরকেতে পাঠাবো বলো তুমি, আইনে 'অপশন্‌' নেই দেখি আমি
পেনাল কোড মতে হবে কালাপানি, কিছু ছাড়ো ম্যানেজ করছি
যমরাজে।।

যুবক এখানেও সেই একই ব্যাপার, ঘুষ ছাড়া কোন পথ নেই! আর
আমার সম্বল নেই কিছু তবে মায়ের দেওয়া এই আংটি আছে।
তবে যেতে পারি যদি মুরুব্বির কাছে লাখদুয়েক টাকা জমা হয়ে আছে

আদ্দেক মাকে দিয়ে বাকিটা তোমাকে, এখনই পাইয়ে দিতে পারি।।
[হা-হা-করে খানিক হেসে বলে]

যমরাজ : ঐ দ্যাখ ব্যাটা বঙ্গীয় বাড়ীতে তোর ঐ টাকা ওড়ে ...
যার জন্য তুই জীবন খেয়ালি, সে কেমন আছে ... মেজাজে।।
চিত্রগুপ্ত লইয়া যাও এভারে, পুরা বদ রক্ত ফুটে দিও এরে
নরকের খেল দেখাক্ এ ব্যাটা, এ ব্যাটা, পুনঃ ... 'রিটার্ন' কইরো।।
[ডিসেম্বর ১৯৯৩]

এরপর যমের খোঁজে গোলপার্ক 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার' এ গিয়ে সেখানে প্রায় ৪০টি পৌরাণিক পট দেখলাম, তার মধ্যে :

- ২টি যম পট—আর-এম-পি ১০৪৯-তে মোট পাঁচটি যম-নরক দৃশ্য এবং আর-এম-পি ১১১৫-তে যম নেই। কিন্তু পাঁচটি নরকের দৃশ্য রয়েছে।
- ১টি সাবিত্রী পট—আর-এম পি ১০৬০-এ মোট তিনটি যম দৃশ্য।
- ১টি জগন্নাথ পট—আর-এম-পি ১০৪৯-তে মোট ৩টি দৃশ্যে প্রথমে জগন্নাথ, পরে যম এবং সবশেষে রথে রয়েছেন জগন্নাথ।

শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংগৃহীত একটি বড় যম পটের প্রথম ও শেষটি 'যমরাজ' সংগ্রহ করে দিয়েছেন— তাও দেখতে পাওয়া গেল।

তথ্যসূত্র :

১. পটুয়া সঙ্গীত—গুরুসদয় দত্ত
২. বীরভূমের পটচিত্র ও চিত্রকর— অগ্নিমিত্র ঘোষ
৩. বীরভূমের যমপট —দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়
৪ পট শিল্পের ঘরানা—সুধাংশুকুমার রায়
৫. বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত
৬ লোকসংস্কৃতি কোষগ্রন্থ—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. শ্রীআশিস চক্রবর্তী —গুরুসদয় সংগ্রহশালা।
২. ড. বিজনকুমার মণ্ডল।
৩ বীরেন্দ্রসদয় গ্রন্থাগার—বাংলার ব্রতচারী সমিতি।
৪. শ্রীশঙ্করপ্রসাদ দে।
৫. রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

যম নামের নামাবলী

হরিপদ ভৌমিক

শাস্ত্রানুযায়ী জীবদেহ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন ভাগে বিভক্ত। আহারাদি দ্বারা স্থূলশরীর পুষ্ট হয় বলে তা অন্নময় কোষ। প্রাণময়, মনোময় কোষের দ্বারা তৈরি সূক্ষ্মশরীর। আনন্দময় কোষের অপর নাম কারণশরীর। মৃত্যুকালে সর্বপ্রথম প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন অন্নময় কোষ বা ভাণ্ডদেহ পড়ে থাকে। এই দেহ পুড়িয়ে জীব ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে। দেহ ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণময় কোষ শরীর থেকে বিচ্যুত হয়। জীব যদি সংসারে কুকর্ম করে তাহলে মনোময় কোষের উপকরণ সংযোগে যাতনাশরীর গঠিত হয় এবং ঐ দেহসহ সে ফলভোগ করে। সৎকর্ম করলে মনোময় কোষের স্থূল উপকরণ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তখন জীব শুদ্ধ মনোময় কোষসহ পিতৃলোকে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিছুকাল পরে যখন মনোময় কোষ কামনা থেকে একেবারে পরিশুদ্ধ হয়, তখন জীব স্বর্গলোকে গমন করতে সমর্থ হয়। এখানে এসে পৌঁছলে শ্রাদ্ধাদির কোন প্রয়োজন হয় না।

মৃত্যুর পর আত্মার কোষ বা স্থূল শরীরকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় শ্মশানবন্ধুগণ 'হরিবোল' 'রাম রাম' 'সীতারাম' 'রামনাম সত্য হ্যায়' ধ্বনি করে থাকেন। এমন করলে শব্দশক্তির স্পন্দন আত্মার কোষের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। যাতে জীব তাড়াতাড়ি অন্নময় কোষ থেকে বিচ্যুত হয়ে গন্তব্যপথে চলে যেতে পারে, এজন্য শ্মশানে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। মন্ত্রের উচ্চারণের দ্বারা এক রকম স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তা প্রাণময় কোষ বা পিণ্ডদেহে আঘাত করে থাকে এবং বেশি মাত্রায় স্পন্দন হয় বলে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে প্রেতলোকে গমন করে। প্রেতলোকে জীবকে নিজ নিজ কর্মানুসারে ফলভোগ করতে হয়, তাই অনেক সময় জীবের প্রেতলৌকিক দেহ তাকে রুদ্ধ করে অত্যন্ত যাতনা দিয়ে থাকে। পরলোকগত আত্মাকে ইহলোকের আত্মীয়স্বজন ভক্তিভাবে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান দ্বারা সাহায্য করতে সক্ষম। মৃতাত্মা প্রেতলোকে যে-কোনো অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পিণ্ডদাতা তার পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় ক্রিয়ানুষ্ঠান করবেন। শ্রাদ্ধের মন্ত্রশক্তি প্রেতাত্মাগণের প্রেতদেহবর্জন ও দিব্যালোকগমনে সাহায্য করে।

এই ক্রিয়া মৃত্যুর পর এক বছর ব্যাপী অনুষ্ঠান করতে হয় এবং বছর শেষে সপিণ্ডকরণ হলেই প্রেত মনোময় কোষ নিয়ে পিতৃলোকে বিরাজ করেন। এখানেও তাঁর আত্মীয়স্বজন ক্রিয়া দ্বারা মনোময় কোষ পরিশুদ্ধ করে তাকে স্বর্গলোকে গমনে সাহায্য করে থাকে। এই ভাবে সুচিন্তা ও মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আত্মার সদ্গতি হয় বলে প্রাচীন ঋষিগণ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

জন্ম, কর্ম, মৃত্যু—এই তিন ক্রিয়াকালের শুভ-অশুভ কর্মের হিসেব রাখেন চিত্রগুপ্ত, পাপপুণ্যের হিসেবে মানুষ স্বর্গ নরকের কোন্ স্থানে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবেন সেই

বিচারের দায়িত্ব ধর্মরাজ যমের। পাপ-পুণ্যের ওজন দেখে স্বর্গ বা নরকে পাঠান তিনি, এ কারণে মানুষের ভয় যমকে। পাপের ভয় যদি হৃদয়ে না থাকত তবে মানুষ যমকে অন্যচোখে দেখত। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ কথায় কথায় বলে 'মরলে বাঁচি', কিন্তু মরার সময়েই সে বাঁচতে চায়, কারণ সজ্ঞানে-অজ্ঞানে যে অন্যায় করেছে তার ফলে যমের হিসেবে নরকে যাবার ভয়।

যমরাজ ধর্মরক্ষার প্রধান অফিস খুলেছিলেন গয়াতে, গয়া হলো পাপী মানুষের মুক্তির দরজা, কেন হলো, এই কেন-র উত্তর দেওয়ার জনাই তৈরি করা হয়েছে গয়া-মাহাত্ম্য পুরাণ কথা।

আসলে সাধারণ ভাবে অসংযতচিত্ত ও নিম্ন প্রবৃত্তিমুখী মানুষকে যতদূর সম্ভব সমাজ-শৃঙ্খলায় বাঁধবার জন্য এবং দুর্বার পশুশক্তিকে সংযমিত করার জন্য মানুষ নিজেই বিবিধ শৃঙ্খল তৈরি করেছে। এগুলি একধরণের সেফটি ভ্যালব।

যমকে ফাঁকি দিতে নানা রকম ফন্দিফিকির বার করা হয়েছে, এটা যমে-মানুষে লুকোচুরি। দোলের দিনের কথাই ধরা যাক, এই দিন ভারতের সর্বত্র অশ্রাব্য অশ্লীল সঙ্গীত গীত হয়, এ প্রসঙ্গে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন—'ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ আরম্ভে নূতন বছর আরম্ভ করতেন, দোল তারই স্মৃতি। নববর্ষে হর্ষক্রীড়া স্বাভাবিক কিন্তু খেউড় স্বাভাবিক নয়। লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন চক্ষু, কর্ণ, কিম্বা দেহকেঅশুচি করলে সে বছর যমদূত স্পর্শ করতে পারে না'। যমকে ফাঁকি দিতে এই অশ্লীল গান। অন্যদিকে, যদি কারো পর পর সন্তান হয়ে মারা যায়, যমকে ফাঁকি দিতে সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কড়ি দিয়ে মাসি, পিসি বা নিকট আত্মীয়ের কাছে বিক্রি করে দেওয়া রীতি। বিক্রয়মূল্য অনুসারে সন্তানের নামকরণ হয়, যেমন এককড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি ইত্যাদি। আবার অন্য দ্রব্যেও সন্তান বিক্রি হয়, যেমন চালের ক্ষুদ দিয়ে বিক্রি করা সন্তানের নাম ক্ষুদিরাম ইত্যাদি

পাপ-পুণ্য-মৃত্যু-যম বিষয় নিয়ে কত লৌকিক সংস্কার তৈরি হয়েছে, যমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে কত রকম প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে তার হিসেব নেই। পাপীদের জন্য যম প্রস্তুত। আগে বিশ্বাস ছিল, সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, চোখে তুলসীপাতা, এবং নাভি পর্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখলে যমদূত তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। মানুষ এই বিশ্বাসে অন্তর্জলি যাত্রা করতেন। কলকাতার শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সঙ্গে সামাজিক রেষারেষি ছিল চূড়ামণি দত্তের। দুজনের শেষ রেষারেষি যমকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে! ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২২ নভেম্বর শোয়ার ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় যম নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে নিয়ে চলে যান, চূড়ামণি দত্ত প্রচার করে দিলেন 'নবকৃষ্ণকে যম নিয়েছে, কিন্তু যম আমাকে নিতে পারবে না—আমি যমকে জয় করবো।' যমকে জয় করতে চূড়ামণি কি করলেন? চূড়ামণির শরীর খারাপ হতেই গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করেন। রূপোর সিংহাসনওয়ালা চতুর্দোলা, নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসীমালার ঝালর, চতুর্দিকে তুলসীগাছ—সিংহাসনের মাঝে বসে আছেন চূড়ামণি দত্ত। সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, পরিধানে রক্তবর্ণ চেলি, পিঠে নামাবলী, গলায় ও হাতে জপমালা। বিশাল শোভাযাত্রা, চতুর্দোলার সামনে ঢুলির দল, পেছনে নগরকীর্তনের দল। ঢুলিরা ঢোলে বোল বাজাচ্ছে 'চূড়া যম জিনিতে যায়', আর কীর্তনীয়ারা গাইছে :

'আয়রে আয় নগরবাসী, দেখবি যদি আয়।
জগৎ জিনিয়া চূড়া—যম জিনিতে যায়।
জপ-তপ কর, কিন্তু মরতে জানতে হয়।'

অন্নজল— প্রেতপুরুষদের উদ্দেশে অন্ন ও জল উৎসর্গীকরণ।

অন্নদান—ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ অন্নদানে নষ্ট হয়। অন্নদাতা পাপকর্মা হলেও পূতাত্মা হয়ে স্বর্গে গমন করে।

অন্নপিণ্ড—বৈষ্ণবগণের পরলোকগত পিতৃগণের উদ্দেশে ভগবানে নিবেদন করে অন্নের পিণ্ড দান।

অন্বয়—আদিপুরুষ। বংশ। কুল।

অন্ববায়—কুল। বংশ। গোত্র।

অন্বষ্টকা—চান্দ্র পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও আশ্বিন মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মাতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ।

অন্বারোহণ—মৃত স্বামীর চিতায় পত্নীর আরোহণ। সহমরণ।

অন্বাহার্য্য—আমিষ দ্বারা পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ।

অপ—তিরোভাব।

অপত্য—যার জন্মের কারণে বংশ নরকে যায় না।

অপশ্রী—যার স্ত্রী তিরোহিতা।

অপকারক—অমঙ্গলকারক।

অপগমন—তিরোধান।

অপঘাত— অপকৃষ্ট মৃত্যু। রোগ ছাড়া অন্য কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যু।

অপঘাতক— আঘাত ইত্যাদি দ্বারা জীবন নাশকারী।

অপদেবতা—ভূত। প্রেত। পিশাচাদি।

অপমৃত্যু—অপঘাত মৃত্যু। উদ্বন্ধন, বিষপান, অস্ত্রাঘাত, সর্পাঘাত, জলেডোবা ইত্যাদি নানাকারণে মৃত্যু।

অপরপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ, পিতৃপক্ষ। দুর্গোৎসব পক্ষের পূর্বে এইপক্ষে পিতৃগণের তর্পণ করতে হয়।

অপরিতৃপ্ত—যার তৃপ্তি ঘটেনি এমন।

অপর্ব—অমাবস্যা তিথি।

অপলাসিকা—পিপাসা। তৃষ্ণা।

অপবর্গ—সংসার-বন্ধন মোচন।

অপবারণ—তিরোধান।

অপবারিত— তিরোহিত।

অপশুক্— আত্মা।

অপসর্জন—মারণ। হত্যা।

অপসার—তিরোধান।

অপস্নাত—মৃত্যুর পর স্নাত। অশৌচান্তে স্নান।

অপস্নান—মৃতস্নান। কোন ব্যক্তি মরলে তাকে উদ্দেশ করে যে স্নান।

অপাপ—পাপহীন।

অপাপবিদ্ধ—যে পাপের দ্বারা বিদ্ধ নয়।

অপাপতীর্থ—পিতৃতীর্থ বিশেষ।

অপিধান—তিরোধান।

অপুণ্য—পুণ্যাভাব। পাপ।

অপুনরাবৃত্তি—পুনরায় আর ফিরে না আসা। নির্বাণমুক্তি।

অপুনর্ভব—কৈবল্য। মোক্ষ। নির্বাণমুক্তি।

অপ্রকৃষ্ট—কাক। বায়স।

অপ্রাণ—মরণ। জীবনহীন।

অভয়—পরমাত্মা।

অভাব—না থাকা। মৃত্যু।

অভিজিৎ—উত্তরাষাঢ়ার শেষ ১৫ দণ্ড এবং শ্রবণার প্রথম ৪ দণ্ড। এই ১৯ দণ্ডকে অভিজিৎ বলে।
• প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। কুতুপ লগ্ন বা দিনের পঞ্চদশ খণ্ডের অষ্টম ভাগ বা অষ্টম মুহূর্তের নাম অভিজিৎ। এই মুহূর্তে শ্রাদ্ধাদি করলে তা অক্ষয় হয়।

অভিতপ্ত—দুঃখিত। শোকাদি দ্বারা পীড়িত।

অভিপন্ন—মৃত। বিপদ্‌গ্রস্ত।

অভিবাহ্য—উৎসর্গ। দান।

অভিসান্ত্ব—সান্ত্বনা। শোক শান্তিকরণ।

অভ্যুদয়—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

অমঙ্গল—অশুভ। মঙ্গলশূন্য।

অমঙ্গলসূচক—মুক্তকেশা, রোরুদ্যমানা, চিতা, দগ্ধশব, নির্বাপিত অঙ্গার, শ্রাদ্ধপাত্র, পিণ্ড, শবদাহক, বিলাপ, রোদনকারী, শোককারী, অগ্রদানী, মৃতবার্তা—এই সব যাত্রাকালে দেখা বা শোনা অমঙ্গল সূচক।
অমত—মৃত্যু।
অমর—মরণশূন্য। যার মৃত্যু নেই এমন।
অমর কণ্টক—মরের অর্থাৎ মৃত্যুর, মোক্ষলাভের কণ্টক বা অন্তরায়।
অমরত্ব—মৃত্যুজয়।
অমরাবতী—এখানে শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নেই।
অমাতৃক—মাতৃহীন।
অমামসী—ব্রহ্মপুরাণের মতে, পিতৃগণ যে সময়ে পঞ্চদশকলাত্মক চন্দ্রের সুধা পান করেন সেই অমাবস্যা।
অমীব—দুঃখ। পাপ।
অমীবা—পাপ। দুঃখ।
অমুত্র— পরকালে। জন্মান্তরে।
অমুত্রত্য—জন্মান্তর সম্বন্ধীয়। পরলোকঘটিত।
অমৃত—যে পবম সুস্বাদু সুধা পান করলে মৃত্যু হতে অব্যাহতি লাভ ঘটে।
অমোক্ষ—ঘোর পাপী।
অম্বরীষ—নরকবিশেষ।
অয—নরকবিশেষ।
অয়ঃপাল—নরকবিশেষ।
অরপ—পাপহীন। নিষ্পাপ।
অরিষ্টদুষ্টধী—মরণভীত।
অরুন্তুদকুণ্ড—চন্দ্র, সূর্য গ্রহণ ও তদ্রূপ নিষিদ্ধকালে ভোজন করায় পাপীকে এই নরককুণ্ডে যেতে হয়।
অর্কতনয়—যম।
অর্য্যমা—পিতৃলোক বিশেষ।
অলক তিলক—চন্দন দিয়ে মুখের চিত্রণ।
অলীক—স্বর্গ।
অল্পায়ুঃ—যার আয়ু অল্প এমন।
অলপ্লেযে—অল্প আয়ু যার।
অবক্রন্দন—উচ্চরোদন।
অবগাহণ—জলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে স্নান।
অবঘাত—অপহত্যা।
অবটনিরোধন—নরকবিশেষ।
অবটোদকুণ্ড—ষড় বেশ্যাগামী পাপী দ্বিজের জন্য নরকের এই কুণ্ড।
অবদ্য—পাপী। পাপ।
অবনেজন—শ্রাদ্ধকালে পিণ্ডের উপর জলসেচন।
অবসান—মরণ। মৃত্যু। শেষ।
অবসিত—যার অবসান হয়েছে এমন। সমাপ্ত। গত।
অবাক্‌শিরাঃ—অবনতমস্তক। নতশীর্য।
অবীচিক—নরক বিশেষ।
অবীচিময়—নরকবিশেষ।
অব্যক্ত—আত্মা।
অশকুন—অশুভ। অমঙ্গল।
অশরীর—দেহরহিত। শরীরশূন্য।
অশরীরী—যার শরীর নেই এমন। দেহহীন।
অশুদ্ধ—অপবিত্র। অশুচি।
অশুদ্ধি—অশৌচ। অপবিত্রতা।
অশুভ—পাপ। অমঙ্গল।
অশুচি দেহ—পিতামাতার মৃত্যু হলে এক বছর দেহ অশুচি থাকে। এই সময় দৈবকার্যে অধিকার থাকে না।
অশোক—যাকে শোক পেতে হয়নি এমন।
অশোচনীয়—যার জন্য শোক করা উচিত নয়।
অশৌচ—অশুদ্ধি।
অশৌচান্ত—অশৌচের শেষ দিন।
অশ্মন্ত—মৃত্যু।
অশ্র—চোখের জল। অশ্রু।

অশ্রু—চোখ হতে যে জল নিঃসৃত হয়। নেত্রজল।

অশ্রুপাত—ক্রন্দন। শোকাদি কারণে নেত্র জলের পতন।

অশ্রুকুণ্ড—হরিভক্তকে দেখে যে উপহাস করে সে যমালয়ের এই কুণ্ডে অবস্থান করে।

অশ্রুপূর্ণ—অশ্রুপরিপ্লুত। বাষ্পাকুল।

অশ্রুমুখ—যার মুখ বেয়ে অশ্রু পড়ছে এমন।

অশ্বন্ত—মৃত্যু। অশুভক্ষেত্র।

অশ্বারি—মহিষ।

অষ্টদিক্‌পাল—যম, ইন্দ্র, বহ্নি, নৈর্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের ও ঈশান—এই আট দেবতা। এর মধ্যে দক্ষিণ দিক হলো যমের।

অসময়—দুঃসময়। দুর্দশাকাল।

অসিপত্র—নরক বিশেষ। এই নরকে খড়্গাধারের উপর চেপে কাটা হয়।

অসিপত্রবন—নরক বিশেষ। এই নরকস্থ বৃক্ষের পত্র খড়্গাকার। যে ব্যক্তি শাস্ত্র মর্যাদা লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছানুসারে কুপথে যায় তার স্থান এই নরকে। এই নরকের খড়্গাকার পত্র তার গাত্রছেদন করতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণের মতে, যারা অকারণে বৃক্ষচ্ছেদন করে তারা এই নরকে যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, এই নরক সহস্রযোজন বিস্তৃত ও জ্বলদগ্নিজ্বালায় পরিব্যাপ্ত এই নরকবাসী পাপীরা দারুণ অগ্নিতে ও প্রচণ্ড সূর্য কিরণে সদা তাপিত হয়।

অসিপত্রকুণ্ড—নরকের চুরাশি কুণ্ডের একটি। অর্থলোভে যে ব্যক্তি খড়্গদ্বারা হনন করে।

অস্ত—মৃত্যু। শেষ।

অস্তক—মুক্তি। নির্বাণ। মোক্ষ।

অস্থিকুণ্ড—অস্থিপূর্ণ নরককুণ্ড বিশেষ। বিষ্ণুপদে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান না করলে, শরীরে যত লোম থাকে তত বছর নরকে এই কুণ্ডে গিয়ে বাস করতে হয়।

অস্থিসঞ্চয়—চতুর্থ দিবসে কর্তব্য দগ্ধদেহের অস্থিসংগ্রহরূপ কার্য।

অস্থিসমর্পণ—মৃতদেহের অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ।

অস্র—দুঃখের জন্য চোখের জল।

অস্রু—চক্ষুজল। নেত্রবারি।

অস্বস্ত—অশুভ যার ভাবী ফল শুভ নয়।

অস্বর্গ্য—স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক যার দ্বারা স্বর্গগমনের ব্যাঘাত জন্মে এমন।

অহিত—অমঙ্গলজনক। অশুভ।

অহো—শোক। অনুতাপ।

অহবনীয়পদ—গয়ায় এই পদ-তীর্থে শ্রাদ্ধ করলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়, এবং পিণ্ডদানে পিতৃকুল উদ্ধার হয়।

অসৃককুণ্ড—গুরুজনকে তাড়নাকারী পাপী যমালয়ে নরকের এই কুণ্ডে অবস্থান করে।

আকাশকল্প—আকাশগত পরমাত্মা।

আকুল—উদ্বিগ্ন। কাতর। ভয়চকিত।

আক্রন্দিত—আর্তনাদ। ক্রন্দন।

আক্রুষ্ট—অভিশপ্ত।

আক্রোশন—অভিসম্পাত। শাপপ্রদান।

আগঃ—পাপ। অধর্ম।

আগস্কৃত—পাপী। দোষী।

আগুনখাগী—সহমৃতা।

আগ্রহারিক—অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। মৃত্যুদানগ্রাহী বিপ্র।

আঘাতন—বধ্যগৃহ। মশান। হত্যাস্থান।

আচ্ছাদিত—আবৃত। ঢাকা।

আতেলা—অশৌচ সময়ে তেলহীনতার জন্য শ্রীহীন।
আত্মঘাত—অবৈধবিধি পূর্বক আত্মহনন। আত্মহত্যা।
আত্মঘাতী—যে শোকাদি বশত আত্মযত্নে প্রাণত্যাগ করে।
আত্মশুদ্ধি— প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নিজেব পাপের নিরাকরণ।
আত্মশোধন—প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আত্মকৃত পাপের নিরাকরণ।
আত্মহত্যা—নিজে নিজের জীবন নাশকরণ। উদ্বন্ধন, বিষভক্ষণ, জলমজ্জন, অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি দ্বারা নিজের প্রাণনাশ করা।
আত্মহন্—আত্মঘাতী।
আত্মীয়—আত্মসম্পকীয়। আপনার জন।
আদি গদাধর—গয়াতীর্থের বিষ্ণুমূর্তি। এঁর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করতে হয়।
আদ্য—আদ্যশ্রাদ্ধ।
আদ্যশ্রাদ্ধ—অশৌচান্তের পরদিনের শ্রাদ্ধ।
আধমরা—প্রায় মরা।
আধিক্লিষ্ট—হৃদয়বেদনায় ব্যথিত
আপরাহ্নিক—দিনের তৃতীয় বা শেষ ভাগের শ্রাদ্ধাদির ক্রিয়া।
আপাদমস্তক—পা থেকে মাথা পর্যন্ত।
আভ্যুদয়িক—অভ্যুদয়-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ। শুভ ক্রিয়ার পূর্বে পিতৃপিতামহ প্রভৃতির তৃপ্তির উদ্দেশ্যে করা শ্রাদ্ধকার্য।
আমরণ—মরণ পর্যন্ত।
আমরণস্থায়ী—যা মরণ পর্যন্ত থাকে।
আমরণান্ত—মৃত্যুসময় পর্যন্ত।
আমরণান্তিক- মরণকাল পর্যন্ত স্থায়ী।
আমৃত্যু—মরণ পর্যন্ত।
আমুষ্মিক—পরলোকসংক্রান্ত। পারলৌকিক।
আম্নায়—কুলাচার। বংশ পরম্পরাগত আচারপদ্ধতি।
আয়ু—জীবিতকাল। যতদিন বেঁচে থাকা যায় সেই সময়।
আয়ুঃ—পরমায়ু। জীবন। স্থিতিকাল।
আয়ুব্রত— গরুড় পুরাণে, চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত করার কথা বলা হয়েছে।
আয়ুঃশেষ—জীবিতকালের অবসান। মরণ। জীবনাবসান। মৃত্যু। জীবনশেষ।
আয়ুষ্যসূক্ত—নান্দীশ্রাদ্ধের প্রথমে বসুধারা সম্পাতনের পর পাঠ্য বৈদিক মন্ত্র-বিশেষ।
আয়ুষ্টোম—দীর্ঘায়ু কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ।
আর্ত—শোকাভিভূত। কাতর।
আর্তনাদ—দুঃখকাতবতার শব্দ। উচ্চস্বরে রোদন।
আর্তি—মনোব্যথা।
আর্যক— পিণ্ডপাত্রাদি পিতৃকার্য।
আলম্ভ্য—মারণ। বধ।
আলেয়া— ভূতযোনিবিশেষ।
আবপন—ক্ষৌরকর্ম। কেশাদির মুণ্ডন।
আবর্তমান— যে বা যা পুনঃ পুনঃ ফিরে আসছে।
অবসথাপদ—গয়ায় এই পদ-তীর্থে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ সোমলোক প্রাপ্ত হয়।
আবাপন—কেশাদির মুণ্ডন।
আবাহিত— নিমন্ত্রিত। আহূত।
আবিগ্ন—উদ্বিগ্ন। উৎকণ্ঠিত।
আবীত— অতীত। গত।
আবৃত— তিরোহিত।
আবৃতি— তিরোধান।
আশৌচ— অশৌচ।
আশ্বাস—ভীত ব্যক্তির ভয় নিবারণার্থে সান্ত্বনা।
আসন্ন—অন্তিম। মুমূর্ষু।
আসন্নকাল—মৃত্যুসময়। নিধনকাল।
আসুর—অশুচি। অপবিত্র।
আস্তিক— ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

আস্তিক্য—পরলোক বিশ্বাসী।
আস্তিকতা—পরলোক ও ঈশ্বরে বিশ্বাস।
আহূত—নিমন্ত্রিত। যাকে আহ্বান করা হয়েছে এমন।

ইস্—বিস্ময়বোধক। আশ্চর্যবোধক।
ইহ—এই জগতে। নরলোকে।
ইহকাল—যতদিন নরলোকে থাকা যায়। মৃত্যুপর্যন্ত সময়।
ইহলোক—নরলোক।

ঈ—দুঃখ। দুঃখভাবন।
ঈরিণ—শূন্য।
ঈশ্বরনিষ্ঠ—ঈশ্বরপরায়ণ।

উগ্রদেব—মৃত পূর্বপুরুষগণ এই নামে অভিহিত।
উচ্ছ্বাস—শোকহেতু দীর্ঘনিঃশ্বাস।
উজ্জাসন -মারণ। বধ।
উৎকলিক'কুল—উৎকণ্ঠাব্যাকুল। অতিশয় উৎকণ্ঠিত।
উৎকলিত—উৎকণ্ঠিত।
উৎক্রম—মরণ। নির্গমন।
উৎক্রান্ত—মৃত
উত্তরক্রিয়া—সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি কার্য।
উত্রাস—ভয়।
উত্থান—পুনর্জীবন। মরণান্তর পুনর্জীবনলাভ।
উৎপাত—দৈব অমঙ্গল ঘটনা।
উৎসর্গ—পিতৃপুরুষের উদ্দেশে দান।
উদকক্রিয়া—প্রেতদের প্রীত্যর্থ জলদান। তর্পণাদি।
উদায়ুধ—বধ করার জন্য যে অস্ত্র উত্তোলিত করেছে।
উদ্বন্ধন—গলায় দড়ি দিয়ে মরা।
উদ্ভ্রান্ত—উদ্বিগ্ন। হতবুদ্ধি।
উদ্ভ্রান্তহৃদয়—আকুলহৃদয়।
উদ্বাসন—বধ। মারণ।
উদ্বেগ—দুর্ভাবনা। দুশ্চিন্তা। উৎকণ্ঠা।
উদ্বেজক—দুর্ভাবনাজনক। কষ্টকর। উদ্বেগকর।
উদ্বেজন—উদ্বেগ। ভয়। কষ্ট।
উন্নাদ—উচ্চরব। উচ্চস্বর।
উন্মথ—বধ। মারণ।
উন্মথন—নিধন। নাশ। হনন। বিনাশন।
উন্মনাঃ—উৎকণ্ঠিতচিত্ত। উদ্বিগ্ন।
উপতপ্ত—দুঃখিত। কাতর।
উপতপ্তা—সন্তাপদায়ক। দুঃখকারক।
উপতাপ—দুঃখ। মনস্তাপ।
উপদেবতা—যক্ষ, ভূত, প্রেত প্রভৃতি।
উপধূপিত—মৃতপ্রায়। আসন্নমরণ। মুমূর্ষু।
উপপাতক—উনপঞ্চাশ রকম পাপ।
উপসংহার—মরণ। মৃত্যু।
উপসংহৃতি—বিনাশ। শেষ।
উপসম্পন্ন—মৃত।
উপহত—অপবিত্র। অশুদ্ধ।
উপাকৃত—অমঙ্গল। অশুভ।
উপাঞ্জন—গোময়াদি দ্বারা লেপন করে স্থান শুদ্ধকরণ।
উভরায়—উচ্চশব্দে চিৎকার পূর্ব্বক।
উল্কামুখকুণ্ড—স্বামীর প্রতি কটুভাষিণী নরকের এই কুণ্ডে স্থান পায়।
উলঙ্গগমন—দাহ সময়ে বস্ত্রহীন অবস্থায় যাওয়া।
উল্লাপ—শোকের জন্য ধ্বনি। আর্তনাদ।
উষ্মপা—পিতৃলোকবিশেষ।

ঊ—শোকদুঃখাদিসূচক সম্বোধন।
ঊর্ধ্বগতি—উপরে গমন। স্বর্গারোহণ।
ঊর্ধ্বদেহ—মরণান্তজ দেহ।
ঊর্ধ্বলোক—স্বর্গ।
ঊর্মিকা—উৎকণ্ঠা। উদ্বেগ।

ঋষিশ্রাদ্ধ—ঋষিগণ যে শ্রাদ্ধ করেন।

একমত—একই অভিপ্রায়যুক্ত হয়ে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করা।

একশতপুরুষ—গয়াশিরে পিণ্ডদান করলে একশত এক পুরুষ উদ্ধার হয়, তাঁরা হলেন-পিতৃগোত্রে কুড়ি, মাতামহগোত্রে কুড়ি, শ্বশুরগোত্রে চৌদ্দ, ভগ্নিগোত্রে ষোল, কন্যাগোত্রে বার, পিসিমাগোত্রে এগার, মাসীমাগোত্রে আট।

একশ নরক—ভাগবতে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে নরকপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে যে একুশ নরকের কথা বলা হয়েছে। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসীমপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমি- ভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্মি, বজ্রকণ্টকশল্মিলী, বৈতরণী, পূযোদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালভিক্ষ, সারমেয়াদল, অবীচী, অযপাল।

একদিন অশৌচ—শবের অনুগমন করলে, সব দহন বা বহন করলে একদিন অশৌচ হয়।

একবাক্যতা—ঐক্যমত।

একাদশী শ্রাদ্ধ—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে, একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধকর্তা, ভোক্তা (শ্রাদ্ধান্ন) ও পরলোকগত পিতামাতা প্রমুখ সকলেই নরকবাসী হয়।

একাহার—একদিনে একবার মাত্র অন্নভোজন।

একেক্ষণ—কাক।

একোদক—ঊর্ধ্বতন সপ্তম গোত্রজ পুরুষ।

একোদ্দিষ্ট—এক ব্যক্তির উদ্দেশে বছর বছর যে শ্রাদ্ধ করা হয়। আব্দিক শ্রাদ্ধ। সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ। প্রেতোদ্দেশে শ্রাদ্ধ।

এড়ুক—শ্মশানচৈত্য। সমাধিমন্দির।

এনঃ—পাপ। অপরাধ।

ঐন্দ্রি—কাক। যমের সহচর।

ওষ্ঠাগতপ্রাণ—যার প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছে। যার প্রাণ ওষ্ঠ পর্যন্ত এসেছে।

ঔড়ুম্বর—চতুর্দশ যমান্তর্গত যম।

ঔৎপাতিক—উৎপাতবিশিষ্ট। অশুভসূচক।

ঔর্দ্ধদেহিক—মৃত্যুদিন হতে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব পর্যন্ত প্রেততৃপ্তিহেতু পিণ্ডাদি দান। দেহ ধ্বংসের পর ক্রিয়মাণ দাহ তর্পণাদি কর্ম। অন্ত্যেষ্টি। প্রেতকৃত্য।

ঔর্ব—দক্ষিণসীমা। এইস্থানে সকল নরক ও দৈত্যগণ অবস্থিত।

ক—যম। আত্মা।

কঙ্ক—যম।

কঙ্কেরু—কাকবিশেষ।

কট—শব। শ্মশান।

কটখাদক—কাক। যমের সহচর।

কটপূতন—প্রেতবিশেষ।

কটাহ—নরকবিশেষ।

কদন—মারণ। পাপ।

কন্যাতীর্থ—কুরুক্ষেত্র তীর্থে স্নান ও তর্পণ করলে সহস্র গোদানের ফল হয়।

কন্যা অশৌচ—কন্যা হতে উর্দ্ধতন চতুর্থের পর দশম পুরুষ পর্যন্ত তিন দিন মৃতাশৌচ।

কর্ণবিটকুণ্ড—বধিরকে উপহাস করে পাপ করায় তাকে যমালয়ে এই কুণ্ডে অবস্থান করতে হয়।

কপাল—অদৃষ্ট।

কপালস্ফোট—পিশাচ।

কপালী—যার কপাল ভাল। ভাগ্যবান।

কপোত—যমের প্রহরী।

কবন্ধ—ক্রিয়াযুক্ত নির্মস্তক দেহ। কন্দকাটা।

কম্পিত—ভীত।

কম্প্র—ভীত

কম্বল—শ্রাদ্ধক্রিয়ায় ব্যবহার মেষাদির লোমের আসন।

করট— একাদশাহ শ্রাদ্ধ। কাক যমের সহচর।
করপুট— বদ্ধাঞ্জলি। জোড়হাত।
করবীর—শ্মশান।
কর্দন—কাক।
কর্দম—পাপ।
কর্মকর—যমবিশেষ।
কর্মকর্তা—মাতাপিতার শ্রাদ্ধ কর্মে যিনি কর্তা হন।
কর্মদুষ্ট—যে সর্বদা অসৎপথে চলে এমন।
কর্মদোষ—অসৎ কর্মের জন্য দোষ। পাপ। অপরাধ।
কর্মফল—দুঃখ বা সুখ। কর্মের ফল।
কর্মবিপাক—রোগাদিরূপ জন্মান্তরীণ অশুভ কর্মের ফলভোগ।
কর্মসাক্ষী—সূর্য, চন্দ্র, যম, কাল এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই নজন কর্মের সাক্ষী।
কলহংস—পরমাত্মা।
কলি—ক্রোধের ঔরসে হিংসার গর্ভে এর জন্ম। ইনি কৃষ্ণবর্ণ, জুগুপ্সিত, তৈলাভ্যক্ত, কাকতুল্যোদর, বিকট বদন, লোলজিহ্বা, পূতিগন্ধপূর্ণাঙ্গ। এর 'ভয়' নামে পুত্র এবং 'মৃত্যু' নামে কন্যা হয়। পাপ।
কলিযুগ—চতুর্থ যুগ। এর পরিমাণ ১২০০ দিব্য বৎসর। পণ্ডিতগণ মনে করেন খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে মাঘী পূর্ণিমায় শুক্রবারে এই যুগের শুরু। কল্কি এই যুগের অবতার। এই যুগে তিন ভাগ পাপ আর এক ভাগ পুণ্য। এই যুগের অধিষ্ঠাতা কলি। এই যুগে দিন যত যাবে, অধর্ম তত বাড়বে।
কলুষ—পাপ। পাপী। দুঃখিত।
কলুষিত— পাপযুক্ত।
কল্পক— নাপিত।
কল্মষ—পাপ। নরকবিশেষ। পাপিষ্ঠ।
কবন্ধ— মুণ্ডহীন দেহ।
কব্য—মৃত পিতৃলোককে দেয় খাদ্যদ্রব্য।
কশ্মল—পাপ। পাপী।
কষকুণ্ড— সবর্ণা পরস্ত্রীগামী পাপীর জন্য নরকের এই কুণ্ড।
কষ্ট—দুঃখ। যন্ত্রণা।
কষ্টস্থান—দুঃখের স্থান। কষ্টের জায়গা।
কসাম্বু—পিতৃগণের উদ্দেশে কব্য দান কালে দেয় জল।
কাককুণ্ড—যে পাপী লোলুপনেত্রে পরস্ত্রীর বক্ষ, নিতম্ব ও মুখদর্শন করে তাকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
কাকবলি—যমের সহচর কাকের ভোজনোদ্দেশে উৎসৃষ্ট অন্নাদি।
কাকসিলা—গয়ায় কাকশিলায় পিণ্ড দিলে পিতৃগণের মুক্তি হয়।
কাকরুত— কাকের কা-কা-রব। এই শব্দে মানুষের শুভাশুভ সংসূচিত হয়।
কাকু— ভয় শোকাদি দ্বারা বিকৃত কণ্ঠধ্বনি।
কাকোল—দাঁড়কাক। নরকবিশেষ।
কাগ—কাক। বায়স। যমের সহচর।
কাঠগড়া—পিতৃশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সমাগত কাঙ্গালিদের দানের জন্য যে স্থানে আবদ্ধ রাখা হয়, সেই ঘেরা জায়গা।
কান—কাক। যমের সহচর।
কান্নাকাটি—ক্রন্দনের রোল।
কাণুক— কাক। যমের সহচর।
কাণ্ড— পাপিষ্ঠ।
কাতর—দুঃখাভিভূততা।
কাতর্য্য—দুঃখ। কাতরতা।
কাঁধদেওয়া—মৃতদেহের খাট কাঁধে নেওয়া।
কাপ্যকর—স্বকৃত পাপ প্রকাশ।
কামধুক—স্বর্গ।
কামান—ক্ষৌরকর্ম।
কামানী—ক্ষৌরমূল্য। ক্ষৌরকারের পারিশ্রমিক।

কংমোদক—মৃত ব্যক্তিব উদ্দেশে স্বেচ্ছাক্রমে প্রদত্ত জল।

কাম্য—অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধি কামনায় যে শ্রাদ্ধ।

কবণা—নবকভোগ।

কাবব—কাক যমেব সহচব

কাবণিক—অন্যেব দুঃখ দেখে যাব দুঃখবোধ হয়

কাল—যম। মৃত্যু। মবণ। প্রাণত্যাগ।

কালনিদ্রা—অন্তিম নিদ্রা

কালকণ্ঠ—যম

কালগ্রাস—কালেব গ্রাস। মৃত্যু।

কালঘাম—মৃত্যু সময়েব ঘাম

কালাপুবং—মুনিবেশী যম

কালসূত্রকুণ্ড—ব্রাহ্মণেব অনিষ্টকাবী পাপীব জন্য নবকেব এই কুণ্ড

কালচিহ্ন—মৃত্যুব চিহ্ন। মবণেব লক্ষণ।

কালদণ্ড—যমেব দণ্ড

কালধর্ম—মৃত্যু। কালেব ধর্ম।

কালপুবুষ—যমেব সহকাবী। যমেব ভৃত্য।

কালবাত্রি—মৃত্যুব সূচক বাত্রি। যে বাতে মৃত্যু ঘটে

কালসূত্র—নবকবিশেষ। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণেব অনিষ্ট কবাব চেষ্টা কবে তাকে এই স্থানে নবকযন্ত্রণা ভোগ কবতে হয়।

কালসর্প—মৃত্যুতুল্য কৃষ্ণবর্ণ কেউটে সাপ।

কালাশৌচ—মহাগুরু নিপাত হলে যে সময় ধবে শবীব অশুচি থাকে সেই সময় অশৌচ

কালাপাহাড়—মৃত্যুব মতো ভীষণ এবং পাহাড়েব মতো বিবাট।

কালিন্দীসোদব—যম

কালীচী—যমেব বিচাবস্থান

কাষ্ঠমঠী—চিতা

কাষ্ঠমল্ল—শবযান যে গাড়ী বা খাটে কবে মবা নিয়ে যায়।

কিল্বিষ—পাপ।

কীনাশ—যম

কীর্তনিযা—মৃতদেহেব আগে আগে যাওযা ভক্তিগীতি গাযকেব দল।

কীর্তি—মৃত ব্যক্তিব খ্যাতি।

কীতিশেষ—মৃত্যু। মবণ। মৃত।

কুডমল—নবকবিশেষ। এখানে নাবকীয বজ্র যন্ত্রণা ভোগ কবতে হয।

কুণপ—শব। মৃত শবীব

কুণ্ডাশী—যে জাবজেব অন্ন ভোজন কবে, তাকে রুধিবান্ধ নামক ঘোব নবকে বিষম যাতনা ভোগ কবতে হয।

কুতপ—দিনেব পঞ্চদশ ভাগেব অষ্টম ভাগ। এই সময সূর্য বিশ্রাম কবে। এই কুতপ সমযে শ্রাদ্ধ কবলে পিতৃগণেব অনন্ত ফল লাভ হয।

কুম্ভীপাক—নবকবিশেষ। নবকেব যে স্থানে পাপীকে তপ্ত তেলে ভাজা হয।

কুলক্ষণ—মন্দচিহ্ন। অশুভচিহ্ন।

কুলজী—বংশেব ইতিহাস।

কুলধর্ম—পবিবাববিশেষে বংশগত আচাবঅনুষ্ঠান।

কুলাঙ্গাব—যে ব্যক্তিব পাপকর্মেব জন্য বংশ কলঙ্কিত হয।

কুলাচাব—বংশগত আচাব আচবণ।

কুলবিপ্র—কুলপুবোহিত।

কুলপঞ্জী—বংশেব ইতিহাস।

কুলপুবোহিত—বংশপবম্পবাগত ব্রাহ্মণ।

কুশোদক—দানার্থে কুশ সহিত জল

কুশোপুত্তলিকা দাহ—অনবধানতাবশত শ্রাদ্ধে কোন ত্রুটি ঘটলে কুশপুত্তলিকা দাহ কবে পুনর্বাব পিণ্ডোদক নবশ্রাদ্ধ কবাব নিযম

কুশাঙ্গুবীয—শ্রাদ্ধকার্যে ব্যবহৃত কুশেব আংটি।

কুশাসন—শ্রাদ্ধাদি কবাব জন্য কুশতৃণেব তৈবী আসন।

কূর্মকুণ্ড— হরিশয়ণে কূর্মমাংসভোজী পাপী ব্রাহ্মণের জন্য নরকের এই কুণ্ড।
কৃচ্ছ্র—পাপ। প্রায়শ্চিত্ত। পাপিষ্ঠ।
কৃততীর্থ—যে পাপ খণ্ডন করার জন্য তীর্থ পর্যটন করে ফিরছে।
কৃতাঞ্জলি—যে অঞ্জলি একত্র করেছে। বদ্ধাঞ্জলি।
কৃতান্ত—যম।
কৃতান্তভবন—যমের বাড়ি।
কৃন্তকুণ্ড— কৃন্ত ও লৌহ বড়শি দিয়ে জীবহত্যা পাপে যমালয়ে যে নরকে যেতে হয়।
কৃমিকণ্টক—চিতা।
কৃমিকুণ্ড— মৎস্যভোজী, বৃথামাংসভোজী ও হরিপ্রসাদ ভক্ষণ না করার পাপে মানুষকে যমালয়ে কৃমিকুণ্ড নরকে যেতে হয়।
কৃশর—তিলমিশ্রিত অন্ন।
কৃশানু—আগুন।
কৃষ্ণকর্মা—পাপী।
কৃষ্ণকাক— দাঁড়কাক।
কৃসর—তিলযাউ।
কেশকুণ্ড— মৃন্ময় শিবলিঙ্গ তৈরী করতে ঐ শিবলিঙ্গে কেশাদি থাকার পাপে পাপী হলে তাকে যমালয়ে কেশকুণ্ড নরকে যেতে হয়।
কেশবপন—কেশমুণ্ডন করা।
কেশান্ত—কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কারবিশেষ।
কোশা—তর্পণ ইত্যাদির জন্য ধাতুনির্মিত জলপাত্র।
কৈবল্য—সংসারমুক্তি।
কোল—চিতা।
ক্রথন—মারণ। দানবিশেষ।
ক্রন্দন—কান্না। অশ্রুবিসর্জন রোদন।
ক্রন্দিত— ক্রন্দন। যে কাঁদছে।
ক্রমাগত— কুলপরম্পরাক্রমে আগত।
ক্রব্যাদ—শবভক্ষক বহ্নি।
ক্রাথ—মারণ।
ক্রিয়া—শ্রাদ্ধ।
ক্রিয়াফল—কর্মফল। ক্রিয়াজন্য পাপপুণ্যের ফল।
ক্রীতক—যমের হাত থেকে বাঁচাতে মূল্য দিয়ে পিতা-মাতার নিকট হতে গৃহীত সন্তান।
ক্রুষ্ট—ক্রন্দন। রব।
ক্রূর—অশুভকর।
ক্রূরবাশী— দাঁড়কাক। দ্রোণকাক।
ক্রোথ—বধ। হনন।
ক্রোধা —যক্ষ পিশাচাদির মাতা।
ক্রোশন—ক্রন্দন। কাতরধ্বনি। করুণধ্বনি।
ক্লীব—পাপ।
ক্লেশ—দুঃখ। কষ্ট।
ক্লাথ—দুঃখ।

ক্ষণন—হত্যা। বধ।
ক্ষারকুণ্ড—নিষিদ্ধ দিনে বস্ত্রে ক্ষার দেওয়ার পাপে মানুষকে যমালয়ে ক্ষারকুণ্ড নরকে বাস করতে হয়।
ক্ষতাশৌচ— ক্ষতনিমিত্তক অশৌচ।
ক্ষিতিবর্ধন—মৃতদেহ। শব।
ক্ষুর—যে অস্ত্রে মাথা কামায়। নাপিতাস্ত্র।
ক্ষুরাধারকুণ্ড--যে পাপী গ্রাম ও নগর দাহ করে তাকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
ক্ষুরকর্ম—ক্ষৌর। কামান।
ক্ষুরমুণ্ডী—নাপিত।
ক্ষৌব—ক্ষুরকর্ম। মুণ্ডন। কামান।
ক্ষৌরী—মস্তক মুণ্ডন।
ক্ষৌরিক— নাপিত।
ক্ষৌরী—ক্ষুর।

খ—স্বর্গ। সুখ।
খট্টা—পর্যঙ্ক। মড়ার খাট। যে খাটের উপর শব রেখে দাহক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়।
খট্টি—শববহনার্থ খাট।

খট্টী—মড়ার খাট।
খট্টেরক—খাট।
খট্টা—খাট।
খণ্ডাশৌচ—ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ণের স্বকুলের কারো মরণ হলে পূর্ণাশৌচের দিন কম করে পালন করা।
খড়্গাকুণ্ড—সন্ধ্যাহীন ও হরিভক্তিহীন পাপী ব্রাহ্মণের জন্য নরকের এই কুণ্ড।
খড়্গাপাণি—মারণোন্মুখ।
খড়্গাহস্ত—যে ব্যক্তি মস্তক ছেদনে উদ্যত।
খর—কাক। যমের সহচর।
খর্পর—মড়ার মাথার খুলি।
খাট—মড়ার খাট।
খাটি—মড়ার খাট।
খাটিয়া—মড়ার খাট।
খুন—মেরে ফেলা। মারণ।
খেদ—দুঃখ। শোক।

গ—স্বর্গ।
গঙ্গাজলি—মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাজল দান।
গঙ্গাপ্রাপ্তি—গঙ্গাগর্ভে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করা। গঙ্গায় মরা।
গঙ্গাযাত্রা—মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণত্যাগ করার জন্য গঙ্গাতীরে গমন।
গঙ্গালাভ—গঙ্গাতীরে মৃত্যু।
গঙ্গাযাত্রিক—যে রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করানো যায়।
গঙ্গাবাসী—গঙ্গাতীরে আনীত মুমূর্ষু ব্যক্তি।
গজদংশ কুণ্ড—গজ, তুরগ, নরচোর পাপীদের নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
গজকর্ণপদ - গয়ায় এখানে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ স্বর্গগামী হন।
গত—মৃত। সমাপ্ত।
গতজীব—মৃত। গতপ্রাণ।
গতপ্রাণ—মৃত। যার প্রাণত্যাগ হয়েছে
গন্ধাধিবাস—আভ্যুদয়িকাদি কর্মে চন্দন ও পুষ্পমাল্য ও গন্ধদ্রব্যে যে অধিবাস হয়।

গরলকুণ্ড—মধুমক্ষিকা মেরে মধুসংগ্রহ করে মানুষ যে পাপ করে, এর ফলে যমালয়ে গরলকুণ্ড নরকে তাকে যেতে হয়।
গরকুণ্ড—পিতামাতাকে পালন না করার পাপে মানুষকে যমালয়ে গরকুণ্ড নরকে বাস করতে হয়।
গনেশপদ—গয়ায় গনেশপদে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণের রুদ্রলোক লাভ হয়।
গয়া—গয়াসুরের তপস্যার স্থান 'গয়া' নামে প্রসিদ্ধ। শ্বেতবরাহকল্প মতে, গয়া নামে এক রাজা এখানে যজ্ঞ করেন, তাঁর নামানুসারে 'গয়া' নামকরণ হয়। এখানে গয়া শিলায় শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানে পিতৃকুলের উদ্ধার হয়। গয়াসুরের মুণ্ড পৃষ্ঠের চারদিকে সার্দ্ধদ্বিক্রোশ স্থান গয়া।
গয়ালি - গয়াতীর্থের পাণ্ডা। গয়ার পারলৌকিক ক্রিয়া করানোর পাণ্ডা।
গয়াশ্রাদ্ধ— গয়াতে শ্রাদ্ধ করলে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য ও গুরুদার গমন প্রভৃতি এবং তৎসংসর্গ পাপ এই শ্রাদ্ধের দ্বারা বিনষ্ট হয়।
গয়ামুক্তি—অনিচ্ছাপূর্বক মৃত্যু হলে, তার উদ্দেশে গয়ায় পিণ্ড দিলে সে মুক্ত হয়
গয়াশির— গয়াশিরে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানে একশত পুরুষের উদ্ধার হয়।
গয়ায় পিণ্ড সময়- গয়াতে চৈত্র, বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ, ফাল্গুন ও মাঘ এই কয় মাসে এবং চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ কালে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান ত্রিলোক-দুর্লভ। এই সময় পিণ্ডদানে পিতৃকুলের অক্ষয় স্বর্গবাস।
গয়ার পিণ্ড— পায়েস, চরু, শক্তু [ছাতু], পিষ্টক, তণ্ডুল, ফলফলাদি দ্রব্য, সঘৃত তিলকল্ক, খণ্ড [খাঁড়], গুড় অথবা, দধি, দুগ্ধ বা মধু দ্বারা গয়ায় পিণ্ডদান করার নিয়ম

গদালোল—হেতি নামক দৈত্য নারায়ণের গদাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হলে, রক্তাক্ত গদা শ্রীহরি গয়ায় প্রক্ষালণ করে মহাতীর্থে পরিণত করেন। এখানে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদানে পিতৃপুরুষের অক্ষয় স্বর্গবাস

গালি--অভিসম্পাত। শাপ।

গায়ত্রীতীর্থ—গয়ায় এই তীর্থে স্নান, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদানে পিতৃগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

গার্হপত্যপদ—গয়ার এই পদে শ্রাদ্ধ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞফল লাভ হয়।

গূঢ়মৈথুন--কাক। বায়স।

গোলকুণ্ড -অল্পদোষে কারাদণ্ড দেওয়ার পাপে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।

গোগ্রাস – প্রায়শ্চিত্তের পর মন্ত্রপূত করে গরুকে ঘাস খাওয়ানো।

গাত্রমলকুণ্ড—অশুদ্ধচিত্ত ও খল স্বভাবের জন্য মানুষ যে পাপ করে, তার জন্য যমালয়ে এই নরকে যেতে হয়।

গোত্র—কুলপ্রবর্তক ঋষি।

গোদান গরু-দান রূপ পুণ্যকর্ম। কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কার। কেশান্ত সংস্কার।

গোধূমখকুণ্ড--গৃহের দ্রব্য দি অপহরণের পাপীকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।

গোপুচ্ছ– গরুর লেজ। শাস্ত্রানুসারে গরুর লেজ ধরেই বৈতরণী পার হতে হয়।

গোমুখকুণ্ড—গবাদি পশুর জলভক্ষণে বাধা দিয়ে যে পাপ করে তাকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।

গৃহমাণ--কাক।

গোবরছড়া—মৃতের দেহ নিয়ে যাবার পর, গোবর জল দিয়ে ঐ স্থান শুদ্ধ করা।

ঘর্মকুণ্ড—ঘর্মযুক্ত হস্তে দেবদ্রব্যাদি স্পর্শ করার পাপে মানুষকে যমালয়ে নরকের এই কুণ্ডে বাস করতে হয়

ঘনবাত—নরকবিশেষ।

ঘাটখরচা—মড়া পোড়ানোর খরচ।

ঘাতস্থান—শ্মশান মৃত্যুর স্থান।

ঘূকারি—কাক।

ঘৃতাক্ত—যে সর্বাঙ্গে ঘি মেখেছে।

চক্রকুণ্ড—ব্রাহ্মণের দ্রব্য হরণের পাপীকে নরকের এই কুণ্ডে বাস করতে হয়।

চণ্ড—যমদূত

চণ্ডিল –নাপিত

চান্দ্রায়ণ ব্রত—ব্রহ্মপুরাণের মতে, পৌষ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে পাপনাশের জন্য এই ব্রত করার নিয়ম।

চন্দনধেনু—কোন নারী পতি-পুত্র রেখে মারা গেলে সন্তানগণ তার শ্রাদ্ধে চন্দনধেনু করে।

চরম—অন্তিমকাল।

চরণাশ্রিত - মৃত। ভগবানের চরণে আশ্রয় নিয়েছে যে।

চতুর্দোলা—চারজনে বাহিত দোলা। মৃতের খাট।

চলাচল—কাক।

চারমুক্তি –শাস্ত্রানুসারে গয়াশ্রাদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞান, গোশালায় মৃত্যু ও কুরুক্ষেত্রে বাস, মানুষের মুক্তি এই চার প্রকারে।

চিতা—শবদাহ স্থান। শবদাহের স্থানে ভূমিতে চুল্লী করে তার উপর সজ্জিত কাষ্ঠরাশি। চুল্লী। চুলা।

চিতি—চিতা।

চিতিকা—চিতা।

চিত্য—অগ্নি।

চিত্যা—চিতা।

চিত্র--যম।

চিত্রগুপ্ত—যমবিশেষ। চতুর্দশ যমের এক যম। যম রাজার অধীন সর্বজীবের পাপ, পুণ্য, আয়ু ইত্যাদির হিসাবরক্ষক যে কর্মচারী।

চিরজীবী—কাক
চুরিন—অপঘাতে মৃতানারীর প্রেতাত্মা।
চুল্লা, চুল্লি—দাহস্থান।
চূর্ণকুণ্ড—ব্রাহ্মণের শষ্য, তাম্বুল ও আসনচোরের পাপীকে নরকের এই কুণ্ডে বাস করতে হবে।
চৈত্য—শ্মশানতরু। চিতা সম্বন্ধীয়।
চিরশান্তি—দাহের পর চিরশান্তির জন্য গঙ্গাজলে নাভি ভাসান।

ছায়া—যমের বিমাতা।
ছত্রী—নাপিত।

জননাশৌচ—প্রসবকালে সন্তান মারা গেলে জননীর যে অশৌচ।
জনার্দন—গয়াক্ষেত্রে এর হাতে জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া হয়। শাস্ত্রানুযায়ী যার উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া হয় তার মৃত্যুর পর স্বয়ং জনার্দন সেই পিণ্ড গয়াসুরের মস্তকে অর্পণ করেন।
জন্মাষ্টমী—এই দিনে উপবাস করলে মানুষ সপ্ত জন্মের পাপ হতে মুক্ত হয়।
জন্মান্তর—অন্য জন্ম।
জমজ—যমজাত।
জলক্রিয়া—পিতৃগণের তর্পণ।
জলপ্রদান—প্রেতের উদ্দেশে জলদান। প্রেততর্পণ।
জলবদ্ধকুণ্ড—মহাবেশ্যা অর্থাৎ অষ্টাধিক পুংগামিনী পাপীর জন্য নরকের এই কুণ্ড।
জলাঞ্জলি—মৃতদেহ দাহের পর প্রেতের প্রীত্যর্থে জলদান। জলের অঞ্জলি।
জানাজা—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য সজ্জিত শব।
জ্বালামুখকুণ্ড—হাতে গঙ্গাজলে তুলসী ও শালগ্রামশিলা নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে পূর্ণ না করে অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা পাপীর জন্য নরকের এই কুণ্ড।
জ্বালাকুণ্ড—দেবতা ও ব্রাহ্মণের ঘি, তেল ইত্যাদির অপহারক পাপী নরকের এই কুণ্ডে যাবে।
জীবনান্ত—মৃত্যু। প্রাণান্ত। জীবনের অন্ত।
জীবন্মৃত—জীবিত অবস্থায় মৃতকল্প। জীয়ন্তে মরা।
জীবহীন—মৃত। জীবনশূন্য।
জ্যৈষ্ঠদ্বাদশী স্নান—পদ্মপুরাণ মতে, এই দিন গঙ্গায় স্নান করলে দণ্ড, পাশধর মহাকায় করালরূপী ভীষণ যমদূত মানুষের কাছে আসতে পারে না।
জিহ্মকুণ্ড—নিত্যক্রিয়াহীন, দেবতায় অনাস্থাকারীর স্থান হয় নরকের এই কুণ্ডে।

ঠেঁটা—বিধবার পরিধেয় বস্ত্র।

ডোকরান—অস্ফুটস্বরে কান্না।

তনয়—পুত্র, যে পুৎনামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে।
তপন—অগ্ন্যাদি-দাহাত্মক নরকবিশেষ।
তপঃ—যার দ্বারা পাপ দগ্ধ হয়।
তপনতনয়—যম।
তপশূর্মকুণ্ড—বল ও খলতায় ভূমি অপহরণের পাপীকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
তওবা—পাপ কাজ পুনরায় না করার সংকল্প।
তপ্ত—দুঃখিত। শোকার্ত।
তপ্তকুণ্ড—নরকবিশেষ। অতিথি ও ব্রাহ্মণদের ভোজন না করানোর পাপে এই নরককুণ্ডে অবস্থান করতে হয়।
তপ্তকুম্ভ—নরকবিশেষ।
তপ্তপাষাণকুণ্ড—নরকবিশেষ। দেবতা ও ব্রাহ্মণের রৌপ্য, বস্ত্রচোর পাপীকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হবে।
তপ্তলোক—নরকবিশেষ।
তপ্তশূর্মিকুণ্ড—নরকবিশেষ

তপ্তসুরাকুণ্ড—নরকবিশেষ পুরাণভোজন পাপে এই নরককুণ্ডে যেতে হয়।

তমঃ—নরক। শোক পাপ।

তমস্ —নরকবিশেষ।

তরপণ্য—পারাণি কড়ি। পার হবার কড়ি।

তরীষ—স্বর্গ

তৰ্ষ্টি - তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষা।

তর্পণ পিতৃযজ্ঞ। পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জলদান।

তল— নরকবিশেষ।

তবীষ—স্বর্গ

তাপ —পাপ। দুঃখ।

তাম্রকুণ্ড—গর্ভবতী স্ত্রীগমন পাপে যমালয়ে এই নরককুণ্ডে যেতে হয়

তামিস্র অন্ধকারময় নরকবিশেষ। যে ব্যক্তি বঞ্চনা করে তাকে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

তারিক— পারাণির কড়ি

তবিষ স্বর্গ।

তিন কর্ম মৃত্যু তিথির সংবৎসরান্তে পরলোকগতদের উদ্দেশে অগ্নিকরণ ভোজন ও দান এই তিন কাজে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করার নিয়ম।

তিতীর্ষা— পার হতে ইচ্ছা

তিনপক্ষবাস- গয়ামাহাত্ম্যমতে, পিণ্ডদানের উদ্দেশে তিনপক্ষ কাল গয়ায় বাস করলে সপ্তকুল পবিত্র হয়।

তিনকুল—পিতৃবংশ মাতৃবংশ ও শ্বশুর বংশ

তিরস্য—অন্তর্ধান

তিরোধান — অদর্শন অন্তর্ধান

তিরোভাব—অন্তর্ধান অদর্শন।

তিরোভূত -অন্তর্হিত

তিলাঞ্জলি – প্রেত তর্পণে তিল মিশ্রিত জলের অঞ্জলি। চির বিদায় দান

তিলোদক— তিলমিশ্রিত জল

তিলৌদন—তিলমিশ্রিত অন্ন। এর অন্য নাম কৃশর।

তিথিশ্রাদ্ধ— প্রতি মাসে মৃত্যু তিথিতে প্রেত, প্রেতপিতা, প্রেতপিতামহ, প্রেত প্রপিতামহের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করার নিয়ম

তীক্ষ্ণ— মরণ।

তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ড- স্বামীকে কটু বাক্যে তাড়না করার পাপে স্ত্রীকে যমালয়ে এই নরককুণ্ডে গমন করতে হয়

তীক্ষ্ণশৃঙ্গ— যব।

তীব্রপাষাণকুণ্ড—ব্রাহ্মণের বা দেবতার পিতল বা কাঁসার দ্রব্য চুরি করার পাপে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হবে।

তীর্থফল—তীর্থে ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, একাহারী, ভূমিশায়ী সত্যবাদী, পবিত্র ও সর্বভূতহিতে তৎপর হলে যে তীর্থফল লাভ হয় তার ফলে যম তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তীর্থযাত্রা পাপস্খালনের উদ্দেশে তীর্থে যাওয়া

তীথকাক— তীর্থস্থিত কাক। তীর্থে পিণ্ড চুরি করে যে কাক

তীর্থরাজ —গয়াতীর্থ।

তীর্থবাক কেশ। চুল।

তীরস্থ —মৃত্যু আসন্ন জেনে সজ্ঞানে গঙ্গালাভের বাসনায় নদীতীরে গমন

তুন্দকূপী নাভি

তুন্দী—নাভি।

তুষানল—তুষের আগুনে দেহ দাহ করে প্রায়শ্চিত্ত

তুরঙ্গপ্রিয়—যব

তূস্ত—পাপ।

ত্রৈরাত্রিক—মৃতের তিন অহোরাত্র।

ত্রৈরাত্রি —তিন দিনে যে শ্রাদ্ধ করা হয়।

তুলসীমালা—স্কন্দপুরাণের মতে, বায়ু ধুলো ওড়ালে সেই ধুলো যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি প্রেতরাজা যমের দূতগণ তুলসী কাঠের মালা দূর থেকে দেখেই নাশপ্রাপ্ত হয়।

তুলসীকাননে শ্রাদ্ধ—স্কন্দপুরাণের মতে, যেখানে তুলসীকাননের ছায়া আছে, সেখানে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হবে।

তৈলম্পাতা—স্বধা তদুপলক্ষিত শ্রাদ্ধ

ত্যজন—দান।

ত্রসন—ভয়। উদ্বেগ।

ত্রিদশবর্ত্ম—স্বর্গপথ।

ত্রিদশালয়—স্বর্গ।

ত্রিদশাবাস—স্বর্গ।

ত্রিদিব—স্বর্গ।

ত্রিবিষ্টপ—স্বর্গ।

ত্রিযামক—পাপ।

ত্রিবর্ত্মা—দেবযান, পিতৃযান ও দক্ষিণযানরূপ মার্গত্রয়যুক্ত জীব।

ত্রিবিষ্টপ—স্বর্গ।

ত্রিরাত্র—তিন দিনের অশৌচ।

ত্রিসর—তিলমিশ্রিত অন্ন।

দ—দান। দাতা।

দক্ষিণমানস—গয়াস্থিত তীর্থবিশেষ।

দক্ষিণাশাপতি—যম।

দক্ষিণান্ত—পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়ে যে ক্রিয়াকর্ম শেষ করা হয়েছে।

দগ্ধকাক—দাঁড়কাক।

দগ্ধকুণ্ড—দেবতা ও ব্রাহ্মণের ঘৃত, তৈলাদি অপহারক পাপীকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।

দণ্ড—যম। যমের প্রধান অস্ত্র।

দণ্ডকাক—দাঁড়কাক। কাকরূপী যম।

দণ্ডধর—যম।

দণ্ডধার—যম।

দণ্ডপাণি—যম।

দণ্ডযাম—যম।

দণ্ডতাড়নকুণ্ড—দুই বা সপ্তপুরুষগামী পাপী মহিলার জন্য নরকের এই কুণ্ড।

দত্তি—দান।

দত্রিম—দান দ্বারা নিষ্পন্ন

দদন—দান। বিতরণ।

দদ্র—ভয়।

দরিত—ভীত। শঙ্কিত। দুঃখ।

দলনকুণ্ড—স্বৈরিণী বা তিনটি পুরুষ গামী পাপীর জন্য নরকের এই কুণ্ড।

দবথু—উদ্বেগ। দুঃখ

দর্ভাসন—কুশাদি তৃণের আসন।

দিকপাল পশ্চিম যম

দস্তবস্ত—বদ্ধাঞ্জলি জোড়হাত।

দহন—চিতাগাছ। দগ্ধকারক।

দহনকেতন—ধূয়া। ধূম।

দহ্র—নরক।

দশযোগের স্নান—স্কন্দপুরাণের মতে, এই দশ যোগে স্নানে সর্বপাপ মুক্ত হয়—জ্যৈষ্ঠমাস, শুক্লপক্ষ, দশমী তিথি, বুধবার, হস্তানক্ষত্র, গর, আনন্দ, ব্যতীপাত, কন্যারাশিতে চন্দ্র এবং বৃষ রাশিতে সূর্য।

দশহরা—ব্রহ্মপুরাণের মতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথি দশটি পাপ হরণ করে বলে এই নাম।

দংশকুণ্ড—পশুহত্যার বিধি দিয়ে পাপ করে মানুষ যমালয়ে দংশকুণ্ড নরকে গমন করে।

দা—দান

দাক—দাতা

দাত—শুদ্ধ। পবিত্র।

দাতা—দানকর্তা, দানশীল।

দান—শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে বিধিপূর্বক কোন বস্তু প্রদান।

দানসাগর—শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ষোড়শ দান।
দানসামগ্রি—দানের উপকরণ।
দাঁড়কাক— কাকরূপী যম।
দাহন—ভস্মীকরণ। পোড়ান।
দাহসব —শ্মশান। শবদাহস্থান।
দাহিত— ভস্মীকৃত। জ্বালিত।
দাহী—দাহকরক।
দাহকাষ্ঠ— অগুরু। চন্দন।
দিৎসা— দান করার ইচ্ছা।
দিধক্ষু— দাহ করতে ইচ্ছুক।
দিনকরাত্মজ—যম।
দিনেশাত্মজ —যম।
দিব—স্বর্গ।
দিবসী—মৃত ব্যক্তির মৃত্যুদিবস পালন।
দিবাকীর্তি—নাপিত।
দিবাটন—কাক।
দিবি– স্বর্গ।
দিবিষ্ঠ - স্বর্গস্থ। স্বর্গীয়।
দিব্য—স্বর্গীয়। যব।
দিষ্ট—কাল। ভাগ্য।
দিষ্টান্ত—মৃত্যু। মরণ।
দীপান্বিতা—কার্তিকী অমাবস্যা। এই দিনে দিবাভাগে পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ এবং সায়ংকালে শ্মশানে দীপমালা প্রদান করতে হয়।
দীর্ঘনিদ্রা—মৃত্যু।
দীর্ঘায়ুস্—কাক
দুঃসহ—অসহ্য। যা অতি কষ্টে সইতে হয়।
দুঃস্বপ্ন—অশুভ ঘটনার স্বপ্ন
দুরদৃষ্ট—পাপ।
দুশ্চিন্তা—অশুভ ঘটনার চিন্তা।
দুস্কৃত—পাপ।
দুর্গ—নরক। যমদণ্ড। দুঃখ। মহাভয়
দুর্গতি—নরক।
দুর্মর—যার কষ্টে মৃত্যু হয়।
দুর্নিমিত্ত—অমঙ্গলের চিহ্ন।
দুস্কর্মা—পাপাত্মা। পাপ।
দুষ্কৃত— পাপ। পাপযুক্ত।
দুষ্কৃতি— পাপ। দুষ্কর্ম।
দূ—দুঃখ।
দূষিকাকুণ্ড—অতিথি নারায়ণ, অতিথি দর্শনে বিরক্ত হয়ে মানুষ যে পাপ করে, তাকে যমালয়ে এই কুণ্ডে যেতে হয়।
দৃষ্টান্ত—মৃত্যু।
দেবপথ—স্বর্গপথ।
দেবভূমি—স্বর্গ।
দেবলোক— স্বর্গ। দেবগণের বাসভূমি।
দেবালয়—স্বর্গ।
দেহকর্তা—ঈশ্বর।
দেহচূর্ণকুণ্ড—নরকের এই কুণ্ড কুলটা স্ত্রীদের জন্য।
দেহত্যাগ—আত্মার দেহ ছেড়ে যাওযা।
দেহধবক্—প্রাণবায়ু।
দেহভৃৎ—আত্মা।
দেহাবসান—দেহের অবসান। মৃত্যু।
দেহযাত্রা—মৃত্যু। দেহের যাত্রা।
দেহান্তর- -শরীরান্তর। অন্য দেহ।
দেহী—আত্মা।
দৈব—স্বর্গলোকসংক্রান্ত।
দৈবাকরি—যম।
দোষ—পাপ।
দ্যু—স্বর্গ।
দ্যুনিবাসী—স্বর্গবাসী।
দ্যুলোক—স্বর্গলোক।
দ্যো—স্বর্গ।
দৌ—স্বর্গ।
দ্রোণকাক—দাঁড়কাক।
দ্বয়াগ্নি—চিতাগাছ।
দ্বাদশীপিণ্ড—একাদশী তিথিতে পিতামাতার মৃত্যু তিথি হলে পদ্মপুরাণের মতে, একাদশীর দিন উপবাস করে দ্বাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান করতে হবে।

দ্বাদশমাসিক—বাব মাসে প্রেতোদ্দেশে
কবা শ্রাদ্ধবিশেষ।

দ্বাদশ শ্রাদ্ধ— শাস্ত্রে বাব বকমেব শ্রাদ্ধেব
কথা বলা হয়েছে নিত্য, নৈমিত্তিক,
কাম্য, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সপিণ্ডন পার্বণ
গোষ্ঠি, শুদ্ধ্যর্থ, কর্মাঙ্গ, দৈবিক, যাত্রার্থ
ও পুষ্ঠ্যর্থ এই বাব বকমেব মধ্যে
পার্বণ, একোদ্দিষ্ট, বৃদ্ধি ও সপিণ্ডীকবণ
এই চাব প্রকাব শ্রাদ্ধই মুখ্য।

দ্বিক —কাক।

দ্বিককাব কাক।

ধ্রুণ—স্বর্গ।

ধর্ম—ন্যায় অন্যায় ও পাপ পুণ্যেব বিচাব
কর্তা। যমেব অন্য নাম।

ধর্মপ্রণালী—পাপ পুণ্যেব বিশ্বাস ও
পবলোকে মুক্তিলাভেব জন্য উপাসনা
পদ্ধতি।

ধর্মভয়- ধর্মেব ভয়। অধর্ম কবলে ধর্মেব
কাছে দণ্ড পাওয়া ও পবলোকে অশেষ
যাতনা ভোগ কবতে হয় বলে যে বোধ
ও বিশ্বাস।

ধর্মভীরু—যাব ধর্মেব ভয় আছে।

ধর্মাধর্ম-- পুণ্য ও পাপ।

ধর্মানুযায়ী—ধর্মেব নিয়মানুসাবে অনুষ্ঠিত

ধর্মাবণ্য—গয়াব তীর্থবিশেষ। ধর্মবাজ
এখানে যজ্ঞ কবেছিলেন, স্নান-তর্পণে
পিতৃপুরুষেব ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

ধর্মবাজ—যমেব অন্য নাম।

ধর্মেন্দ্র—যম।

ধাতা—আত্মা।

ধূমপথ—পিতৃযান।

ধূমপ্রভা—ধূমময় নবক।

ধূমান্ধকুণ্ড—দেব ও বিপ্রেব ধনাপহাবী
পাপীকে নবকেব এই কুণ্ডে যেতে হয়।

ধূম্রোর্ণা—যমপত্নী।

ধেনুকাবণ্য —গয়ায় এই স্থানে স্নান ও
কামধেনু পদে পিণ্ডদান কবলে পিতৃগণ
ব্রহ্মধামে গমন কবেন।

ধেনুমূল্য— প্রায়শ্চিত্তরূপ ধেনুদানেব
নিষ্ক্রয় স্বরূপ মূল্যবিশেষ

ধ্বাঙ্ক্ষ—কাক

নক্রকুণ্ড জলেস্থিত নক্রাদি হননকাবী
পাপীব জন্য নবকেব এই কুণ্ড

নক্রমুখ সামান্য দ্রব্য অপহবণেব
পাপীকে নবকেব এই কুণ্ডে যেতে হয়

নখকুট্ট নাপিত।

নখকুণ্ড শ্রাদ্ধ ও উপবাসে সংযম
ত্যাগেব পাপে মানযকে যমালয়েব এই
নবকে যেতে হয়।

নগবীবক—কাক।

নবধেনু—দানেব জন্য ক্ষীবেব তৈবী
গাভী।

নবজীবন - মৃতবৎ অবস্থাব পববর্তী
প্রাণবন্ত অবস্থা।

নভঃ—স্বর্গ।

নভঃস্থিত - নবকবিশেষ

নবক— দুঃখভোগেব স্থান। দৈত্যবিশেষ।
কলিব পৌত্র। কলিব পুত্র ভয়েব
ঔবসে তদীয় ভগ্নী মৃত্যুব গর্ভে
জন্মগ্রহণ কবে এবং স্বীয় ভগ্নী যাতনাব
পাণিগ্রহণ কবেন।

নবকযন্ত্রণা—মৃত্যুব পব যেখানে পাপ
যন্ত্রণাব ফল ভোগ কবতে হয়।

নবককুণ্ড—সংযমনী পুবীব যাতনাময় স্থান

নবকজিৎ—বিষ্ণু

নবকগামী—পাপেব শাস্তি ভোগ কবতে
নবকে যায় যে।

নবকদেবতা—নিবযদেবী অলক্ষ্মী

নবকপূর্ণিমা ব্রত— বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত।
পূর্ণিমা তিথিতে শুরু কবে এক বছব
প্রতি পূর্ণিমাতে এই ব্রত কবতে হয়

নরকভূমি—যাতনা ভোগের স্থান।

নরকমুক্ত—নরক হতে নিস্তার প্রাপ্ত। নরক হতে উত্তীর্ণ।

নরকস্থ—যে নরকে থাকে। কর্মদোষে যাকে নরকে থাকতে হয়।

নরকস্থা—বৈতরণী নদী।

নরকান্তক—বিষ্ণু। নারায়ণ।

নরকাময়—প্রেত।

নরকীলক—গুরুহত্যাকারী পাপী।

নরুনপেড়ে—স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাদের নরুনের মতো সরু পাড়যুক্ত যে কাপড় পড়ানো হয়।

নল—পিতৃলোক বিশেষ।

নশ্বর—যার নাশ হয়।

নাক—স্বর্গ।

নাকীকান্না—নাকী সুরে কান্না।

নাড়ীজঙ্ঘ—কাক।

নান্দীমুখ—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী মাতাপিতাগণ। এঁরা ছয় পুরুষের—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

নান্দীমুখী—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভুক মাতৃগণ।

নপ্তা—যার দ্বারা বংশক্রমের পতন হয় না।

নাপাক—অপবিত্র। পাপ।

নাপিত—ক্ষৌরকর্ম যে জাতির ব্যবসায়।

নাগবেষ্টনকুণ্ড—যে ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ বৈদ্য বা দৈবজ্ঞ বৃত্তি গ্রহণ করার পাপ করে, তাঁকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।

নাভি—উদরের মধ্যভাগের গর্ত। নাই। চক্রের মধ্যপিণ্ডিকা। বলা হয়, দেহ পোড়ালেও নাভি পোড়ে না।

নাভিপদ্ম—পদ্মের মতো নাভি। মৃতদেহ সৎকারের পর চিতা থেকে নাভিপদ্ম সংগ্রহ করে মাটির পাত্রে তা গঙ্গাজলে বিসর্জন করার নিয়ম।

নাভিস্থল—নাভিপ্রদেশ। মধ্যস্থল।

নাভিশ্বাস—মুমূর্ষু ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট।

নাম—শোক। স্মরণ।

নামশেষ—মৃত্যু। যার নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

নামাবলী—যমকে ফাঁকি দিতে দেবতার নাম লেখা উত্তরীয়, যা দিয়ে শরীর ঢেকে রাখা হয়।

নারক—নরক। দুঃখভোগের স্থান। নরকভোগী। নরকঘটিত।

নারকী—নরকস্থ। নরক সংক্রান্ত। নরকবাসের উপযুক্ত। যার নরকবাস হওয়া উচিত। পাপিষ্ঠ।

নারকীয়—নরকেরই উপযুক্ত।

নারায়ণবলি—মৃত। প্রায়শ্চিত্তাত্মক কর্মবিশেষ।

নালিজঙ্ঘ—দাঁড়কাক।

নাশ—মৃত্যু। ধ্বংস।

নাশিত—নিহত।

নিঃযম—শোক।

নিঃসরণ—মৃত্যু। মুক্তি।

নিকারণ—মারণ। বধ।

নিত্যমুক্ত—কালত্রয় ও বন্ধনমুক্ত পরমাত্মা।

নিত্যশ্রাদ্ধ—যে শ্রাদ্ধ প্রতিদিন করা হয়।

নিধন—মৃত্যু। বিনাশ।

নিপাত—মৃত্যু। নিধন। মরণ।

নিপুর—লিঙ্গদেহ। সূক্ষ্মশরীর।

নিবর্হণ—মারণ।

নিবর্হিত—নিহত।

নিমীলন—মরণ।

নিমীলিত—মৃত

নিয়তি—ঐশিক নিয়ম। ঈশ্বর যে বিষয় যেমনভাবে ঘটাবার নিয়ম করে রেখেছেন। পূর্বজন্মের শুভাশুভ কর্মের ঈশ্বর নির্ধারিত ফলভোগাবস্থা। মৃত্যু।

নিয়তাচার—নিয়মিতভাবে পালনীয় শাস্ত্রীয় আচার।

নিরয়—পাপীরা মৃত্যুর পর যে স্থানে গিয়ে শাস্তিভোগ করে। যন্ত্রণাভোগস্থান। নরক।
নিরয়গামী—যে নরকে যায়। কর্মদোষে যাকে নরকে যেতে হয়। নরকগামী।
নিরাক—অসৎ কর্মফল।
নিরানন্দ—নিকট আত্মীয় বিয়োগে যার মনে আনন্দ নেই।
নির্গ্রন্থন—মারণ। বধ।
নির্বর্হণ—মারণ।
নির্যাণ—প্রাণ বায়ুর দেহপরিত্যাগ।
নির্যাতন—মারণ। বধ।
নির্বপণ—দান। পিতৃলোকের উদ্দেশে দান।
নির্বংশ—যার কোন বংশধর জীবিত নেই।
নির্বাণ—পবিত্রাণ। মোক্ষ। মুক্ত। ভোগ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ।
নির্বাপ—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান।
নির্বৃতি—মুক্তি। মৃত্যু।
নির্হরণ—শবদাহ। গৃহ থেকে শব বাইরে আনা।
নির্হার—শবদাহ।
নির্হারক—যে গৃহ হতে শব বহিষ্কৃত করে।
নিবপন—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান।
নিবাপ—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান।
নিবু নিবু চিতা—যে চিতা নিভে যাবার উপক্রম হয়েছে।
নিবৃত—আচ্ছাদন বস্ত্র। আচ্ছাদিত।
নিশিডাক—নিশি নামক ভূতুড়ে আত্মার ডাকে যে মানুষ গৃহত্যাগ করে প্রাণ হারায়।
নিশারণ—মারণ। বধ।
নিঃসন্তান—সন্তান নেই যার।
নিসূদন—হত্যা। বধ।
নিষ্কলুক—যাকে কোন পাপ স্পর্শ করে নি।
নিষ্কালক—যার কেশাদি মুণ্ডিত হয়েছে।
নিষ্পাপ—যার পাপ নেই।
নিষ্প্রাণ—যার প্রাণ নেই।
নিষ্টান—মৃত্যু।
নিস্তর্হণ—হনন। বধ।
নিস্তারক—ত্রাণকর্তা। উদ্ধারক।
নিস্তারবীজ—যার দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়।
নিহত—হত। বিনাশিত।
নিহনন—হত্যা। বধ।
নিহিংসন—হনন। বধ।
নীলবৃষ—যে বৃষের দেহ রক্তবর্ণ, মুখ ও লেজ পাণ্ডুবর্ণ। শৃঙ্গ ও খুর শুভ্রবর্ণ-এই বৃষই নীলবৃষ। গয়ায় এই বৃষ উৎসর্গ করলে নরকভয়ভীরু পিতৃগণ পরিত্রাণ পাবে বলে বিশ্বাস।
নৃকপাল—শবমস্তকের খুলি। নরকপাল।
নেড়া—কেশ মুণ্ডন করা হয়েছে যার।
নৈমিত্তিকদান—পাপ থেকে শান্তির উদ্দেশে দান।
নৈরয়িক—নরকবাসী।
নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ—একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। গ্রহণ ও অষ্টকাদি নিমিত্তক যে শ্রাদ্ধ তাকেও নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ বলে।
ন্যক্ষ—মহিষ।
ন্যস্তশস্ত্র—পিতৃলোক।

পক্ষিনী অশৌচ—দিবা ও তন্মধ্যবর্তিনী রাত্রিকে পক্ষিনী বলে। পরদিন সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত এই অশৌচ ধরা হয়।
পঙ্কপ্রভা—কর্দমযুক্ত নরকবিশেষ।
পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণবায়ু।
পঞ্চ বায়ু—পঞ্চ প্রাণবায়ু।
পঞ্চত্ব—মৃত্যু। মরণ।
পঞ্চচূড়া—মুণ্ডিত মস্তকে পাঁচটি চূড়া।
পঞ্চত্বপ্রাপ্ত—মৃত।
পঞ্চতীর্থ—দশাশ্বমেধ, হংসতীর্থ, অমরকন্টক, কোটিতীর্থ ও রুক্মকুণ্ড-এই পঞ্চ তীর্থে পিণ্ড দান করলে পিতৃগণের স্বর্গলাভ হয়।

পঞ্চত্বগত— মৃত।
পঞ্চপাত্র—দুই দেবপক্ষ ও তিন পিতৃপক্ষ এই পঞ্চপাত্রশ্রাদ্ধ।
পঞ্চমহাযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি, অতিথিপূজা এই পাঁচ কর্ম।
পঞ্চযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ।
পঞ্চাবস্থ—শব। মৃতদেহ।
পত্রনর—পাতা দিয়ে তৈরী মনুষ্যমূর্তি।
পতনীয়—পাপ।
পতিঘ্ন—পতির মৃত্যুসূচক কররেখা।
পতিত— নরক।
পতিতপাবন—পাপী বা পতিতকে পবিত্র করেন যিনি।
পতিত উদ্ধার—পাপী বা পতিতকে উদ্ধার করেন যিনি।
পদচিহ্ন—মৃত্যুর পর আলতা বা রঙ দিয়ে নেওয়া পায়ের ছাপ।
পদপ্রান্ত—পায়ের তলা।
পদতল—পায়ের তলা।
পরভৃৎ—কাক।
পরমগতি—মোক্ষ। মুক্তি। নির্বাণ।
পরমৃত্যু—কাক ।
পরলোক—লোকান্তর। পরকাল। মৃত্যু।
পরলোকগম—মৃত্যু।
পরসংজ্ঞক— আত্মা।
পরামাণিক— নাপিত।
পরাশর—পিতার মৃত্যুর পর জাত পুত্র।
পরাসর—বধ। হনন।
পরাসু—মৃত। গতপ্রাণ।
পরাসুতা—মৃত্যু।
পরি—শেষ। শোক।
পরিক্রমণ—মুখাগ্নির সময় মৃতদেহের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ।
পরিণতি— শেষ। অবসান।
পরিতাপ—নরকবিশেষ। শোক। দুঃখ। সন্তাপ।
পরিদেবন—শোকনিমিত্ত বিলাপ।
পরিদেবী—বিলাপী।
পরিনির্বপণ—দান।
পরিনির্বিপ্সা—দানেচ্ছা।
পরিনির্বিপ্সু—দানেচ্ছু।
পরিবর্জন—হনন। বধ।
পরিবাপ—মুণ্ডন। নেড়া করা।
পরিবাপিত— মুণ্ডিত।
পরিমোক্ষ— বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি।
পরিমোক্ষণ—বন্ধন থেকে মুক্তি।
পরিসর—মৃত্যু।
পরিসরণ—মৃত্যু।
পরেত— মৃত। মরা। প্রেত।
পরেতরাট্— যম। প্রেতপতি।
পড়বিশ—যমের পাশ (পদবন্ধন)।
পর্বতকাক— দাঁড়কাক।
পলপ্রিয় —কাক।
পবিত্রধান্য—যব।
পাটুয়া—শ্রাদ্ধক্রিয়ায় লাগা কলাগাছের খোলা।
পাংশু—পাপ।
পাপনাশনীসপ্তমী ব্রত— ভবিষ্যপুরাণের মতে, শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথির হস্তানক্ষত্র, এই পাপনাশিনী সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করতে হয়।
পাপমোচন ব্রত— সৌরপুরাণের মতে, বিল্ব বৃক্ষ আশ্রয় করে বার দিন উপবাস করে ব্রত করলে ভ্রূণহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।
পাপত্রাণ সংক্রান্তি ব্রত— স্কন্দপুরাণের মতে, সংক্রান্তিতে পাপত্রাণের জন্য এই ব্রত করতে হয়।
পাংশুল—পাপিষ্ঠ।
পাংসন—পাপিষ্ঠ।
পাচন—প্রায়শ্চিত্ত।

পাণিমুখ—পিতৃলোক।
পাতক— পাপ।
পাতকী—পাপী।
পাতঙ্গি—যম।
পাতাল—নরক।
পাত্রটীর—কাক।
পাত্রেসমিত— পাপীবিশেষ।
পাপ—অধর্ম। পাপিষ্ঠ। পাপজনক।
পাপবুদ্ধি— পাপপূর্ণ বুদ্ধি যার।
পাপবেষ্টকুণ্ড— জিনিষ দিয়ে তা অপহরণের পাপী নরকের এই কুণ্ডে স্থান পাবে।
পাপহর—যিনি পাপ হরণ করেন।
পাপমতি— পাপে মতি যার।
পাপকৃৎ—পাপিষ্ঠ। পাপকারী।
পাথরচাপা—প্রচণ্ড দুঃখে যে কাঁদতে ভুলে যায়।
পাপঘ্ন—পাপনাশক। তিল।
পাপভাক্— পাপী।
পাপল—পাপগ্রাহক। অধর্মবিশিষ্ট।
পাপাত্মা—অধার্মিক।
পাপাশয়—পাপকারী।
পাপাত্মা—যার আত্মা পাপযুক্ত।
পাপাত্মন্—পাপিষ্ঠচিত্ত।
পাপিষ্ঠ— অতি পাপী।
পাপী—পাপযুক্ত।
পাপ্‌ম—পাপ।
পামর—পাপিষ্ঠ।
পার্বণশ্রাদ্ধ— পাপনাশের জন্য অমাবস্যা, অষ্টমী, নবমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী পর্বে যে শ্রাদ্ধ হয়।
পারক্য—পরলোকসংক্রান্ত।
পারলৌকিক— পরলোক সম্পর্কিত।
পারত্রিক— পারলৌকিক। পরলোকসম্বন্ধীয়।
পারাণি—পার হবার কড়ি।
পাশী—যম।
পাষণ্ড— পাপ চিহ্ন ধারন করে যে।
পিণ্ড—পিতৃলোকে প্রদেয় গোলাকার অন্ন ও খাদ্যদ্রব্যের গ্রাস।
পিণ্ড নাশ— পিণ্ডদানের অধিকারীর মৃত্যু।
পিণ্ডভাগী—প্রেতপিণ্ড পাবার অধিকারী।
পিণ্ডদ— যে পিণ্ড দেয়। পিণ্ডদানকর্তা।
পিণ্ড বিচ্ছেদ—পিণ্ডপ্রাপ্তির অভাব।
পিণ্ডী— পিণ্ডিকাপিণ্ড।
পিতৃকল্প—পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদির বিধান।
পিতৃকানন—শ্মশান।
পিতৃকার্য—শ্রাদ্ধতর্পণাদি।
পিতৃকৃত্য—শ্রাদ্ধতর্পণসম্বন্ধীয় কাজ।
পিতৃক্রিয়া—শ্রাদ্ধক্রিয়া।
পিতৃতর্পণ—পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশে জলদান। পিতৃলোকের তৃপ্তি।
পিতৃগৃহ—শ্মশান।
পিতৃতিথি—অমাবস্যা।
পিতৃতীর্থ—গয়াধাম। হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যস্থান।
পিতৃদান—শ্রাদ্ধতর্পণাদি। মৃত পিতৃ-উদ্দেশ্যে অন্নবস্ত্র দান।
পিতৃদিন—অমাবস্যা।
পিতৃপতি— যম।
পিতৃপক্ষ—গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ। প্রেতপক্ষ।
পিতৃপ্রসু—পিতৃগণের প্রেতাত্মার ভ্রমণ করার সময়।
পিতৃভোজন—মাসশ্রাদ্ধ।
পিতৃমাতৃহীন—পিতা-মাতা জীবিত নেই যার।
পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ। তর্পণ।
পিতৃযান—পিতৃগণের চন্দ্রলোকগমন মার্গ।
পিতৃলোক— চন্দ্রলোকস্থিত স্থানবিশেষ।
পিতৃবন—শ্মশান।
পিতৃবসতি— শ্মশান।
পিতৃশ্রাদ্ধ— পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধতর্পণাদি।

পিতৃসদন—কুশ।
পিণ্ডঘ্রাণ—বরাহপুরাণের মতে, নিত্য উপবাস ও নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ যদি একই দিনে পরে, তাহলে উপবাসের দিনই শ্রাদ্ধ করে পিতৃসেবিত পিণ্ডের আঘ্রাণ নিয়ে উপবাস করতে হয়।
পিণ্ডদান—হিন্দুদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাশাস্ত্র নিষ্পাদিত হয় না, তাদের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়, কোথাও শান্তি পায় না। এই কারণে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে।
পিশুন—কাক।
পিহিত— তিরোহিত।
পুণ্যক— পুত্র কামনায় পালনীয় ব্রত ও উপবাসাদি।
পুণ্যলোক— স্বর্গ। দেবলোক।
পুৎ—নরকবিশেষ। পুত্র না হলে যে নরকে যেতে হয়।
পুত্রিকা—যে কন্যার পুত্রকে শ্রাদ্ধের অধিকার দান করা হয়।
পুত্র—যে পুন্নাম নরক থেকে পিতাকে ত্রাণ করে।
পুত্রকাম—পুত্রলাভের অভিলাষী।
পুত্রেষ্টি—পুত্র কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ।
পুদ্গল—আত্মা।
পুনর্জন্ম—পুনর্বার সংসারে জন্মগ্রহণ।
পুনরুদ্ভব—পুনরায় জন্মগ্রহণ।
পুনরুৎপত্তি—পুনরায় জন্মগ্রহণ।
পুনর্ভবী—আত্মা।
পুনর্ভব—পুনরায় জন্মগ্রহণ।
পুণ্যাত্মা—যার আত্মা পবিত্র।
পুন্নামা—নরকবিশেষ। পুত্র না হলে যে নরকে যেতে হয়।
পুন্নামন্—নরকবিশেষ।
পুরঞ্জন—আত্মা।
পুরু—দেবলোক।
পুরুষ—আত্মা।
পূষকুন্ত—শূদ্র-শ্রাদ্ধভুক ও শূদ্রশববহন পাপে যমালয়ে এই নরকুণ্ডে গমন করতে হয়।
পুষ্যি—পালনীয় পরিবারবর্গ।
পুষ্পবর্ষণ—উপর থেকে ফুল ছড়ানো।
পুরোহিত— শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদি কারয়িতা।
পূপাষ্টকা—অগ্রহায়ণ মাসে পিষ্টকসহ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান।
পূতিমৃত্তিক—নরকবিশেষ।
পূয়োদ—নরকবিশেষ।
পূরক— মৃতাশৌচকালে দেয় দশপিণ্ড।
পূর্ণাশৌচ— মরণে ব্রাহ্মণের ১০ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫দিন, শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হয়, এই দিনগুলি স্বজাতভুক্ত পূর্ণাশৌচ।
পূর্বজ—চন্দ্রলোকস্থ পূর্বপুরুষ।
পূর্বজন্মলব্ধ—পূর্বজন্মের কর্মের ফলে যা লব্ধ হয়েছিল।
পূর্বপুরুষ—বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষ।
পূর্বসংস্কার—পূর্বজন্মের কর্মের ফলে জাত মনোভাব।
পৃথিবীপতি— যম।
পৃথিবীপাল—যম।
পৃথিবীক্ষিৎ—যম।
পৈত্রাহোরাত্র—পিতৃলোকের একদিন, মানুষের এক মাস।
প্রকম্পনকুণ্ড— ব্রাহ্মণকে ভয় প্রদর্শন করার পাপে নরকের এই কুণ্ডে গমন করতে হয়।
প্রকালন—মারণ।
প্রজান্তক— যম।
প্রাণাশ—মৃত্যু। মরণ।
প্রণিঘাতন—মারণ। হত্যা। বধ।
প্রতিচিত্র—মৃত ব্যক্তির অবিকল নকল।
প্রতিঘাতন—হত্যা। মারণ।

প্রতপ্ত তৈলকুণ্ড— দণ্ড দ্বারা বৃষকে তাড়না করার পাপে যমালয়ে এই নবককুণ্ডে যেতে হয়।
প্রত্যগাত্মা—অন্তর্নিহিত আত্মা।
প্রত্যুলূক— কাক।
প্রনষ্ট—মৃত।
প্রণামী—শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার পর পুরোহিতকে দেয় দক্ষিণা।
প্রপতন—মৃত্যু।
প্রপিতামহ—পিতামহের পিতা।
প্রমদক—যে পরলোক মানে না। নাস্তিক।
প্রমাপণ—হত্যা। মারণ।
প্রমায়ুক—মরণশীল।
প্রমীত—মৃত। হত। যজ্ঞার্থে হত।
প্রয়াত— প্রয়াণ করেছেন যিনি।
প্রবাসিত—হত।
প্রায়োপবেশন—অনাহারে মৃত্যু কামনায় বসা।
প্রাচীনাবীত—শ্রাদ্ধাদি কর্মে বামকর বহিষ্কৃত করে দক্ষিণ স্কন্ধে অর্পিত যজ্ঞসূত্র।
প্রাক্তন— পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফল।
প্রাণ—হৃদয়স্থ বায়ু।
প্রাণবায়ু -পঞ্চ প্রাণ বায়ু।
প্রাণন — প্রাণ। জীবন।
প্রাণান্ত—প্রাণাবসান। জীবনান্ত। মৃত্যু।
প্রাণাত্যয়—জীবন নাশের সময়।
প্রাপ্তকাল—আসন্ন মৃত্যু। যার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে।
প্রাপ্তপঞ্চত্ব—মৃত।
প্রায়—অনশন-মৃত্যু।
প্রায়ণ—দেহত্যাগে স্থানান্তরে গমন।
প্রায়োপবিষ্ট—মৃত্যুকামনায় যে উপবেশন করছে।
প্রায়শ্চিত্ত—পাপক্ষয়-সাধন কর্ম। চিত্তের বিশুদ্ধতা-সাধন।

প্রারব্ধ— পূর্ব জন্মার্জিত কৃতকর্মের ফল যার শুরু হয়েছে।
প্রাবট—যব।
প্রাশিত—তর্পণ। পিতৃযজ্ঞ।
প্রীণন—তর্পণ।
প্রেত—নরকস্থ প্রাণী। পিশাচ। মৃত ব্যক্তির আত্মা। সপিণ্ডীকরণের পূর্ব পর্যন্ত নাম প্রেত।
প্রেতকার্য —প্রেতোদ্দিষ্ট কার্য।
প্রেতকৃত্য—মৃতের কার্য।
প্রেতকর্মণ্—দাহন সপিণ্ডীকরণাদি।
প্রেতগৃহ—শ্মশান।
প্রেতবন্—শবদাহস্থান।
প্রেতদেহ— প্রেতের শরীর।
প্রেতনদী—বৈতরণী নদী।
প্রেতপক্ষ— প্রেততর্পণীয় পক্ষ।
প্রেতপটহ—মৃত্যুকালে বাদনীয় বাদ্য।
প্রেতপতি যম।
প্রেত প্রসাধন—পুষ্পাদি দ্বারা শবদেহ ভূষিত করা।
প্রেতরাজ -যম।
প্রেতপিণ্ড —মরণাবধি সপিণ্ডকরণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে দেওয়া পিণ্ড।
প্রেতপুর—যমালয়।
প্রেতলোক— যমলোক। প্রেতলোকগত ব্যক্তিকে জলপূর্ণ কুম্ভের সঙ্গে অন্নদান করলে প্রেত পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়।
প্রেতশিলা—পিণ্ডদানার্থে গয়ার প্রস্তর বিশেষ।
প্রেতশৌচ—মৃত ব্যক্তির সংস্কারাদি।
প্রেতশ্রাদ্ধ—প্রেতোদ্দেশে শ্রাদ্ধ।
প্রেতা—বৈতরণী নদী।
প্রেত্য—পরলোকে। লোকান্তরে।
প্রেমাপাতন—রোদন। অশ্রুবিসর্জন।
প্লোষ—দাহন। পোড়ান।

ফলভূমি—কর্মের ফলভোগস্থান

ফুকার—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করা।
ফৌত—মৃত্যু। মরণ।

বধ—হত্যা। বিনাশ করা। হনন।
বজ্রদংষ্ট্রকুণ্ড—অদণ্ডকে দণ্ডদাতার স্থান হবে যমালয়ের এই কুণ্ডে।
বটেশ শিব—গয়ায় বটেশ শিবকে অর্চনা ও প্রণতি করলে সনাতন ব্রহ্মধামে পিতৃগণের গতি হয়।
ব্যসন—পাপ। অমঙ্গল। দুঃখ। বিনাশ।
বধোদর্ক—মৃত্যুই যার পরিণাম ফল।
বসাকুণ্ড—কোন বস্তু ব্রাহ্মণকে দিয়ে, আবার তা অন্যকে দান করে যে পাপ করে তাদের যমালয়ে এই নরকে যেতে হয়।
বলিপুষ্ট—কাক।
বহ্নিকুণ্ড— কুকথায় বন্ধুদের হৃদয় দগ্ধ করে যিনি পাপ করেছেন, তারা যমালয়ে এই কুণ্ডে অবস্থান করে।
বাড়বাগ্নি—নরকবিশেষ।
বাড়বানল—নরকবিশেষ।
বালুকাপ্রভা—নরকবিশেষ।
ব্রহ্মদৈত্য—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ।
বোঙ্গা—মৃত মানবের আত্মা।

ভগদত্ত—নরক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র।
ভদ্রাকরণ—মুণ্ডন। কামান।
ভদ্রাকৃত—মুণ্ডিত মস্তক।
ভবলীলা—জীবনের লীলা।
ভবরুদ্—প্রেতপটহ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসময়ে বাদনীয় বাদ্যবিশেষ।
ভাসান—নদীর জলে নাভিপদ্ম বিসর্জন।
ভস্মসাৎ—ছাই হওয়া।
ভস্মিত—বিনাশিত। ভস্মীভূত।
ভস্মীভূত—ভস্মপ্রাপ্ত।
ভাণ্ডারা—শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশে শ্রীভগবানের নিবেদিত বস্তু দিয়ে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করানো।
ভাগ্যদেবতা—পাপপুণ্যের বিচারে যিনি অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন।
ভাণ্ডপুট—নাপিত।
ভাগ্যচক্র—পাপপুণ্যের হিসেবে চক্রবৎ ঘূর্ণমান ভাগ্য।
ভাণ্ডিন—নাপিত।
ভাণ্ডিরাহ—নাপিত।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—কার্তিক মাসের শুক্লা যম, দ্বিতীয়া। যমেব হাত থেকে বাঁচিয়ে দীর্ঘায়ু কামনায় বোনেদের দেওয়া ভাইকে ফোঁটা।
ভারূপ—আত্মা।
ভাব—আত্মা।
ভীমশাসন—যম।
ভূতযজ্ঞ—জীবকে শাস্ত্রসম্মত রূপে অন্নদান।
ভূতবলি—শাস্ত্রসম্মত রূপে অন্নদান।
ভূতচতুর্দশী—কার্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দশী যম-চতুর্দশী বা ভূতচতুর্দশী।
ভূশুণ্ডী—পুরাণে বর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাক।
ভূভার—পৃথিবীর পাপের বোঝা।
ভূমিজ—নরকরাজা। নরকাসুর।
ভূমিপুত্র—নরকাসুর।
ভূমিলাভ—মৃত্যু।
ভূমিবর্ধন—মৃতদেহ। শব। মড়া।
ভূসুত—নরকাসুর।
ভোগদেহ—স্বর্গ-নরক ভোগার্থ সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে সুখ-দুঃখ ভোগ হয়।
ভোজ্য—পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি বিধানের জন্য দেয় অন্নাদি।
ভোগী—নাপিত।
ভৌম—নরকাসুর।

ম—যম।
মতঙ্গেশ—গয়ার এই তীর্থে মতঙ্গেশ শিব সমীপে পিতৃতর্পণে পিতৃকুল উদ্ধার হয়।
মর্ত—যেখানে মানুষ মরে।
মর্তধাম—যেখানে মরণশীল মানুষের বাস।

মর্তলোক— যে লোকে বা স্থানে মরণশীল মানুষ থাকে।
মর্তুকাম—মৃত্যু কামনা যার।
মন্দ—যম।
মর—মরণ।
মরণ—মৃত্যু। দেহনাশ। দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ।
মরণশীল—যার মৃত্যু হবেই।
মরণান্ত—মৃত্যু যার অবসান।
মরা—মৃত। গতাসু। মড়া।
মরণডাক—মৃত্যুর পূর্বে শেষ আর্তনাদ।
মরণকামড়—মৃত্যু নিশ্চিত জেনে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য শেষ চরম আঘাত।
মরাহাজা—মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত।
মরাকান্না—বিরক্তিকর প্রবল কান্না।
মড়া—প্রাণহীন দেহ।
মড়াঞ্চে— যে নারীর সন্তান জীবিত থাকে না।
মরণাশৌচ—মৃত্যুর জন্য অশৌচ।
মরণদশা—মরণের অবস্থা।
মল—পাপ।
মলভুক্—কাক। বায়স।
মজ্জকুণ্ড— ভোজনার্থে জীবহিংসা করে যে পাপী, যমালয়ে সেই এই নরককুণ্ডে গমন করে।
মলিন—পাপযুক্ত। পাপিষ্ঠ। পাপ।
মশককুণ্ড— ক্ষুদ্র জীব বিনাশ-বিধি দান করে পাপী এই নরককুণ্ডে গমন করে।
মলিনমুখ—প্রেত।
মধুস্রবা—ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, দেবিকা ও মহানদী গয়াব যে স্থানে ধর্মশিলায় যুক্ত হয়েছে সেই স্থান মধু স্রবা। এখানে পিণ্ডদান করলে শতকুল পিতৃগণ পরিত্রাণ পেয়ে বিষ্ণুলোকে স্থান পায়।
মর্ম্মাহত— যে মর্মে আহত।
মসীকুণ্ড— ম্লেচ্ছজীবী ও মসীজীবী পাপী ব্রাহ্মণকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
মহাচণ্ড—যমদূত। যমভৃত্য।
মহাতমঃপ্রভা—নরকের নিম্নভাগ।
মহাদণ্ড—যমদূতবিশেষ।
মহানিদ্রা—মৃত্যু। মরণ।
মহাপথ—মরণ। হিমালয় উত্তরস্থ স্বর্গারোহণ পথ।
মহাপাপ—পঞ্চবিধ পাপ মহাপাপ— ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি, গুরুপত্নী হরণ ও সংসর্গজন্য পাপ।
মহাপাতকী—মহাপাপী। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত মহাপাতকী শ্রাদ্ধতত্ত্ব মতে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষয় হলে তাদের শবদাহ হবে।
মহাপ্রয়াণ—অন্তিম নিদ্রা, মৃত্যু।
মহাপ্রস্থান—মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা।
মহাব্রাহ্মণ—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারয়িতা ব্রাহ্মণ।
মহাবোধিবৃক্ষ—গয়ায় ব্রহ্মতীর্থে মহাবোধি অশ্বত্থবৃক্ষমূলে শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধকর্তা ও পিতৃলোক উদ্ধার হয়।
মহাব্রহ্ম—অগ্রদানী ব্রাহ্মণ।
মহারৌরব—নরকবিশেষ। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নরক।
মহিবীচি—নরকবিশেষ।
মহিষ—যমের বাহন।
মহিষধ্বজ—যম।
মহিষবাহন—যম।
মহেন্দ্রগিরি—গয়ায় গয়াসুরের পদদ্বয় মহেন্দ্রগিরি দিয়ে নিশ্চল করা হয়েছিল, এখানে পিণ্ডদানে সপ্তকুলের উদ্ধার হয়।
মহোদয়—মুক্তি। মোক্ষ।
মাঠর—যমবিশেষ।
মাতৃদায়—মাতার পরলোক গমনে শ্রাদ্ধাদির দায়িত্ব।
মাতৃপিতৃহীন—যার মা-বাবা উভয়েই মৃত।
মাতৃবিয়োগ—মায়ের মৃত্যু।
মাথ—হত্যা। বধ।

মাওরা—যার মা মারা গেছে।
মা-মরা—মা মারা গেছে যার।
মা-হারা—যে মাতৃহারা হয়েছে।
মার—মৃত্যু। মরণ।
মার্তণ্ড— মৃত অণ্ডে প্রবেশ করেন যিনি।
মারণ—হত্যা। বিনাশ। হনন।
মাংসকুণ্ড— অর্থলোভী কন্যাবিক্রয়কারী পাপী যমালয়ে এই নরককুণ্ডে স্থান পায়।
মালিনী—যমের পত্নী।
মাসিক— প্রেতের সংবৎসর মধ্যে প্রতি মাসীয় তিথিশ্রাদ্ধ।
মীলতুলসী—মুদ্রিত চোখে তুলসীপাতা।
মুক্— মুক্তি। মোক্ষ।
মুকুম—নির্বাণ। মুক্তি।
মুক্ত— মোক্ষপ্রাপ্ত।
মুখাগ্নি—শবমুখে প্রদত্ত অগ্নি। শবাগ্নি।
মুত্রকুণ্ড— পরের পুকুর খনন করে নিজের নামে উৎসর্গ করে পাপী যমালয়ে এই নরককুণ্ডে অবস্থান করে।
মুদ্দাফরাস—যারা মড়ার কাপড় বেচে। যারা শববহন করে।
মুণ্ড—নাপিত।
মুণ্ডন--মাথা মুড়ন। কামান।
মুণ্ডিত মস্তক—যার মাথা নেড়া করা হয়েছে।
মুণ্ডী— মুণ্ডনকারী। নাপিত।
মুড়োমাথা—যার মাথার চুল চেঁচে ফেলা হয়েছে।
মুমূর্ষা—মরণেচ্ছা।
মুমূর্ষু—মৃতপ্রায়। আসন্নমৃত্যু। মরতে ইচ্ছুক।
মূঢ়গর্ভ— মৃত গর্ভস্থ শিশু। মৃত ভ্রূণ।
মুহ্যমান—অতিশয় কাতর।
মহানরক— যন্ত্রণাদায়ক নরক।
মৃত— মৃত্যুপ্রাপ্ত। গতপ্রাণ। মরণ।
মৃতক— শব। মৃতশরীর। মরণাশৌচ।
মৃতকল্প—মৃতপ্রায়। মৃততুল্য।
মৃতদেহ—প্রাণহীন দেহ।
মৃতদার—পত্নী মৃত যার।
মৃতপ—যে ব্যক্তি শবের বস্ত্রাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। নদীতীরে দাহনের নিমিত্ত শববহনাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা।
মৃতপা—যে মৃতদেহ পাহারা দেয়। যে মৃতের পরিধেয় সংগ্রহ করে।
মৃতপ্রায়—যে প্রায় মৃত।
মৃতপ্রিয়া—যার প্রিয়া মারা গেছে।
মৃতবৎসা—যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকে না।
মৃতবৎসকা—যে নারী মৃত সন্তানের জন্ম দেয়।
মৃতস্নান—সৎকারের উদ্দেশে মৃতদেহের স্নান। সংস্কারার্থে স্নাপিত মৃতদেহ।
মৃতসঞ্জীবনী—মৃতের জীবনদায়ী বিদ্যা বা ঔষধি।
মৃতি— মরণ। মৃত্যু। বিনাশ।
মৃত্যু—প্রাণবিয়োগ। মরণ। যম।
মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি।
মৃত্যুবান—মৃত্যুজনক অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।
মৃত্যুজিৎ—মৃত্যুকে যিনি জয় করেছেন।
মৃত্যুজয়ী—যে মৃত্যুকে জয় করেছে।
মৃত্যুভঙ্গুরক— প্রেতপটহ। মৃত্যুকালে বাদনীয় বাদ্য।
মৃতভর্তৃকা—মৃত ভর্তা যার।
মৃতাশৌচ— মৃত্যুর জন্য অশৌচ।
মৃত্যুবঞ্চন —দাঁড়কাক।
মৃত্যুশয্যা—মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যা।
মৃত্যুশ্বাস—মৃত্যুর পূর্বের শ্বাসকষ্ট।
মৃত্যুযন্ত্রণা—মৃত্যুর যন্ত্রণা।
মেধ্য—যব।
মোক্ষ— মুক্ত। মৃত্যু। মরণ।
মোক্ষণ—মোচন।
মোক্ষধাম—কৈবল্যধাম। নির্বাণাশ্রম।
মোচক— মুক্ত। মোক্ষক।
মোচন—মুক্তি। পরিত্রাণ।
মোটক—শ্রাদ্ধে প্রয়োজনীয় ভগ্ন কুশপত্রদ্বয়।

মৌকুলি—কাক।
ম্রিয়মান—মরণাপন্ন। মৃতবৎ স্পন্দনহীন।
মৌদগলি—কাক।

য—যম।
যজত— পুরোহিত।
যজন—পূজন।
যজমান—যজ্ঞকারক। যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে কর্ম করায়।
যজাক— দাতা।
যম—ধর্মরাজ। যিনি জীবের প্রাণ হরণ করেন। দক্ষিণদিকপাল। শমন। এঁর অন্য নাম অন্তক, কৃতান্ত, কাল, ধর্ম, পিতৃপতি ইত্যাদি। 'সূর্য' এঁব পিতা এবং 'সংজ্ঞা' এঁর মাতা। ইনি প্রজাপতি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। হিন্দু ধর্মানুসারে ইনি জীবের পাপ ও পুণ্যের দণ্ডদাতা। যমদণ্ডধারী এঁর বাহন মহিষ। কাক। মৃত্যু দেবতা। নরকের অধীশ্বর।
যমপুকুর --ধর্মপুকুরে কার্তিক মাসে যমরাজার উদ্দেশে কবা ব্রত।
যমতা—যমের ভাব অর্থাৎ মৃত্যু।
যথারীতি— প্রচলিত রীতি অনুসাবে।
যমদূতক— কাক।
যমদূত— যমের অনুচর। যমের দূত। যমের বার্তাবহ।
যমদ্রুম—শিমুল গাছ।
যমদ্বার—নরকের দরজা
যমদ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।
যমদণ্ড— যমের প্রদত্ত দণ্ড।
যমন—যম। বিনাশ। ভবিষ্য পুরাণের মতে, কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া।
যমপ্রিয়—বটবৃক্ষ।
যমপুরী—যমের বাড়ি।
যমতর্পণ—যমের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞ।
যমভগিনী—যমুনা।
যমব্রত— ভবিষ্যপুরাণেব মতে, দশমী-তিথিতে রোগনাশ কামনায় যমের উদ্দেশে করা ব্রত। এছাড়া বিষ্ণুপুবাণ, কূর্মপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে অন্য রকম যমব্রতের বিধান দেওয়া রয়েছে।
যমদর্শন ত্রয়োদশী ব্রত— ভবিষ্যপুরাণের মতে, অগ্রহায়ণ মাসেব ত্রয়োদশীতে শুরু করে এক বছর এই ব্রত করার নিয়ম।
যমরাজ— শমন। যমই বাজা।
যমবাড়— মৃত্যুর পূর্বে শরীব মোটাসোটা হওয়া।
যমবাহন—মহিষ।
যমযন্ত্রণা—মৃত্যুযন্ত্রনা।
যমস্বসা —যমুনা নদী।
যমবরা—যমকে যে পতিরূপে বরণ করেছে।
যমালয়—যমেব বাড়ি।
যমী—যমুনা নদী। যমেব যমজ ভগিনী।
যমুনা—যমেব ভগ্নি।
যমুনাভ্রাতা —যম।
যব—শস্যবিশেষ।
যবক— যব। শুকধান্যবিশেষ।
যবাগ—যবমণ্ড।
যবান্ন—যবেব ভাত।
যশঃশেষ—মৃত্যু। মৃত।
যহ্ব—যজমান।
যাউ—যবমণ্ড।
যাচিত— মৃত।
যাজক— পুরোহিত।
যাত— অতীত। গত।
যামী—যম সম্বন্ধীয় যাতনা। যম সম্বন্ধীয় দক্ষিণ দিক।
যাম্য—যম সম্বন্ধীয়।
যাম্যা—দক্ষিণ দিক।
যায় যায়—মরার উপক্রম।

যোগ—অমাবস্যার দিন রবিবার, শ্রাবণা, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা, অশ্লেষা ও মৃগশিরা নক্ষত্র যোগে গঙ্গাস্নান করলে কোটি কুল উদ্ধার হয়।

রক্তাক্ষ— মহিষ।
রক্ষাকবচ— মৃত্যু ও বিপদের হাত থেকে যে কবচ রক্ষা করে।
রঞ্জসল—মহিষ।
রতজ্বর—কাক। বায়স।
রত্নধেনু—মহাদানবিশেষ।
রমতি— কাক।
রাক্ষস শ্রাদ্ধ—স্কন্দপুরাণের মতে, পিতৃশ্রাদ্ধের পর বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে পরে বৈষ্ণব ভোজন করা রাক্ষস শ্রাদ্ধ।
রবিজ—যম।
রবিতনয়—যম।
রবিনন্দন—যম।
রবিসূত—যম।
রিকথ [ঋক্থ] মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি।
রিষ্ট- পাপ।
রুদ্রব্রত পদ্মপুরাণের মতে, এক বছর প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করে পাপ ও শোকনাশের জন্য রুদ্রদেবের উদ্দেশে এই ব্রত।
রুদিত—ক্রন্দন। রোদন।
রুদ্রাক্রীড়—প্রেতভূমি। শ্মশান।
রেয়ো— বিনা নিমন্ত্রণে আগমনকারী।
রোদ—ক্রন্দন।
রোদন—ক্রন্দন।
রোধ্রী—পাপ।
রৌদ্র—যম
রৌরব—নরকবিশেষ। গো, স্ত্রী, ভিক্ষুক, ভ্রূণ এবং ব্রহ্মহত্যাকারী, অগম্যাগামী, তীর্থ প্রতিগ্রাহীরা এই নরকে গমন করে
রৌরুদ্যমান— অতি উচ্চস্বরে কান্না।

লালাকুণ্ড—বেশ্যান্ন ভোজী ও তদব্যবসার পাপে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
লুটিয়ে কান্না—মাটিতে গড়াগড়ি করে কান্না।
লুণ্ঠাক— কাক। বায়স।
লোকান্তর—পরলোক।
লোকান্তরিত—মৃত। পরলোকগত।
লোকপাল—লোক পালন করেন যিনি—যম।
লোকান্তর—পরলোক। পরজগৎ।
লোকান্তরিত— মৃত। পরলোকগত।
লোচ— অশ্রু। চোখের জল।
লোত্র—নয়নজল। অশ্রু।
লোপ—তিরোধান। অন্তর্ধান।
লোমকুণ্ড— শ্রাদ্ধ ও উপবাসে সংযম ত্যাগে পাপী যমালয়ে এই নরককুণ্ডে অবস্থান করে।
লোহচারক— নরকবিশেষ
লৌহকুণ্ড— ঋতুস্নাতা ও অবীরার অন্নভোজী হওয়ার পাপে যমালয়ে এই নরকে যেতে হয়।

বজ্রকেতু—নরকরাজ।
বজ্রকুণ্ড—দেবপূজার দ্রব্য নিজে ব্যবহার করায় যে পাপ, তাতে পাপীকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
বনাশ্রয়—দাঁড়কাক।
বসুধারা—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে প্রাচীর-গাত্রে প্রদত্ত ঘৃতধারা।
বংশপঞ্জী -বংশধরগণের পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস।
বংশাবলী—বংশের ইতিহাস।
বংশচরিত— বংশের ইতিহাস
বাজকুণ্ড— যমালয়ে নরকের এই কণ্ড তাম্র ও লৌহ চোরদের জন্য।
বর্হিষদ্— পিতৃগণবিশেষ।
বসুধারা—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পূর্বে ভিত্তিতে দেওয়া ঘৃতধারা।

বাৎসীপুত্র—নাপিত।
বাপ—ক্ষৌর। কামান।
বাপিত—মুণ্ডিত।
বাসনা—পূর্বজন্মের সংস্কার।
বাহদ্বিষৎ—মহিষ।
বিজয়া—যমের ভার্যা।
বিতথ—যজ্ঞানুষ্ঠান করে যার পুত্র লাভ হয়।
বিদারণ—মারণ। হনন।
বিধাতা—যার স্বামী মারা গেছে।
বিনষ্ট—মৃত। গত। অতীত।
বিটকুণ্ড—যমালয়ে নরকের এক কুণ্ড। ব্রাহ্মণের বিত্ত অপহরণ করে যে পাপ করা হয়, সেই পাপে এই নরককুণ্ডে অবস্থান করতে হয়।
বিনাশ—মৃত্যু।
বিনাশিত—নিহত।
বিনিপাত—মৃত্যু।
বিনিহত—মৃত। তিরোহিত।
বিপাশা—পাশ বা বন্ধন মুক্ত করে যে নদী।
বিপ্লব—পাপ।
বিমুক্তি—বন্ধ-থেকে মোচন।
বিলাপ—উচ্চস্বরে ক্রন্দন।
বিলোপ—তিরোভাব।
বিলোপন—মৃত্যু।
বিরুদ—উচ্চস্বরে ক্রন্দন।
বিরজা দেবী—গয়ায় বিরজা পর্বতে ধর্মরাজ (যম) গয়াসুরের পেটে আক্রমণ করেছিলেন, সেই অসুরের নাভিকূপে বিরজাদেবী বিরাজিত। এখানে পিণ্ডদানে একবিংশ কুল পরিত্রান পায়।
বিবশ—মৃত্যুপ্রার্থী। মৃত্যুকালে নির্ভীক।
বিশস—হত্যা। বধ। মারণ।
বিশস্ত—মারিত। নাশিত।
বিশালা—গয়ার এই তীর্থে স্নান করে পিণ্ডদান করলে শতকুল পিতৃগণ ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন।
বিশাবণ—হত্যা। মারণ। বধ।
বিষকুণ্ড—যমালয়ে এই কুণ্ডে সেই পাপীই আসে, যে বিষ প্রয়োগে অন্যের জীবন নষ্ট করে।
বিষজ্বর—মহিষ।
বিঘসাশী—যে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে অন্নজল নিবেদন করে অবশিষ্ট ভোজন করে।
বিষ্টি—নরকে পাতন।
বিস্র—চিতাধূমের গন্ধ।
বিস্রাবণ—প্রবল বেগে জল ঢেলে চিতা পরিষ্কার করা।
বিহ্বল—শোকাদি দ্বারা অভিভূত।
বিশোক—যার শোক দূরীভূত হয়েছে।
বীতশোক—বিগতশোক।
বীতি—মুক্তি।
বুকচাপা—প্রচণ্ড দুঃখে যে কাঁদতে ভুলে যায়।
বৃজন—পাপ।
বৃজিন—পাপ।
বৃত্ত—মৃত।
বৃদ্ধকাক—দাঁড়কাক।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।
বৃশ্চিককুণ্ড—যমালয়ে বৃশ্চিককুণ্ডে যেতে হবে অর্থলোভে প্রজাদের দণ্ডকারককে।
বৃষল—পাপী।
বৃষলী—মৃতবৎসা নারী।
বৃষোৎসর্গ—শ্রাদ্ধবিশেষ।
বেতাল—ভূতাবিষ্ট শব।
বেধনকুণ্ড—ছয় পুরুষগামী নষ্ট মহিলাদের নরকের এই কুণ্ডে যেতে হবে
বেলা—অকস্মাৎ মৃত্যু।
বৈড়ালব্রত—পাপকর্ম গোপন করে নিজেকে ধার্মিক বলে পরিচয় দেওয়া।
বেনুশয্যা—বাঁশের খাট।
বৈণ—ডোম।
বৈণব—ডোম।

বৈতরণী—মহাঘোর যমপুরের দ্বারে বৈতরণী নামে প্রেত নদী রয়েছে। পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ঐ নদী গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ রয়েছেন। এই নদীতে স্নান করে গোদানসহ পিণ্ডদানে একবিংশতি কুল পরিত্রাণ পায়।

বৈতরণী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণের মতে, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি বৈতরণী তিথি, এই তিথিতে ঐ ব্রত করার নিয়ম।

বৈতরণি—প্রেত নদী।

বৈধ্যেত—যমের দ্বারপাল।

বৈশস—হত্যা। বধ।

ব্যসন—দুঃখ। পাপ।

ব্যসু—মৃত।

ব্যাকুল—অস্থির। কাতর।

ব্যাকুলাত্মা—শোকাভিহতচিত্ত।

ব্যাপত্তি—মৃত্যু। বিপদ্।

ব্যাপদ্—মৃত্যু।

ব্যাপন্ন—মৃত। বিপদ্গ্রস্ত।

ব্যাপাদ—বিনাশ। বধ।

ব্যাপাদন—মারণ।

ব্যাপাদিত—মারিত। বিনাশিত।

ব্রহ্মতীর্থ—গয়া ব্রহ্মতীর্থে কূপে ও যূপের মধ্যস্থলে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণের পরিত্রাণ হয়।

ব্যুষ্টি—দাহ।

ব্রত—পাপক্ষয়কর কর্ম।

ব্রহ্মযূপ—গয়ায় ব্রহ্মার যজ্ঞস্থানে যে যজ্ঞযূপ প্রোথিত হয় সেই ব্রহ্মযূপে পিণ্ডদানে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

ব্রহ্ম সরোবর—গয়ায় এই সরোবরে স্নান করে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানে পিতৃলোক ব্রহ্মলোকগামী হয়।

ব্রহ্ম প্রকল্পিত আম্রবৃক্ষ—ব্রহ্মসরোবরে আম্রবৃক্ষের মূলদেশে মৌন হয়ে কুশাগ্রে বারিপ্রদানে সিক্ত হলে পিতৃগণ তৃপ্ত হন বলে প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মপদ—গয়ায় ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে যান।

বিষ্ণুপদ—গয়ায় বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে যান। এখানে পিতামহ ভীষ্ম শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করেছিলেন।

শ—মৃত্যু।

শক্রজ—কাক।

শক্রজাত—কাক।

শতানক—শ্মশান। প্রেতভূমি।

শমন—যম।

শমনভবন—যমের বাড়ি।

শমনসদন—যমের বাড়ি।

শমল—পাপ।

শয়থ—মৃত্যু।

শরকুণ্ড—হরিভক্তিহীন পাপী ব্রাহ্মণকে এই নরকের কুণ্ডে যেতে হয়।

শরীরী—আত্মা।

শব—মৃতশরীর। মড়া।

শবদাহস্থান—যেখানে মড়া পোড়ানো হয়।

শবদাহ—অগ্নিযোগে মৃতদেহ সৎকার।

শবদহন—মৃতদেহ অগ্নিসংযোগে সৎকার।

শবদাহে শুদ্ধি—শব দাহ করার পর জলে অবগাহন স্নান, অগ্নিস্পর্শ, ঘৃত-ভাজনে শুদ্ধি লাভ।

শবযান—শবরথ। ঘাটে মড়া নেবার যান।

শবরথ—শববাহী রথ। শববহনার্থ খাট।

শবানুগমন—শোকপ্রকাশের জন্য এবং সম্মান জানানোর জন্য শ্মশান পর্যন্ত শবানুগমন।

শববাহ—শববাহক। শববহনকারী।

শববাহক—শববহনকারী।

শবশ্রয়ন—শ্মশান।
শবসাধনে যমমন্ত্র—'ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সায়ুধায় নমঃ'।
শবাগ্নি—শবদাহের অগ্নি।
শবোদ্বাহ—শববাহী।
শব্য—শব নিয়ে যাবার সময়ের উৎসব।
শস্ত্রহত— পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী নখদ্বারা হত, উচ্চ হতে পতন, অনশন, বজ্র, অগ্নি, বিষ, বন্ধন, জলপ্রবেশ দ্বারা যারা মৃত্যুমুখে পতিত।
শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু—শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু সদ্যশৌচ ও তার দাহ ক্রিয়া হয়।
শাকচুন্নি—প্রেতযোনি। শঙ্খচূর্ণী শব্দের অপভ্রংশ।
শাকাষ্টকা—শাক, মাংস, অপূপ প্রভৃতি দিয়ে পিতৃগণের উদ্দেশে গৌণফাল্গুন বা মুখ্যচান্দ্র মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে করা শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ শাকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা ও অপূপাষ্টকা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।
শান্ত—মৃত।
শামন—যম। মারণ। বধ।
শামনী— যমের দক্ষিণদিক।
শাল্যকী—নাপিত।
শ্বাস—মৃত্যুর পূর্বে শ্বাসকষ্ট।
শিতশুক—যব।
শিরোমুণ্ডন—মাথা নেড়া। গয়াক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, বিশালা ও বিরজাতীর্থে শিরোমুণ্ডনের বিধি নেই।
শিশ্বিদান—পাপকর্মকারী।
শিয়ালফাঁকি—মৃতের ভান করে মৃত্যু এড়ান।
শীর্ণপাদ—যম।
শীর্ণাঙিঘ্র—যম।
শুক্রকুণ্ড— পরস্ত্রীগামী পুরুষ ও পরপুরুষগামী স্ত্রী যমালয়ের এই কুণ্ডে অবস্থান করে।
শুচ্— দুঃখ। শোক।
শুচা— শোক। মনস্তাপ।
শুদ্ধ হওয়া—হিন্দুরা শবস্পর্শে অপবিত্র হয় এবং স্নানান্তে শুদ্ধ হয়ে থাকে।
শুদ্ধান্ত—অশৌচান্ত।
শূকক—যব।
শূকধান্য—যব।
শূল—মৃত্যু।
শূলকুণ্ড— সন্ধ্যাহীন পাপী ব্রাহ্মণের জন্য নরকের এই কুণ্ড।
শূলপোতকুণ্ড— শিবলিঙ্গ পূজনে অভক্ত পাপীকে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
শোক— প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুতে মনোদুঃখ।
শোক প্রকাশ—হিন্দুদের মধ্যে আত্মীয়ের মৃত্যুতে হৃদয়ভেদী আর্তনাদ শোক প্রকাশ ও মাথা খোড়া, বুক চাপড়ান রীতি।
শোচন—শোক করা।
শোচিত— যার জন্য শোক করা উচিত।
শোচনীয়—শোকের বিষয়।
শোচ্য—যাকে উদ্দেশ্য করে শোক করা যায়।
শোচ্যমান—যে অতিশয় শোক প্রকাশ করেছে।
শোষনকুণ্ড— পুংশ্চলী বা দুই পুরুষগামী পাপী মহিলার জন্য নরকের এই কুণ্ড।
শোষাণি—মৃত্যু সময়ে মুখ দিয়ে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস চলাব শব্দ।
শোঠ— পাপাত্মা।
শুদ্ধিশ্রাদ্ধ—পাপনাশের নিমিত্ত শুদ্ধির কারণে পার্বণ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনে শ্রাদ্ধ।
শ্মন্—শব।
শ্মশান—প্রেতভূমি। শবদাহস্থান।
শ্রাদ্ধ— মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের নিমিত্ত অনুষ্ঠান। পিতৃকৃত্য। একোদ্দিষ্ট পার্বণাদি। প্রেত ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিজের প্রিয় পায়েস, দধি, ঘৃতযুক্ত অন্নাদি শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়া।

শ্রাদ্ধদেব—পিতৃলোক। যম।
শ্রাদ্ধশান্তি—যথাবিহিত শ্রাদ্ধের দ্বারা মৃতের আত্মার সদ্‌গতি।
শ্রাদ্ধিক— শ্রাদ্ধভোজী।
শ্রাদ্ধে বর্জন—পিলী, গুবাক, মন্দর, কশ্মল, অলাবু, বার্তাকু, কূট, ভদ্রমূল, তণ্ডুলীয়ক, রাজমায ও মহিষদুগ্ধ।
শ্রাদ্ধে মহাফল—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, সরস্বতী, প্রভাস, পুষ্করে শ্রাদ্ধে মহাফল।
শ্রাবক— কাক।
শ্রুতিকট— প্রায়শ্চিত্ত। পাপশোধন।
শ্বেতশুঙ্গ—যব।
শ্লথ্মকুণ্ড— বন্টন না করে একা মিষ্টান্ন-ভোজন- পাপে যমালয়ে এই নরককুণ্ডে অবস্থান।

ষোড়শদান—ভূমি, আসন, অন্ন, বস্ত্র, জল, তাম্বুল, প্রদীপ, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন, রজত।

সর্পকুণ্ড—সর্পের মস্তকে কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখেও সর্পহত্যার পাপে পাপীর যমালয়ে সর্পকুণ্ড নরকে স্থান।
সজীব—জীবন আছে যার।
সংজ্ঞপণ—মারণ। বধ।
সংযমনী—যমপুরী।
সংক্রিয়া—শবদাহাদি ক্রিয়া।
সংস্থ—মৃত।
সংস্থান—নাশ। মৃত্যু।
সংস্থিত— মৃত।
সংস্থিতি— মৃত্যু।
সংকৃৎপ্রজা—কাক। বায়স।
সংসার—জীবনের লীলাক্ষেত্র।
সংসারবন্ধন—পারিবারিক মায়ার বন্ধন।
সংসারলীলা—পার্থিব জীবন।
সঙ্কুটন—মৃত্যু।
সঞ্চানকুণ্ড— স্বর্ণচুরির পাপে নরকের এই কুণ্ডে যেতে হয়।
সঙ্ঘাত—নরকবিশেষ।
সতীমন্দির—মৃত পতির চিতায় সহমৃতা স্ত্রীর চিতাভস্মের উপর তৈরী মন্দির।
সতীদাহ—মৃত স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় পত্নীর দেহত্যাগ। এই প্রথা সহমরণ নামে পরিচিত।
সৎকার—শবদাহকর্ম।
সৎকৃত— য'র সৎকার করা হয়েছে।
সত্যবাক্— কাক।
সদ্যমৃত— যে এই মাত্র মারা গেছে।
সদাগতি— আত্মা।
সদ্যোমুক্ত—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত।
সদ্যোজীবী—যে জন্মমাত্র মারা গেছে।
সদ্যঃশৌচ— জন্মগ্রহণের পর জীবিত বালক মারা গেলে হয় সদ্যঃশৌচ।
সপিণ্ডীকরণ—মৃত্যুর এক বছর পর করণীয়শ্রাদ্ধ। প্রেতত্ব বিমোচনার্থ করণীয় শ্রাদ্ধ। পিতৃপিণ্ডের সঙ্গে প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ।
সপিণ্ডীকৃত— যাঁদের উদ্দেশ্যে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হয়েছে।
সপিণ্ডন—শ্রাদ্ধে গন্ধ, উদক, তিলযুক্ত পাত্র চতুষ্টয় ও অর্ঘের নিমিত্ত পিতৃপাত্রগুলিতে প্রেতপাত্রস্থ বস্তুকে মণ্ডদ্বারা মেলানোকে সপিণ্ডন বলে।
সমবর্তী—যম। কৃতান্ত।
সমানোদক— তর্পণে যাদের দেয় জল এক।
সমাধি—মৃতদেহ মৃত্তিকাগর্ভে স্থাপন।
সমাধিক্ষেত্র—যে স্থানে মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করে।
সমাকর্ষী—মৃতদেহ সৎকারের যে দূরগামী গন্ধ।
সমাপন্ন—হত।
সমাপ্তি—শেষ।
সম্বাধ—নরকের পথ।
সর্বঙ্কষ—পাপ।
সর্বতোমুখ—আত্মা।

সরস্বতীতীর্থ—গয়ার এই তীর্থে স্নান করে দেবীর সম্মুখে পূজা ও পিণ্ডদানে পিতৃগণ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।
সলিলক্রিয়া—জলদ্বারা চিতা ধৌতকরণ। তর্পণাদি।
সলিল সমাধি—মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ।
সহগমন—স্বামীর চিতাগ্নিতে জীবিতাবস্থায় শরীর দাহকরণ।
সহমরণ—মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় অধিরোহণপূর্বক প্রাণত্যাগ।
সহমৃতা—যে স্ত্রী মৃত স্বামীর সহগমন করে।
সাতনরক—ক্ষারমর্দন, রক্ষোগণভোজন, শূলপোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্তন, সূচীমুখ।
সাতপুরুষ—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পিতৃ পিতামহ, পিতৃ প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ। উর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ।
সাধ্বস—ভয়। ত্রাস। শঙ্কা।
সাপিণ্ড—অশৌচ গ্রহণোপযোগী জ্ঞাতিধর্ম বিশেষ।
সায়—শেষ। নাশ। অবসান
সাবিত্রীতীর্থ—গয়ার এই তীর্থে স্নান, সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিণ্ডদানে একশতকুল স্বর্গগামী হয়।
সাবর—পাপ।
সাশ্রু—অশ্রুজলসহ রোদনকারী। রোরুদ্যমান।
সিতশুক—যব। শ্রাদ্ধের কাজে লাগে।
সিধা—শ্রাদ্ধক্রিয়ায় ব্রাহ্মণদের দেওয়া কাঁচা ভোজ্য।
স—তর্পণকৃত্যাদির জন্য ধাতুনির্মিত জলপাত্র।
সুকৃতি—পিতৃলোকের উদ্দেশে কর্ম।
সুরলোক—স্বর্গ। দেবলোক।
সুরসম—দেবলোক। স্বর্গ।
সুত—পুত্র সন্তান।
সুশীলা—যমের ভার্যা।
সুতলী—গলায় পরা চাবিসহ সুতো।
সুতৃপ্ত—ব্রাহ্মান্ত পুরাণের মতে, শ্রাদ্ধকালে পিতৃকুলকে শ্রীহরির নিবেদিত অন্নতুলসীদ্বারা নিবেদন করলে পিতৃগণ কল্পকোটি পর্যন্ত সুতৃপ্ত থাকে।
সূচক—কাক।
সূচীমুখ—একে অপরের নিন্দাপরাধের পাপী নরকের এই কুণ্ডে যায়।
সূতকাশৌচ—বালক যদি গর্ভে মৃত হয় তাহলে যে কয়মাস গর্ভ সেই কয়দিন সূতকাশৌচ হয়।
সূত্রী—কাক।
সূদা—পাপ।
সূর্যজ—যম।
সূর্যতনয়—যম।
সূর্যাত্মজ—যম।
সূর্পকুণ্ড—ব্রাহ্মণীগমণকারী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য পাপীদের জন্য নরকের এই কুণ্ড।
সোম—যম।
সোমন্—যম।
সৌর—যম
সৌরি—যম।
সৌরিক—স্বর্গ।
স্তনয়িত্নু—মৃত্যু।
স্থগন—তিরোধান।
স্মরণদশা—স্মরণদশার দশম দশা হলো মৃত্যু।
স্বধা—পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান।
স্বধাভুক্—পিতৃলোক।
স্বগৃহ শ্রাদ্ধ—স্বগৃহে শ্রাদ্ধ করলে তীর্থ হতে আটগুণ অধিক পুণ্য।
স্বর্—পরলোক।
স্বর্গ—সুরলোক। ভূস্, ভুবস্ স্বর, মহস্, জন, তপস্, সত্য সপ্ত স্বর্গ।

স্বর্গের সিঁড়ি— গয়ায় শ্রাদ্ধ করার জন্য ঘর থেকে যাত্রা শুরু করলে পুত্রের প্রতি পদক্ষেপে পিতৃপুরুষের একটি একটি স্বর্গের সোপান তৈরী হয় বলে বিশ্বাস।
স্বর্গত—যে স্বর্গে গমন করেছে। মৃত।
স্বর্গতি—স্বর্গে গমন। মৃত্যু। পারলৌকিক সুখ।
স্বর্গী—মৃত।
স্বর্গীয়—স্বর্গসুখজনক।
স্বর্লোক—স্বর্গ। সুরলোক।
স্ববীজ—আত্মা।
স্বর্যাত—স্বর্গত। মৃত।
স্বস্ত্যয়ন—পাপ মোচনের জন্য পূজানুষ্ঠান।
স্বস্থ—স্বর্গস্থ। মৃত।

হ—মৃত্যু।
হতজীবিত—মৃত। গতাসু।
হত্যা—হনন। বধ।
হনন—হত্যা। মারণ।
হনু—মৃত্যু।
হন্তু—মৃত্যু।
হয়দ্বিষন্—মহিষ।
হয়প্রিয়—যব।
হবিষ্য, হবিষ্যান্ন—মৃতের পুত্র ঘৃতসহ নিরমিষ যে আতপচালের ভাত খায়।
হাহা—আকস্মিক দুঃখ। শোক।
হা—বিষাদ। শোক। দুঃখ।
হান্ত্র—মৃত্যু। মরণ।
হি—শোক।
হিংসন—হত্যা। বধ। হনন।
হী—শোক। দুঃখ।
হূ—শোক।
হূহু—মরণ-যাতনাসূচক ধ্বনি।

হিন্দুবৈষ্ণবের শবদাহ—মৃত্যু নিকটস্থ হলে শয্যার শিয়রে প্রদীপ জ্বেলে কর্পূর ও নারকেল দিয়ে হোম করে। মৃত্যু হলে তুলসীপত্র দিয়ে মৃতের মুখে পঞ্চগব্য দেয়। এরপর দুতিন ঘন্টার মধ্যে শব বাইরে এনে শ্মশানে নিয়ে যায়। স্থান বিশেষে কাঠ বা শুকনো গোময়ের চুল্লীতে শবদাহ করা হয়। এব উপর শব রেখে তুলসী পাতা দিয়ে পিণ্ডদান করে। দাহের পর অস্থি ও করোটী সংগ্রহ করে জল দিয়ে একটি পাত্রে ঐ অস্থি নদী বা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে।

যমের বিচার
লোকসংস্কৃতির দরবারের

চিত্রাবলী

চিত্রাবলী

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী-এর প্রবন্ধ

চিত্র নং ১

মহিষের পিঠে যম ও ৎসামুণ্ডি।

হাতে দণ্ড, পাশ, ত্রিশূল ও নরকপাল। তিব্বত, ১৮শ শতাব্দী

চিত্র নং ২
যম ও ৎসামুণ্ডী, তিব্বত : ১৮শ শতক
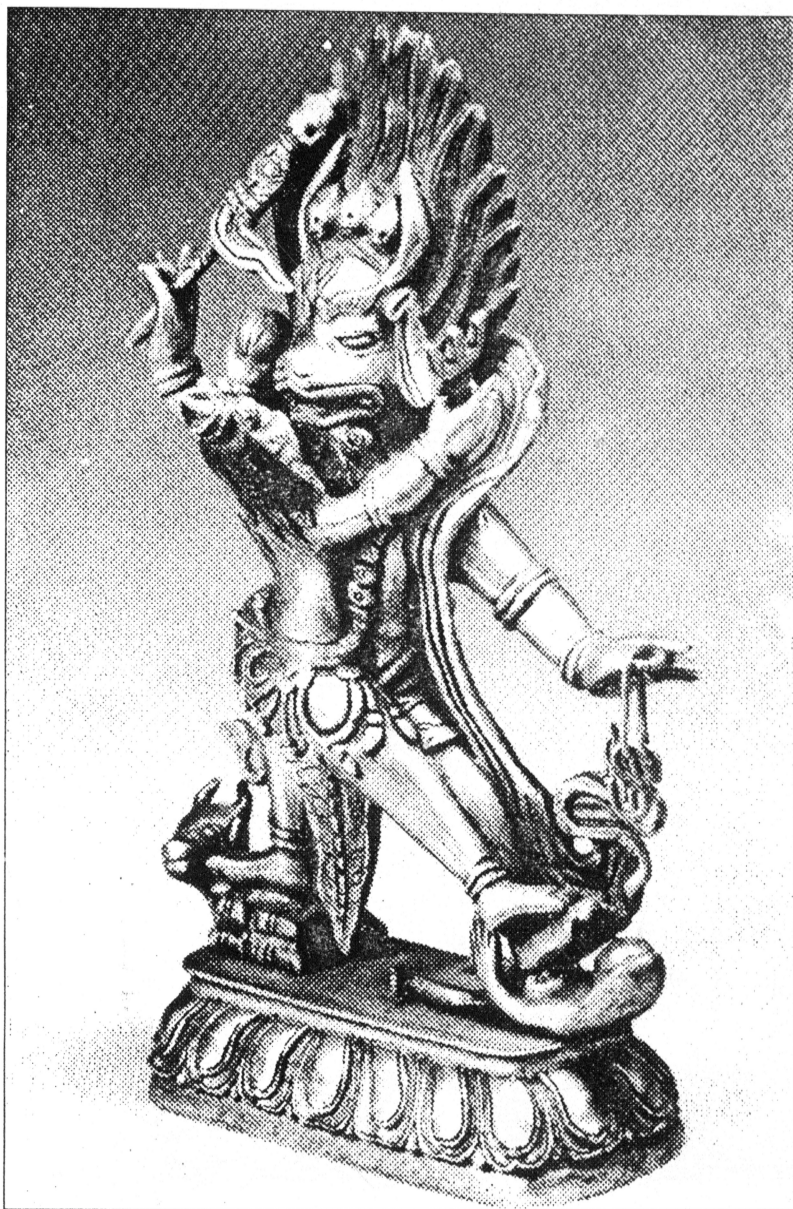
চিত্র নং ৩
যুগ নদ্ধ ভঙ্গিতে যম-যমী। তিব্বত, ১৮শ শতক

চিত্র নং ৪
তিব্বতী পট বা থঙ্কায় যম-যমী। ১৯ শতক

চিত্রাবলী : ২

পূরবী গঙ্গোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ

চিত্র নং ৫

যম : এন্মা-ও

[কামাকুরায় এন্নো-জি মন্দিরে, আঃ ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ]

চিত্র নং ৬

যম : এন্মা-তেন

[এন্মা-তেন]

চিত্রাবলী : ৩

সিপ্রা চক্রবর্তী-এর প্রবন্ধ

চিত্র নং ৭

প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিতে ত্রিমস্তকযুক্ত যম—হাতে তরবারি ও দণ্ড

কাশ্মীর, দশম শতাব্দী
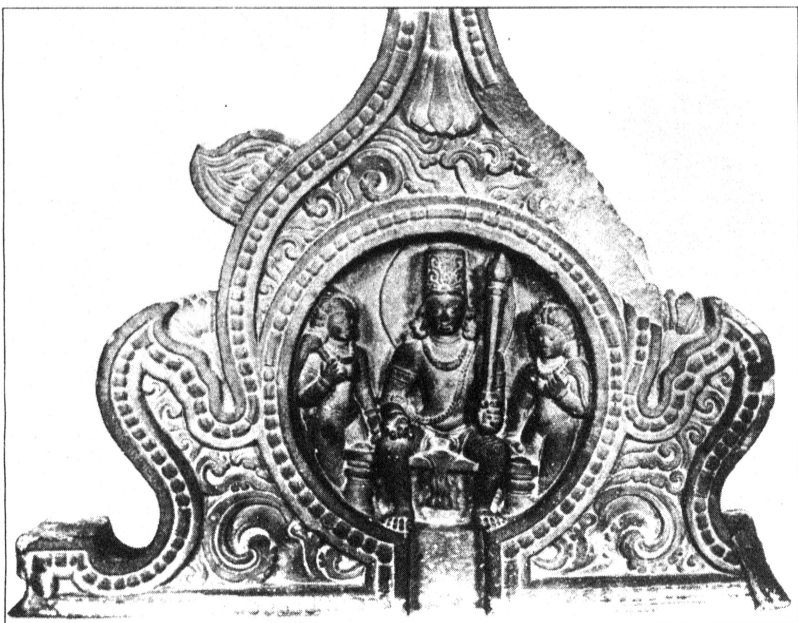
চিত্র নং ৮ সিংহাসনে যম। **হাতে** বিচারের দণ্ড ভুমারা, মধ্যপ্রদেশ। যষ্ঠ শতাব্দী
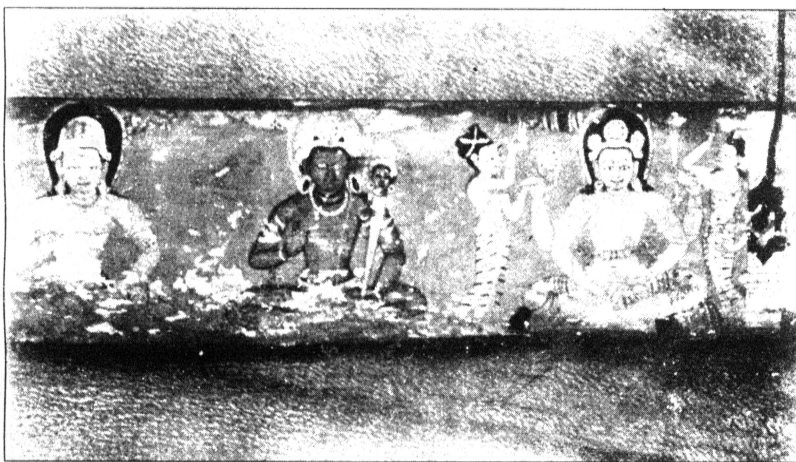
চিত্র নং ৯ বিষ্ণুধর্ম পুঁথির পাটায় পদ্মাসনে যম। কাঠমাণ্ডু, একাদশ শতাব্দী

চিত্র নং ১০

তিব্বতী তংখায় বজ্রভৈরব

পঞ্চদশ শতাব্দী

চিত্র নং ১১
রক্তযমান্তক
তিব্বত, ষোড়শ শতাব্দী

চিত্র নং ১২
যম হন্তা বজ্রভৈরব, তিব্বত।
ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী

চিত্র নং ১৩
শক্তিসহ বজ্রভৈরব
তিব্বত। ষোড়শ শতাব্দী

চিত্র নং ১৪

ধ্যান তংখায় যম

তিব্বত, ঊনবিংশ শতাব্দী

চিত্র নং ১৫

যম এবং ৎসামুণ্ডি, তিব্বত

অষ্টাদশ শতাব্দী

চিত্র নং ১৬

করণ মুদ্রায় যম

তিব্বত, অষ্টাদশ শতাব্দী
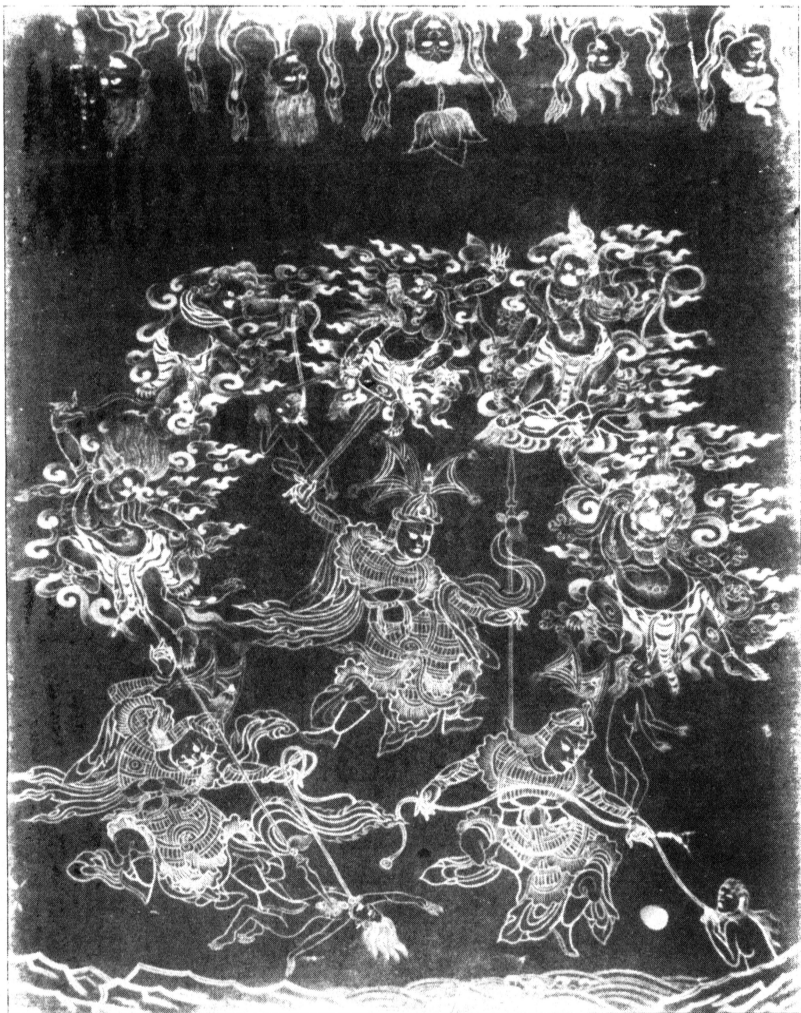
চিত্র নং ১৭
যমদূত দ্বারা নরকে পাপীদের শাস্তি; তংখা
তিব্বত, ঊনবিংশ শতাব্দী

চিত্র নং ১৮
যুগনদ্ধ ভঙ্গিতে রক্তযমারি ও শক্তি
তিব্বত, অষ্টাদশ শতাব্দী

চিত্র নং ১৯ চতুর্ভুজ যম, তংখা তিব্বত, বিংশ শতাব্দী

চিত্র নং ২০

শক্তি আলিঙ্গনে বজ্রভৈরব—মিং রাজত্বকাল

চীন, পঞ্চদশ শতাব্দী

চিত্র নং ২১

শক্তিসহ বজ্রভৈরব, যুগনদ্ধ ভঙ্গিতে —কুয়িং রাজত্বকাল, চীন

অষ্টাদশ শতাব্দী

চিত্র নং ২২
যমরাজ বা চোগিয়াল
তিব্বত, সপ্তদশ শতাব্দী

চিত্র নং ২৩
যমরাজ
[লিঙ্গরাজের মন্দির, ভুবনেশ্বর]
মধ্যযুগ

নির্বাচিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

ইংরাজি

'A Dictonary of Non-Classical Mythology' : [Compiled by] Marian Edwardes & Lewis Spence; London, 1910.

'The Oxford Companion to Classical Literature' : [Compiled & Edited by] Sir Paul Harvey; Oxford, 1962

'A Smaller Classical Dictionary' : William Smith; London, 1910.

'The Reader's Companion to World Literature' : [Edited by] L. H. Hornstein & others; Penguin Books, New York; 1997

'The Epic of Gilgamesh' : N. K. Sandars; Penguın Books, London, 1976.

'The Ancient Egyptians' [Vol. IV] : Sir Gardener Wilkinson, London, 1847.

'Archaic Egypt' : W. B. Eemery ; Penguin Books, Harmondsworth, 1974.

'The Maya' : M. D. Coe ; Penguin Books, Harmondsworth ; 1975.

'The Aztecs of Mexico' : G. C. Vaillant ; Penguin Books, Harmondsworth ; 1950.

'Ancient Civilizations of Peru' : J. Alden Mason ; Penguin Books, Harmondsworth ; 1978.

Art of the Maya : Ferdinand Anton

Painting, Sculpture and Architecture of Ancient Egypt. : Wolfhert Westendorf

Tibet's Terrifying Deities. : F. Sierksma :

Yama—The Glorious Lord of the other World : Kusum P. Merh

An Introduction to Buddhist Esoterism : Benoytosh Bhattacharyya

The Arts of Nepal. : Pratapaditya Pal

Tibetan Thankas in the Indian Museum : Sipra Chakravarti

বাংলা

ঋগ্বেদ : হরফ প্রকাশন
'বামন পুরাণ'
চর্যাপদ : মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত।
পদ্মাপুরাণ : বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত সম্পাদিত।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত : দ্বিজ মাধব, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
চণ্ডীমঙ্গল : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত।
রামায়ণ : কৃত্তিবাস, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত।
মহাভারত : কাশীরাম দাস, ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
চৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবনদাস, ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত।
চৈতন্যচরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত।
অন্নদামঙ্গল : রূপরাম চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত।
ধর্মমঙ্গল : ঘনরাম চক্রবর্তী, ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত।
অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র রায়, বসুমতী সংস্করণ।
বৈষ্ণব পদাবলী : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত।
শাক্ত পদাবলী : অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত।
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড] : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
'বাংলার ব্রত' : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' : বিনয় ঘোষ।
'পৌরাণিকা' [১ম ও ২য় খণ্ড] : অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
'হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও বিকাশ'-১পর্ব : ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
হিন্দু দেবদেবী—জাপানের বৌদ্ধধর্মে : ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ বক্‌সি
পটুয়া সঙ্গীত : গুরুসদয় দত্ত
বীরভূমের পটচিত্র ও চিত্রকর : অগ্নিমিত্র ঘোষ
বীরভূমের যমপট : দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়
পট শিল্পের ঘরানা : সুধাংশুকুমার রায়
বিশ্বকোষ : নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত
'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' ১৫ বর্ষ ২ সংখ্যা : সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত

❒